ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

দ্বিতীয় বর্ষ □ চতুর্থ সংখ্যা □ অক্টোবর ২০১৩ □ ৩০ টাকা

Subscribe Online
www.swarnakshar.in

কালের কষ্টিপাথর

জাহানারা ইমামের
একাত্তরের দিনগুলি
মুক্তিযুদ্ধের আগুনঝরা দিনের চাক্ষুষ ধারাভাষ্য

শুভাপ্রসন্নর
ধারাবাহিক আত্মকথা
আমার ছবিজীবন

ষাটের দশকের অগ্রগণ্য গল্পকার
শেখর বসুর
স্বনির্বাচিত দুটি গল্প

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের
ধারাবাহিক উপন্যাস
রাজ্যপাট

ভ্রমণ
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
এক টুকরো ভাঙা দেওয়াল

আলোক সরকারের স্বনির্বাচিত সাতটি কবিতা | কবিতা-পরিচয় | কবির উত্তর | চণ্ডীমণ্ডপ | বই-ঠেক | ক্ষণের বচন | শব্দবক্র

২৪"×২৪" ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে আঁকা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

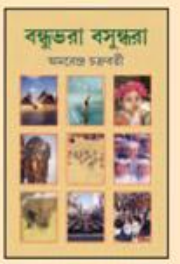

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনীর বই, পত্রিকা, ভ্রমণ-ভিসিডি
Buy Online ▸ www.swarnakshar.in
তুতুল
মহাশ্বেতা দেবী
শাদা ঘোড়া
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
চলো দেখে আসি
কানাইলাল চক্রবর্তী
আমাজনের জঙ্গলে
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
গৌর যাযাবর
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
হীরু ডাকাত
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
কথামালা: ছড়ায় ঢালা
পবিত্র সরকার
বকবকম
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
সেরাভ্রমণকাহিনী
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ
ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন
দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি
দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়
দক্ষিণ থাইল্যান্ড
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে
Read / Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
ভ্রমণ
ছেলেবেলা
কালের কষ্টিপাথর
পেশাপ্রবেশ
কর্মক্ষেত্র
স্বর্ণাক্ষর
স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in
ওয়েবসাইট: www.swarnakshar.in • www.bhraman.com
www.ebhraman.com • www.echhelebela.com • www.ekarmakshetra.com
স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

www.ekashtipathar.com

মাসিক সাহিত্যপত্রিকা

কালের কষ্টিপাথর

পশ্চিমবাংলা, আসাম ও ত্রিপুরায় বইয়ের দোকানে
এবং পত্রিকাস্টলেও খোঁজ করতে পারেন।

কলকাতায় সর্বত্র পাবেন
পত্রিকাস্টলে বা সংবাদপত্র-বিক্রেতার কাছে
আগে থেকেই বলে রাখুন।
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা

ঘরে বসে নিয়মিত পত্রিকা
পেতে অনলাইন গ্রাহক হোন
www.swarnakshar.in

নিখরচায় পড়তে পারেন:
www.ekashtipathar.com

এক বছরের গ্রাহকমূল্য ৩৬০ টাকা চেকেও পাঠাতে পারেন। এই নামে, এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge Second Lane, Kolkata-700 019

স্বর্ণাক্ষর

Phone: 2280 8818, 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** kashtipathar@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

সবে যারা অক্ষর চিনেছে তাদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

পাতায় পাতায় রঘুনাথ গোস্বামী ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি।

দাম ২০ টাকা

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

বইটি শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। এটি লেখা হয়েছে শিশুদের জন্যে যত্ন করে ও যুক্তাক্ষরবর্জিত করে। রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ প্রথম ভাগের পর, সদ্য অক্ষর পরিচয় হয়েছে যাদের তাদের জন্যে এরকম বই বেশি লেখা হয়নি। 'এস, এস। চটপট কর। সময় কম।' এইরকম ছোট ছোট সরল বাক্য দিয়ে পাঠ শুরু হয়েছে।

ছোট-ছোট বর্ণনাগুলি ক্রমশ সুন্দর ছবির রূপ নিয়েছে।

আনন্দমেলা □ ১৬-৩-১৯৮৮

'চলো দেখে আসি' বলে বাংলা প্রথম পাঠের বইখানি এরই মধ্যে বহু যশ অর্জন করেছে। প্রথম ভাগ 'সহজ পাঠে'র চাইতেও সহজপাঠ এ বই। মোট তিনটি অধ্যায়ে লেখক স্বরবর্ণযোগের যাবতীয় বৈচিত্র্য পরিক্রমা করে নিয়ে গেছেন যুক্তবর্ণের সীমানা অবধি, ওপরে ওপরে গাঁ আর গ্রামজীবনের ছবি দিয়ে দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন সারা পথ।

আনন্দবাজার পত্রিকা □ ১৮-৯-১৯৮৮

একলা একটা পাখি দূর থেকে ডাকছে না? সে কি এই দিকেই উড়ে আসছে? চলো দেখে আসি।

হঠাৎ মেঘ ডাকল না? এখন তো মেঘ ডাকার সময় নয়! চলো দেখে আসি।

ছোটদের নিয়ে ছোটদের জন্য এরকম কত কথাই যে তিনি লিখেছেন তার শেষ নেই। এরকম কিছু কথার পিঠে ছবি আঁকলেন শিল্পী রঘুনাথ গোস্বামী আর পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়— তাই নিয়ে হল একটা ছোটদের বই— 'চলো দেখে আসি।'

যুগান্তর, ছোটদের পাততাড়ি □ ১১-৬-৮৫

সদ্য বর্ণ-পরিচিতদের কাছে এক বিশ্বাস্য, প্রামাণিক আর ব্যক্তিগত পৃথিবীর দরজা খুলে দিয়ে কানাইলাল চক্রবর্তী ডাক দিয়েছেন: চলো দেখে আসি।

মিনিমাসী আর তার গাভী মালিনী, লালু-ভুলু আর তাদের কুকুর ভুকু, চূড়ামণি ঠাকুর, ভূষণমালী, ঋষি দাশ, শৈল, ভোলা, গৌরময়রা, কংসারিবেদে— এই বইতে এরা শুধু বর্ণ-পরম্পরাতেই ধরা পড়েনি, অপত্য স্নেহের এক অকৃপণ ফল্গুধারায় বাঁধা পড়ে এরা সবাই মিলেমিশে হয়ে উঠেছে প্রাক্-বিভাজন বাংলাদেশের এক প্রতিষ্ঠান।

একুশ বছর আগে লেখা 'চলো দেখে আসি' ছোট্টদের শ্রেষ্ঠ বই হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল ১৯৭০ সালে।

আজকাল □ ২৩-৮-১৯৮৮

কানাইলাল চক্রবর্তী সেই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে একজন, যাঁরা ছোটদের জন্য আন্তরিকভাবে চিন্তাভাবনা করেন।... এই বইতে অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মতভাবে তিনি অ-কার, আ-কার ইত্যাদির পরিচয় করিয়েছেন সেইসব শিশুদের যাদের সদ্য অক্ষরপরিচয় হয়েছে। যুক্তাক্ষরবিহীন প্রতিটি ছত্র। প্রতিটি কাহিনী শিশুদের কাছে মেলে ধরেছে প্রকৃতি এবং জীবনের অপরূপ রূপচ্ছবিকে।

বর্তমান □ ১১-২-১৯৯০

এই লেখকের আরও দুটি ছোটদের বই

কুমির হয়ে জলে গেল

প্রথম স্বর্ণাক্ষর সংস্করণ ₹৩০

চড়ুইয়ের সঙ্গে

₹১৫

স্বর্ণাক্ষর **Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.**, 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283-2320, 2283-5526 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, *বলাকা বুক স্টল* (কলেজ স্ট্রিট), *স্টার মার্ক*-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

ইন্টারনেট সংস্করণ: www.ekashtipathar.com

কালের কষ্টিপাথর

দ্বিতীয় বর্ষ। চতুর্থ সংখ্যা। অক্টোবর ২০১৩। কার্তিক ১৪২০

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ৫

ক্ষণের বচন ৯। শব্দবক্র ৯

চণ্ডীমণ্ডপ। মহাপ্রলয়ের আগের রাত। চণ্ডী লাহিড়ী ৭

পু র নো অ্যা ল বা ম

কালান্তর। সম্পাদকীয়। প্রতাপকুমার রায় ৫৯

গল্পের নির্মাণ প্রসঙ্গ। শেখর বসু ৪০

শেখর বসুর স্বনির্বাচিত দুটি গল্প

নির্জন পথে ৪১ স্পনসররাজ ৪৮

বি বি ধ নি ব ন্ধ

আমার বাবা: সুকুমারী ভট্টাচার্য ২৪

উদ্যোগ, না উদ্‌যোগ? নিত্যপ্রিয় ঘোষ ৩৯

ধা রা বা হি ক

একাত্তরের দিনগুলি। জাহানারা ইমাম ১৫

আমার ছবিজীবন। শুভাপ্রসন্ন ৫২

রাজ্যপাট। সুব্রত মুখোপাধ্যায় ৬০

প্রবোধচন্দ্র সেন ১১ প্রমথনাথ বিশী ১৩

মহাজনসঙ্গ। অমিতাভ চৌধুরি

ক বি তা র পা তা

আলোক সরকারের স্বনির্বাচিত সাতটি কবিতা ৬৮

কবিতা-পরিচয়

বৃষ্টি: অমিয় চক্রবর্তী ৬৩

নরেশ গুহ

প্র ত্যা লো চ না

মনুজেশ মিত্র ● প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ● সুতপা ভট্টাচার্য

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা, কবির উত্তর ● অমিয় চক্রবর্তী ৬৭

ভ্র ম ণ ক থা

এক টুকরো ভাঙা দেওয়াল। অমরেন্দ্র চক্রবর্তী ৩১

স্ট্রিট লেন বাই-লেন। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। অ্যান্টনিবাগান লেন ৭২

নি য় মি ত

কয়েকটি চিঠি ৭৪। বই-ঠেক ৭৭

প্রচ্ছদ: ২৪"×২৪" ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিকে আঁকা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

কালের কষ্টিপাথর

সম্পাদক : অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: সম্পাদকীয় বিভাগ: ২২৮৩-৫৫২৬
বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন: ২২৮৩-২৩২০, ২২৮০-৮৮১৮
ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ E-mail: kashtipathar@swarnakshar.in
Website: www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯ থেকে প্রকাশিত।
Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনি

দুচাকায় দুনিয়া
বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
পঞ্চম মুদ্রণ ₹১৫০

ভ্রমণের নবনীতা
নবনীতা দেব সেন

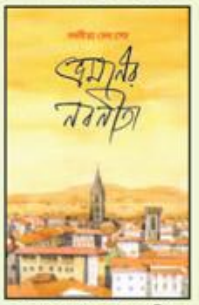

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹৯০

দেশে দেশে
প্রতাপকুমার রায়

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা ₹৭৫

ইছামতীর মশা
শঙ্খ ঘোষ

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।
পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ ₹১৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড | ৩য় মুদ্রণ ₹৩৫০ **দ্বিতীয় খণ্ড** | ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

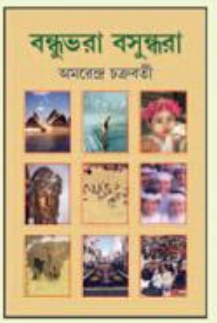

বন্ধুভরা বসুন্ধরা
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ₹১২০

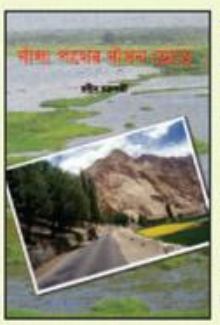

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে
রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।
₹৬০

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া
শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

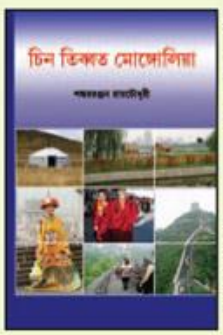

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া— ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ₹৬০

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Ph: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448
E-mail: info@swarnakshar.in

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

কালের কষ্টিপাথর

কার্তিক ১৪২০। অক্টোবর ২০১৩

আমার বাড়িটা পুড়ে যাবার পর এখন আমি চাঁদ ওঠা
আরও ভালো করে দেখতে পাই।

মিজুতা মাশিদে
কবি ও সামুরাই

উৎসর্গ

শিশু-কিশোর সাহিত্যের আজীবন সাধক, সাহিত্যচিন্তক, প্রবন্ধকার দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে এই সংখ্যার 'কালের কষ্টিপাথর' উৎসর্গ করে আমরা ধন্য।

স ম্পা দ কী য়

'ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার পথিকে ধাঁধিতে'— মহাকবির এই কবিতাপংক্তি যেমন একটা বাস্তব সত্যও, তেমনই কবি, লেখক, মনীষী, দার্শনিকদের অনেক হিরণ্ময় উক্তি বিদ্যুচ্চমকের মতোই মানুষের জীবনকে হঠাৎ-আলোর ঝলকানিতেই চিরকালীন পথ দেখায়। একটা কথার ছোঁয়াতেই হতে পারে কারও মনের পুণ্যস্নান, একজীবনেই ঘটতে পারে নবজন্ম।

সামান্য এক পথের বালিকার মুখে 'বেলা যে বয়ে যায়' শুনে লালাবাবুর যেমন হয়েছিল। সকলেই জানেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত কত মানুষের জীবনে কতভাবে যে আলো দেখিয়েছে, তার তো কোনও ইয়ত্তাই নেই। শঙ্খ ঘোষের 'দামিনীর গান' বইয়ে, যতদূর মনে পড়ে, রবীন্দ্রসঙ্গীতস্পৃষ্ট এক বিদেশির আলোকপ্রাপ্তির কথা আছে।

বহুকাল আগে, খবরের কাগজে সামান্য ওই বালিকার মতোই সামান্য এই কলমচির এক চিলতে একটা লেখার কয়েক পংক্তি এক আত্মঘাতপথযাত্রীকে শেষ মুহূর্তে কীভাবে রক্ষা করেছিল সেকথা জেনে কথার মন্ত্রশক্তিতে আমার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল। আমার অজ্ঞাত সেই পাঠকের চিঠির একটি অংশ ছিল এইরকম :

সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াও যে-কোনও একটা কাজ না পাইয়া বাঁচিবার আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া রেললাইনে মাথা রাখিয়া চিরঘুম ঘুমাইবার জন্য রাত্রেই ঘর ছাড়িয়াছিলাম। আমাদের গ্রাম ছাড়াইয়া আসিয়া পথে একটি চায়ের দোকানে উনুনে ধোঁয়া দেখিয়া বাঁশের বেঞ্চিতে বসিয়া চায়ের অপেক্ষা করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম আর কিছুক্ষণের মধ্যে যে আর পৃথিবীতে থাকিবে না তাহার আবার চায়ের তেষ্টা কেন। বেঞ্চির নীচে একটা পুরানো খবরের কাগজের দোমড়ানো মোচড়ানো পাতা পড়িয়া আছে দেখিয়া তুলিয়া লইয়া চা না হওয়া পর্যন্ত সময় কাটাইতে পড়িতে লাগিলাম। সরু একটি লেখার এক জায়গায় চোখ আটকাইয়া গেল। পড়িয়া চমকাইয়া উঠিলাম। এ তো আমাকে লেখা। আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম। লেখার নীচে আপনার নাম ও যুগান্তর, কলকাতা-৩ দেখিয়া সেই ভাবেই ওই ঠিকানা লিখিয়া এই চিঠি পাঠাইলাম।

সামান্য এক কলমচির হয়তো আরও সামান্য একটা কথারই যদি এমন প্রভাদানের ক্ষমতা, তাহলে নানা ভাষার নানা যুগের অসামান্য লেখকদের হিরণ্ময় কথার বিদ্যুচ্চমক যে জীবনকে কতদিকে কতভাবে চিরপ্রভাদান করে কে আর তার হিসেব করতে পারে! এক বাংলা সাহিত্যেই এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত।

সাহিত্যের মনোজ্ঞ পাঠক, যাঁরা 'কালের কষ্টিপাথর' পড়েন তাঁদের কাছে আমাদের অনুরোধ, অন্তত বাংলা সাহিত্য থেকে আপনার আবিষ্কৃত চিরপ্রভাদায়ী বিদ্যুদ্‌গর্ভ বাক্যগুলি আমাদের কাছে লিখে পাঠান, এই পত্রিকায় তার একটি ধারাবাহিক সংকলন প্রকাশ করতে পারলে আমরা কৃতজ্ঞ বোধ করব। উদ্ধৃত বাক্যের শেষে প্রেরকের নামও মুদ্রিত হবে। আগ্রহীরা চাইলে সারা বিশ্বের বিস্ময়কর সাহিত্যভাণ্ডার থেকেও মণিমুক্তো খুঁজে এনে পাঠাতে পারেন।

স্বর্ণাক্ষরে সংগ্রহযোগ্য // অনলাইনেও পাবেন: www.swarnakshar.in

ছোটদের বই

মহাশ্বেতা দেবীর বিস্ময়কর বই

তুতুল ₹২৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের

বকবকম

পাতায় পাতায় মজার ছবি ₹১৫

কানাইলাল চক্রবর্তীর

খুব ছোটদের জন্য এক আশ্চর্য সুন্দর বই

চলো দেখে আসি

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹২০

চড়ুইয়ের সঙ্গে ₹১৫

পূর্ণেন্দু পত্রীর লেখায়-ছবিতে

আমার ছেলেবেলা ₹১৮

পবিত্র সরকারের

কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫

মৈত্রেয়ী নাগের

বাঘ বেড়ালের ছড়া ছবি ₹৩০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

কিশোর-উপন্যাস

দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি

বরফের বাগান

আন্টার্কটিকার রহস্যময়

তুষাররাজ্যের আশ্চর্য উপকথা।

যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি।

প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়। ₹১২০

ছেঁড়াকাঁথার গল্প

দ্বিতীয় মুদ্রণ ₹৭৫

শাদা ঘোড়া

দেশ-বিদেশের নানা ভাষায় অনূদিত।

পঞ্চম মুদ্রণ ₹৩০

আমাজনের জঙ্গলে

ষষ্ঠ মুদ্রণ ₹৫০

হীরু ডাকাত

শিশুসাহিত্যে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত

নবম মুদ্রণ ₹৪৫

গৌর যাযাবর

বিশ্বভারতীর আশালতা সেন পুরস্কারপ্রাপ্ত। ₹৪০

টিয়াগ্রামের ফিঙেনদী

যুধাজিৎ সেনগুপ্ত চিত্রিত ₹১৫

ঋষিকুমার ₹২০

পাখির খাতা ₹৪০

আমার বনবাস ₹১২

তালগাছের ডোঙা ₹২০

হরিণের সঙ্গে খেলা ₹১৫

ভূতের বাঁশি ₹৪০

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ছোটগল্প ও কবিতার বই

নিমফুলের মধু গল্পসংকলন ₹৬০

মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০

নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০

নতুন বই

মৈত্রেয়ী নাগের

আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

কানাইলাল চক্রবর্তীর

কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০

নেকড়ের চোখ

বড়দের বিখ্যাত ফরাসি লেখক **দানিয়েল পেনাক** ছোটদেরও কত বড় লেখক, সব বয়সের ছোটদের জন্য লেখা তাঁর এই উপন্যাসের পংক্তিতে পংক্তিতে তারই পরিচয়। মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করেছেন: **মৈত্রেয়ী নাগ** ₹৬০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

সেরা ভ্রমণ কাহিনী

প্রখ্যাত লেখক-পর্যটকদের দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অন্তরঙ্গ কাহিনী। ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা। মজবুত বোর্ড বাঁধাই।

প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। সহস্রাধিক পাতা। ₹৩৫০

দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ৭০০ পাতা। ₹২৭৫

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

---

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা

ঘরে বসেই উপভোগ করুন দক্ষিণমেরু ভ্রমণের রোমাঞ্চ। ঘুরে বেড়ান আশ্চর্য সব আইসবার্গের গা ঘেঁষে, ঝাঁক ঝাঁক পেঙ্গুইন-অ্যালবাট্রসের ভিড়ে, বরফে ঢাকা দ্বীপে-পাহাড়ে। ₹৫০

সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে

₹১০০

আফ্রিকার জঙ্গলে

আফ্রিকার জল-জঙ্গল তৃণভূমিতে পালে পালে বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ। সঙ্গে আফ্রিকার আদিবাসীদের নাচ গান। ₹৫০

আলাস্কা

ঘরে বসেই ঘুরে বেড়ান আলাস্কার অরণ্য, পাহাড়, হিমবাহ, হ্রদ, নদী, সাগর-উপসাগর। ₹৫০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর আরও ভ্রমণ-ভিসিডি

চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। ব্যাংকক-পাটায়া। কম্বোডিয়া। লেবানন। ভিয়েতনাম। মিশর। মোঙ্গোলিয়া। ইন্দোনেশিয়া। মায়ানমার। রাশিয়া। মালয়েশিয়া। প্যারিস-ভিয়েনা। রোমানিয়া। চেক রিপাবলিক। নেপাল। নানা দেশের লোকনৃত্য। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়

জম্মু ও কাশ্মীর। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। গোয়া। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। বারাণসী। উইক এন্ড।

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায়

অথবা নীচের ঠিকানায় লিখুন:

for Preview: *www.bhraman.com*

স্বর্ণাক্ষর

SWARNAKSHAR PRAKASANI PRIVATE LIMITED
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: **2283 2320** Fax: **2287 6448**
E-mail: **info@swarnakshar.in**

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, **বলাকা বুক স্টল** (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাবেন।

চণ্ডীমণ্ডপ

মহাপ্রলয়ের আগের রাত

লেখা ও ছবি : চণ্ডী লাহিড়ী

খুব শৈশবে, যখন সত্যিই খুব অবোধ ছিলাম, শহরে গুজব রটলো, অমুক দিন রাত্রে অষ্টগ্রহ সম্মেলন ঘটবে মহাকাশে। সেদিন মহাপ্রলয় ঘটবে। ফল, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। শৈশব হলেও, কালটা মহাযুদ্ধের— অনেক অসম্ভব কাণ্ডই ঘটছে। চেতাবণী বলে কে এক সাধু কাশীর ঘাটে বসে ঘোষণা করেছেন, পৃথিবী এখন পাপে পূর্ণ— ঈশ্বরের বিধানে মহাপ্রলয় ঘটবেই।

অমাবস্যার রাত্রি। মা নেই। আমার একমাত্র দিদিকে নিয়ে রাত্রে খাটে শুলাম। সকালে তো কেউ বেঁচে থাকব না। শম্ভু ঘোষ তার গোয়ালের যাবতীয় গরুকে রাত্রে ছেড়ে দিল। খোলা জায়গায় তারা ঘুরে বেড়াক, মানুষের পাপের জন্য তারা মরবে কেন!

পাঁচীর মা-র ঘরে যত চাল জমানো ছিল হাঁড়িতে ও বস্তায় সবই গরীবদের বিলিয়ে দিল। সবাই সে রাত্রে ঘরের দরজা খোলা রাখল। মহাপ্রলয় কাকে বলে কেউ জানে না। যদি সেটা ভূমিকম্প হয় তাহলে সদর দরজা দিয়ে সহজে পালানো যাবে।

তখন শহরে কোনও ব্যাঙ্ক নেই। অতএব ভল্ট নেই। যাদের সোনার গহনা ছিল, তারা গহনা পরে বসে থাকল। ঘরে নয়। গাছতলায়। জানা গেল, অনেকেরই গহনা আছে।

গঙ্গার ধারে বড় বড় মাঠ ছিল। সারা শহরের যত ছাড়া পাওয়া গরু, সব চড়ে বেড়াতে লাগল গঙ্গাতীরের মাঠগুলিতে।

গা-ভর্তি গহনা পরে মেয়েরা বিনা পাহারায় ঘরের বাইরে গাছতলায় শুয়ে আছে। চোর-ডাকাতরা সাধু হয়ে গিয়েছে। চেয়েও দেখছে না। এমন ঘটনা পৃথিবীতে ওই একবারই ঘটেছিল।

ক্ষনেরবচন

৮৪
যত বেশি স্বপ্ন আশা
তত বাড়ে রোজ হতাশা

৮৫
যে ভাবে সে সর্বজ্ঞ
আসলে সে বড় অজ্ঞ

৮৬
আমি করি আমি দিই আমিই তো সব
আমি আমি থেকে অমাবস্যার উদ্ভব

৮৭
ঋষিকে শিক্ষক পেলে, কবিকে হৃদয়ে
আলো পেতে পারো ক্রূর আঁধার সময়ে

৮৮
মিথ্যাকে পরাও যদি সত্যের পোশাক
মনে রেখো মাছ ঢাকতে চিরব্যর্থ শাক

৮৯
সূর্যালোকে বাঁচে মর্ত্য—
নেই হাততালি শর্ত।

৯০
কেউ গান করে কেউ শোনে সেই গান
ধানের বেলায় জেনো সমান-সমান

ক্ষণকথক

শব্দবক্র

৮৬। আশঙ্কাহত

বিশেষণ; বাড়ির সমস্ত আলো পাখা বন্ধ করে ভালো করে তালা এঁটে বেরিয়ে পড়ার ঘণ্টাখানেক বাদ 'কিছু একটা নির্ঘাৎ বন্ধ করা হয়নি' ভেবে ফিরে এসে সব কিছু ঠিকই আছে দেখে কোনও কোনও আশঙ্কাহত ব্যক্তির মনের যে অবস্থা হয়।

৮৭। আকাট্য

বিশেষণ; যে ধরনের যুক্তি-প্রমাণ বিশেষ মাত্রার বুদ্ধিমত্তা ব্যতিরেকে কল্পনাও করা যায় না। স্বভাবতই, এ ধরনের আক্রমণের সামনে সবরকম তর্কই অসম্ভব— আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করা যায় না, এরকম সমস্যা দেশে খুব বেশি নেই। তবে গণতন্ত্রে থেকে 'সংবিধান মানি না' জাতীয় আকাট্য দাবি কি আর কেবল কথা দিয়ে কাটা যায়?

৮৮। আগাছালো

বিশেষণ; দীর্ঘকাল নিয়মিত যত্নের অভাবে সাজানো বাগান যে রূপ পায় > দেশে ফিরে থেকে আমার প্রতিবেশী ভদ্রলোকটির চেহারা সর্বদাই কেমন যেন হয়ে থাকে— চুল উস্কোখুস্কো, কাপড়জামাও কুঁচকোন মতন— কেউ কিছু বললে বলেন কেতাদুরস্ত হয়ে থাকার কোনও মানে আর হয় না। চেহারায় একটা আগাছালো ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্য অনেকেই নাকি এখন অনেক খরচা করছে।

৮৯। দিনভরচাপ

বিশেষ্য; যে ব্যক্তি সারাদিনে বহুবার চা সেবন করেন > চায়ের নেশা অনেকেরই থাকে, তবে আমাদের বড় কর্তার মতো দিনভরচাপ আর একজনকেও দেখিনি। এখনও সূর্যদেব আকাশে, এর মধ্যেই বারো কাপ হয়ে গিয়েছে। তেরো নম্বরের পালা এই এল বলে।

৯০। ফুচকাওয়াজ

বিশেষ্য; জিভে জল আনা টক-ঝাল ফুচকা বানানোর জন্য উপকরণ ছাড়াও আর যেসব কার্যকারণ অপরিহার্য বলে গণ্য করা হয় > ঝাঁ চকচকে স্টিলের থালায় পনেরো টাকা গচ্চা দিয়ে খান ছয়েক ফুচকা খেয়ে দেখি কেবল পেট ভরেছে, মন ভরেনি। শালপাতা, লালশালুর ঢাকনা, ফুটিফাটা হাতে আলু চটকানোর কারিকুরি— সেই ফুচকাওয়াজ না থাকলে কি আর ও চেনা স্বাদ পাওয়া যায়।

শব্দবক্রমুণি

মহাজনসঙ্গ

অমিতাভ চৌধুরি

। পর্ব ২৯।

প্রবোধচন্দ্র সেন

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে সেবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে এম এ পরীক্ষা দেবেন দু'জন, নীহাররঞ্জন রায় ও প্রবোধচন্দ্র সেন। নীহারবাবু সেবার পরীক্ষা দিলেন না। কারণ তিনি জানতেন সেবার পরীক্ষা দিলে তিনি প্রথম হতে পারবেন না; প্রথম হবেন প্রবোধচন্দ্র সেন। সেবার প্রথম হলেন প্রবোধচন্দ্র সেনই এবং পরের বার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন নীহাররঞ্জন রায়। সেই প্রবোধদা ছিলেন আমার মাস্টারমশাই। আমি সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ অধ্যাপকের কাছে ক্লাস নিয়েছি, কিন্তু প্রবোধদার মতো শিক্ষক লাখে না মিলে এক। প্রবোধদা ছিলেন খুলনার দৌলতপুর কলেজে ইতিহাসের শিক্ষক। ১৯৪২ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন রবীন্দ্র অধ্যাপক হয়ে। আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম। প্রবোধদা সারা জীবন জ্ঞানের চর্চা করে গিয়েছেন। তিনি নিজে ডক্টরেট ডিগ্রিধারী ছিলেন না, কিন্তু কত ছাত্র যে তাঁর অধীনে কাজ করে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল— সব বিষয়ে তিনি ছিলেন শেষ কথা। সবাই জানে তাঁকে 'ছান্দসিক' বলে। ঠিকই জানে, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞানের কথাও কম লোকই জানেন। প্রবোধদার সঙ্গে এক ঘণ্টা কাটানো মানেই ছিল পঁচিশখানা দুর্মূল্য বই পড়ে নেওয়া। তাঁর জ্ঞান, তাঁর যুক্তি খণ্ডন করার সাধ্য আমাদের ছিল না।

বাংলা ছন্দ নিয়ে অনেকেই তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামেন। এমনকী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও। কিন্তু প্রবোধদা তাঁর মতামত দিয়ে সবাইকে পরাস্ত করে স্বমতে আনেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নতুন ছন্দে একটি কবিতা ছাপান 'বিচিত্রা' কাগজে এবং শেষ পঙক্তিতে লেখেন 'বিধান কী দেন প্রবোধ সেনে।' ছন্দের ওপর প্রবোধদার অনেকগুলো বই আছে। তাছাড়া আছে প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি নিয়ে বই। নিজে যত লিখেছেন, তার চেয়ে বেশি লিখিয়েছেন ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে। বাড়িতে গেলে দেখা যেত পাণ্ডুলিপির পাহাড় সামনে নিয়ে তিনি পড়ছেন আর লিখছেন এবং লিখছেন আর পড়ছেন।

ডাকতাম 'দাদা', কিন্তু সারা জীবন তাঁর পিতৃস্নেহ পেয়েছি। আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম, কিন্তু আমার ত্রুটি ক্ষমা করার, আমার সামান্য সাফল্যে অসামান্য প্রফুল্ল হওয়ার এমন মহাজন গুরুজন আর নেই। প্রবোধদার লেখা অনেক চিঠি আমার কাছে আছে। একটি চিঠির কথা বলি, খাওয়া-থাকাকে আমি লিখেছিলাম 'ফুডিং অ্যান্ড লজিং'। কথাটায় তিনি খুব মজা পেয়েছিলেন, শান্তিনিকেতনে গেলেই তিনি বলতেন, 'তুমি আমার বাড়িতে একদিন 'ফুডিং' করলে না?'

আর একবার এক চিঠিতে লিখলেন, 'তোমাকে এই চিঠি লিখতে লিখতে আমার দাড়ি তিন ইঞ্চি বেড়ে গেছে। এখন আমায় 'ছন্দটি' বলতে পারো। প্রবোধদা শেষজীবনে দাড়ি রাখতে শুরু করেছিলেন। আমি কোথায় কী লিখছি, তার ফিরিস্তি পাঠাতাম তাঁর কাছে। তিনি আমাকে লেখেন, 'তুমি যে সাংবাদিকতায় ডুবে না গিয়ে লেখার কাজ চালিয়ে যাচ্ছ, তাতে আমি আনন্দিত ও গর্বিত... কর্মের জাল গুটিয়ে আনার চেষ্টা করছি। ঘানি ঘোরাবার কাজে বিরাম নেই। কিন্তু আশানুরূপ তেল

খুলনার দৌলতপুর কলেজ

পাওয়া যাচ্ছে না। তা বলে রেপসিড তেল দেবার প্রবৃত্তি নেই। খাঁটি তেল কমও ভালো। কিন্তু রেপসিড নৈব নৈব চ। জোড়াতালি দেওয়া দেহটাকে চালিয়ে যাচ্ছি কোনওরকমে। কিন্তু চঞ্চল মনটাকে সামলানো কঠিন।' ১৯৭১ সালে লেখা আর একখানা চিঠি— 'এবার ৮৪ পূর্ণ হয়ে ৮৫ শুরু হল। আমি যেন বুড়ো হবার আগেই তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারি। সকলের কাছেই এই শুভেচ্ছা কামনা করি, আরও বেশি দিন বাঁচলে আমিও বুড়ো হয়ে যেতে পারি— মনে এই ভয় দেখা দেয় মাঝে মাঝে। বুড়ো হয়ে মরতে আমি একেবারে চাই না। তোমরা আমাকে জুজুর ভয় দেখাও কেন? বিশেষত তুমি।'

প্রবোধদার আক্ষেপ ছিল আমি 'ছন্দ' নিয়ে কোনও বই লিখিনি বলে। অনেকবার উসকে দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারিনি। অথচ এই সম্পর্কে কোনও কাজ না করেই তাঁর কাছে সাবাসি পেয়েছি। একটা চিঠিতে লিখেছেন— 'তোমার নামটা উল্লেখ করেছি "কৃতি ছন্দোবিজ্ঞানী ছাত্র" বলে। আর একটা বইয়ের কম্পোজ করে রেখেছি। নাম দেব ছন্দ-কৌতুক। মনে মনে অতি সংগোপনে একটি ফন্দি এঁটে রেখেছি। এই বইটা উৎসর্গ করব অমিতাভ চৌধুরীকে।'

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ থেকে ৭ই পৌষে তাঁকে অর্থদানের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন আমি যেতে পারিনি। তিনি চিঠি লিখলেন— 'শিবহীন যজ্ঞ যথাসম্ভব সুসম্পন্ন হয়েছে।' ১৯৭৯ সালের ১৭ এপ্রিল একটি মজার চিঠি পাই। তাতে ছিল তাঁর শততম জন্মদিনের আমন্ত্রণ— 'বাকি মাত্র আঠারো, যাবে দেখতে দেখতে ফুরিয়ে, এই কদিনের ঝামেলা আমি হেসেই দেব উড়িয়ে, যে জন আছে যেখানে। ইতি হবু শতায়ু প্রবোধচন্দ্র সেন।' তারপরেই চিঠির কোণে লেখা— '(কানে কানে) শতবার্ষিকী তার মূল্য, শতবার সিকিটার তুল্য।' তারপরেই চিঠির নীচে লেখা— 'শতায়ু কামনার পরিবর্তে লৌকিকতা (সহাস্য প্রীতি বিনিময়) প্রার্থনীয়।'

তারপর মৃত্যুর আগে লেখেন শেষ চিঠি— 'দেহের শক্তি কমছে, মনের শক্তি এখনও আছে। কিন্তু দেহ— মনের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছে না। চিন্তা করতে পারি, কিন্তু লিখতে কষ্ট হয়। অর্থাৎ মন চললেও হাত চালাতে পারি না সে গতিতে। এখন ছুটি চাই। পরে হয়তো বিদায় চাওয়ার শক্তি ও সময় থাকবে না। তোমরা সকলে আনন্দে থাকো এই আমার শেষ কামনা।'

প্রবোধদা, আপনি চলে যাওয়ার পর আমি শান্তিনিকেতনে যাই, কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা হয় না। আমি আনন্দে নেই, ওখানে গেলে আপনার কথা বারবার মনে হয়। কলকাতায় কোনও বই নিয়ে বসলে আপনার কথা মনে হয়। আপনার শেষ কাজে যোগ দিয়েছিলাম। তবু আনন্দে নেই। বারবার আপনার কথা মনে হয়।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

আমাজনের জঙ্গলে

আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস।
ষষ্ঠ মুদ্রণ। ₹৫০

'শৈশবের এমন জাদুছবি, সেইসঙ্গে অরণ্য ও অরণ্যবাসী মানুষজনের এমন পরিচয়, এ যেন মনে পড়ায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক।'

মহাশ্বেতা দেবী, আজকাল

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকানে ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ ফ্যাক্স: ২২৮৭-৬৪৪৮ ই-মেল: info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

। পর্ব ৩০।

প্রমথনাথ বিশী

শান্তিনিকেতনের আদি যুগের ছাত্র প্রমথনাথ বিশী। কথাবার্তায়, লেখাপড়ায় চৌকস। সেই ছাত্রজীবনেই তাঁর লেখা নাটক অভিনীত হয়েছে এবং তাঁর সম্পাদিত কাগজ প্রকাশিত হয়েছে। সর্বোপরি তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন রবীন্দ্রনাথ। শান্তিনিকেতনের দীর্ঘ ইতিহাসে সবচেয়ে চর্চা হয়ে থাকে পরিহাসপ্রিয়তা এবং তার রাজা ছিলেন প্রমথনাথ বিশী। ছাত্রজীবনে একবার গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে কাজে। গিয়ে দেখেন রবীন্দ্রনাথ লাল মদিরার মতো উজ্জ্বল এক গ্লাস পানীয় সামনে নিয়ে বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে, খাবি নাকি?' রাজি জানাতেই হাজির মদিরার মতো উজ্জ্বল আর এক গ্লাস পানীয়। কিন্তু মুখে দিতেই তাঁর নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে যাওয়ার জোগাড়। নিমপাতা সিদ্ধ জল। রবীন্দ্রনাথ মুচকি হাসেন, কিন্তু অকুতোভয় বিশীদা এক চুমুকে সব শেষ করে বললেন— 'দারুণ।'

কবির আবাস থেকে বেরনোমাত্র অন্য ছাত্ররা ঘিরে ধরল বিশীদাকে। তাঁর মুখে সেই 'মিষ্টি শরবতের' কাহিনি শুনে অন্যরা হিংসায় জ্বলতে লাগল।

এই হচ্ছেন বিশীদা। রসিকতায় অকুতোভয়, উপস্থিত বুদ্ধিতে অসাধারণ। কিন্তু এটা তাঁর বাহ্যিক পরিচয়।

গম্ভীর রচনায় বা আলোচনায় তাঁর জুড়ি ছিল না। কত বই লিখেছেন তিনি। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন', 'রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ', 'কেরী সাহেবের মুন্সি', 'কোপবতী', 'ঋণং কৃত্বা', 'মৌচাকে ঢিল', 'জোড়া দিঘির চৌধুরী পরিবার' ইত্যাদি। নানারকম শতাধিক বইয়ে তিনি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। শান্তিনিকেতনেই সতেরো বছর বাসের পর ছেড়ে তিনি অধ্যাপনা ও সাংবাদিকতায় জড়িয়ে ছিলেন। দুই ধারাতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কাছে পড়েছি। কী অসাধারণ পড়াতেন তিনি। আর ক্লাসের বাইরে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র বলে কত গল্পই না করতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। রবীন্দ্রনাথকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে গুরুবাদ ছিল না। তাঁর সমালোচনাও করেছেন, বলেছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের দুটি দোষ— অতি কথন ও সামান্য কথন।

পুরনো শান্তিনিকেতন ও তাঁর আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথকে জানতে হলে প্রমথনাথ বিশীর বই অপরিহার্য। কত উপন্যাস, কত গল্প, কত প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন, কিন্তু আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে তাঁর লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিকেতন' বইটি। শান্তিনিকেতন ও রবীন্দ্রনাথকে ভালোভাবে জানতে হলে বইটি অপরিহার্য। শান্তিনিকেতন থেকে বহু কৃতী ছাত্রছাত্রী বেরিয়েছেন। কলাভবন ও সংগীতভবন থেকে তো অজস্র। পরবর্তী জীবনে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন, এমন পাঁচজন ছাত্রছাত্রীর নাম আমি উল্লেখ করছি, যাঁদের নিয়ে সবাই গর্ব করতে পারে। যেমন সুধীরঞ্জন দাস, প্রমথনাথ বিশী, সৈয়দ মুজতবা আলি, ইন্দিরা গান্ধী ও অমর্ত্যকুমার সেন। কলাভবন ও সংগীতভবনের বহু কৃতী ছাত্রছাত্রী ভারতবিখ্যাত হয়েছেন। যেমন সত্যজিৎ রায়, পৃথ্বীশ নিয়োগী, রামকিঙ্কর, বিনোদবিহারী, শঙ্খ চৌধুরী, দিনকর কৌশিক, কৃষ্ণ রেড্ডি, মানি সুব্রহ্মণ্যম, জয়া আপ্পাস্বামী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, নীলিমা সেন, রাজেশ্বরী দত্ত, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পাঠ-ভবনের অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অঞ্জন শুক্ল প্রমুখ। শিক্ষাভবনে ছিলেন নবকান্ত বরুয়া, আশরাফ সিদ্দিকি, লোকনাথ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণ পাটোয়ারি প্রমুখ খ্যাতিমান সাহিত্যিকের দল।

গত শতাব্দীর গোড়ায় তিনি শান্তিনিকেতনে যান ছাত্র হিসেবে। তারপর একটানা দীর্ঘ সতেরো বছর

স্ত্রী সুরুচি বিশীর সঙ্গে প্রমথনাথ

কাটিয়ে কলকাতায় পাড়ি দেন। তবে তাঁর শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আমৃত্যু। তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার কথা আমরা জানি এবং এও জানি যে তাঁরই লেখা একটি নাটক সামান্য অদলবদল করে তৈরি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নামক নাটক।

রবীন্দ্রনাথকে রসিকতা করে বলতেন, 'গুরুদেব, একমাত্র 'যাত্রাপালা' লেখা ছাড়া আর কোনও রাস্তাই খোলা রাখেননি। ভাবছি, আমি এই লাইনেই থাকব।' ছাত্রাবস্থায় তিনি অনেক যাত্রাপালা লিখেছিলেন এবং তা অভিনীতও হয়েছে ঘটা করে।

তিনি প্রকাশ্যে তেমন কোনও রাজনীতি করতেন না, তবে অতুল্য ঘোষ মশায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। চৌরঙ্গি রোডে প্রদেশ কংগ্রেস অফিসে তাঁর যাতায়াত ছিল। কংগ্রেসের তরফে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের অনুরোধে তিনি রাজ্যসভার সদস্য হন।

ছয় বছর তিনি দিল্লিতে প্রবাসী ছিলেন। মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে আসতেন সংসদে রাজ্যসভার প্রতিনিধি হয়ে। তখন দু'জনে দেখা হত। আমিও সংসদ সদস্য ছিলাম। দু'জনে সন্ধেবেলা কাজের পর হাঁটতাম শালবীথি আম্রকুঞ্জ বকুলবীথিতে।

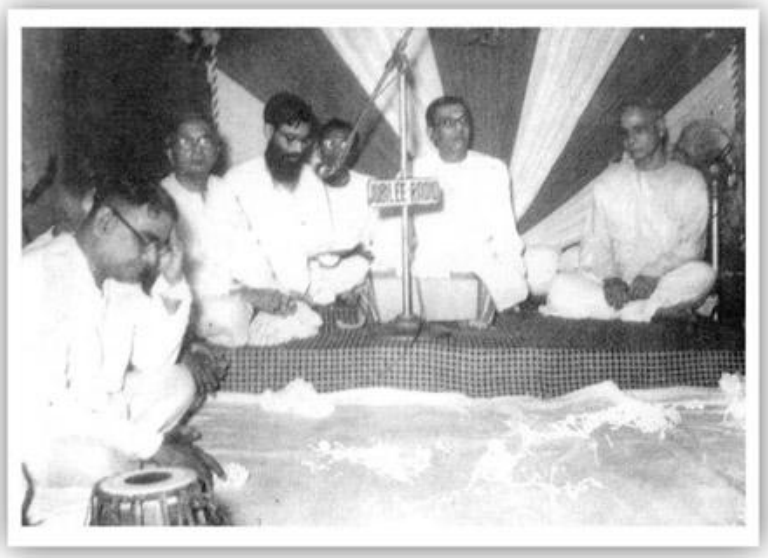

একটি সাহিত্যসভায় বাঁদিক থেকে বনফুল, প্রমথনাথ, নরেন্দ্র দেব এবং অজয় মুখোপাধ্যায়

তিনি বলতেন, 'শারদোৎসবের গান যখন শুনি 'ঝরা মালতীর ফুলে, আমার বিছানো নিভৃত কুঞ্জে ভরা গঙ্গার কূলে— এই সিক্ত শুভ্র স্নিগ্ধ চিত্রটি তুলির টানে একটি শরৎ প্রভাতের ছবি মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় না কি?'

সত্যিই তাই। এখনও শান্তিনিকেতন গেলে তাঁকে দেখতে পাই। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের মল্লিনাথ।

আগামী সংখ্যায় শেষ

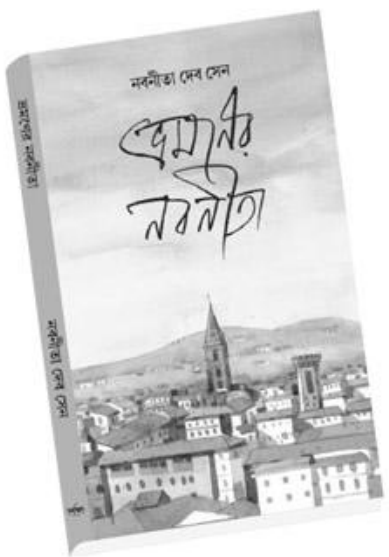

নবনীতা দেব সেনের

ভ্রমণকথা

ভ্রমণের নবনীতা

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।

দ্বিতীয় সংস্করণ। ₹৯০

দে বুক স্টোর, ১৩, *বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট*, *কলকাতা-৭৩*,
বলাকা বুক স্টল (*কলেজ স্ট্রিট*), *স্টার মার্ক*-*এর সব দোকান*
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

জাহানারা ইমাম

একাত্তরের দিনগুলি

জাহানারা ইমাম

দশ-বারো বছর আগে একবার এক একুশে ফেব্রুয়ারি আর একবার বাংলা নববর্ষে ঢাকার সন্ধানী প্রকাশনীর সাহিত্যানুরাগী কর্ণধার, আমাদের অনেকেরই বন্ধু, গাজী শাহাবুদ্দিন আহমদের আতিথ্যে সারা রাত সারা দিন ঢাকার পথে পথে ঘুরে দেশে ফেরার বেশ কিছুদিন পর গাজী শাহাবুদ্দিন সস্ত্রীক কলকাতায় আমাদের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন, সেইসময় নিজের প্রকাশনীর একটি বই— জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি' আমাকে উপহার দেন। ওঁরা দেশে ফিরে যাবার দিনই রাতে আমি বইটি শুরু করে ভোরবেলা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। আমাদের এত কাছে, একদা আমাদেরই ভাঙা হৃদয়ের একটা টুকরো এক ভূখণ্ডের স্বাধীন দেশ হয়ে জন্মানোর রোজকার রক্তাক্ত ঘটনাপঞ্জি এভাবে চোখের সামনে জীবন্ত দেখব কখনও কল্পনাও করিনি। ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানের ওপর পাক সেনার আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে থেকে বিধ্বংসী ঝড় ওঠার আগের থমথমে মুহূর্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়ে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পরদিন পর্যন্ত এ এক পরম মূল্যবান ইতিহাসের সজীব ধারাভাষ্য।

১৯৮৬-তে প্রথম প্রকাশের পর ১৯৯৭ পর্যন্ত বাংলাদেশে বইটির বিংশতিতম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন ঢাকা থেকে ফোনে জানালেন, পাকিস্তানেও নাকি এ বইয়ের উর্দু অনুবাদ বেরিয়েছে। আমাদের ঘরের পাশেই বাংলা ভাষাভিত্তিক এই নতুন দেশের জন্মযুদ্ধের একজন ভুক্তভোগী জননী ও জায়ার লেখা এমন মহামূল্য দলিল পাঠ থেকে এপার বাংলার আমরাই বা বাদ থাকব কেন! 'কালের কষ্টিপাথর'-এ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের এই দৈনন্দিন দলিলের পুনর্মুদ্রণ প্রয়াত লেখিকার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ। বইটির প্রকাশক ও জাহানারা ইমাম স্মৃতিরক্ষা সমিতির সদস্য গাজী শাহাবুদ্দিনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, তিনি এই বাংলায় শুধু আমাদেরই এই বই পুনর্মুদ্রণের সানন্দ সম্মতি দিয়েছেন।—সম্পাদক

ষোলো

৭ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

ঝিনুরা বাসা বদল করেছে। আগের বাসাটা রাজারবাগ পুলিশ লাইনের উল্টো দিকে ছিল, আত্মীয়বন্ধু যেতে ভয় পেত। এই বাসাটা পাগলাপিরের বাসায় পিছনে হয়েছে। দুই বাসার মাঝের বাউন্ডারি ওয়াল এত নিচু যে, দু'পাশে দুটো টুল রেখে দিলে সিঁড়ির মতো পা ফেলে যাতায়াত করা যায়।

আজ পাগলা বাবার সাপ্তাহিক মিলাদ শেষ হওয়ার পর ঝিনুদের বাসায় এসেছি নুহেল আর দীনুকে দেখতে। ওদের দুই ভাইয়ের শরীর খুব খারাপ। পূর্ণিমা-অমাবস্যার সময় হলেই ওদের চার ভাইয়ের কোমরে, পিঠে, শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা বাড়ে। কিন্তু এবারে নুহেল আর দীনুর শরীরটা বেশি কাবু হয়ে পড়েছে। নুহেলের পিটুনিটা বেশিরভাগ পিঠে, কোমরে আর মাথায় পড়েছে।

দু'তিনটে ইলেক্ট্রিক তার একত্রে পাকানো, মাঝে মাঝে একটা করে গিঁট— এইরকম তারের দড়ি দিয়ে বেশিরভাগ সময় নুহেলকে মেরেছে। মেরুদণ্ডের হাড় নড়েচড়ে তো গিয়েছেই, সারা পিঠ ফালা-ফালা, মাথার বিভিন্ন জায়গায় কাটা। দীনুর অবস্থাও সমান খারাপ। তার বাঁ কানের পর্দা ফেটে গিয়েছে এক ক্যাপ্টেনের প্রচণ্ড চড়ে, ডান হাতের কবজির একটু ওপরে হাড় ফেটে গিয়েছে লাঠির বাড়িতে— কপাল ভালো একেবারে ভেঙে দু'টুকরো হয়নি। নূরজাহানের বোনের স্বামী ডাঃ আশেকুর রহমান মিটফোর্ডে আছেন— দীনু তাঁর কাছ থেকেই চিকিৎসা নিচ্ছে মিটফোর্ড গিয়ে— কানের এবং হাতের। ডাঃ আশেকুর রহমান বলেছিলেন হাতটা প্লাস্টার করলে ভালো হয়। তাড়াতাড়ি সারবে। কিন্তু দীনু ভয়ে হাত প্লাস্টার করতে পারেনি। যদি রাস্তায় মিলিটারি দেখলে 'মুকুত' বলে ধরে। একেইতো তার চুল ঘাড় পর্যন্ত লম্বা ছিল বলে এম পি এ হোস্টেলে খানসেনারা তাকে 'ইয়ে শালা মুকুত হ্যায়' বলে বেশি পিটুনি দিয়েছে। হাত প্লাস্টার না করার ফলে সারতে দেরি হচ্ছে। বাঁ কানটাও খুব কষ্ট দিচ্ছে। এর ওপর সব ভাইয়েরই হাতের আঙুলের গিঁট মচকানো, কোমরে প্রচণ্ড ব্যথা— এসব তো আছেই।

জামী বলল, 'মামা, আমারও কোমরে মাঝে-মাঝে বেশ ব্যথা করে, আব্বুরও। তবুও তো আমাদের কাউকে হুকের সঙ্গে ঝোলায়নি, মাথা নীচে দিয়ে ফ্যানের সঙ্গে ঘোরায়নি, তাইতেই এই অবস্থা! স্বপনভাই, উলফাতভাইয়ের আব্বাদের যে কী খারাপ অবস্থা। ওঁরা তো এখনও নিজে নিজে হাঁটতে পারেন না, ধ'রে নিতে হয়। তবুতো ওঁদের ছেলেরা বেঁচে গিয়েছে, সেটাই ওঁদের মস্ত সান্ত্বনা।'

জামীকে এভাবে কথা বলতে শুনে আমি ভিতরে ভিতরে চমকে গেলাম। রুমীর গ্রেপ্তার ওকেও কতখানি কাবু করেছে, বুঝতে পারলাম। ছোটবেলায় দু-ভাই খুব মারামারি করত, কিন্তু একটু বড় হতেই রুমী ওর কাছে 'হিরো' হয়ে উঠেছিল।

একটু পরে জামী আবার বলল, 'স্বপনভাই কীভাবে পালিয়েছিল, তোমরা কেউ শুনেছ নাকি? মিলিটারি নাকি বাড়ির সামনের দিকটা ভরে ফেলেছিল, তারই মধ্যে স্বপনের মা ওকে ঠেলে পিছনের দরজা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন। ওদের বাড়িটা একতলা ছিল, আর পিছনদিকে কচু বন, ঝোপঝাড়, তারপর বস্তি এইসব ছিল। সামনের বারান্দার জানালা দিয়ে মিলিটারিরা নাকি দেখতে পেয়েছিল স্বপনের মা স্বপনকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছেন। তাতেই তো মিলিটারিরা আরও বেশি রেগে গিয়েছিল স্বপনের বাবার ওপর।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুই কার কাছে শুনলি এত কথা?'

'আমার স্কুলের এক বন্ধু ওই পাড়ায় থাকে। স্বপনভাইদের বাড়ির খুব কাছে। আজ দুপুরে যে মিষ্টি কিনতে গিয়েছিলাম মরণচাঁদে, সেখানে ওর সঙ্গে দেখা। তখন বলল।'

আমি ৩০ আগস্ট ভোরে স্বপনের উদভ্রান্ত চেহারাটা মনে করে বললাম, 'ইস, অতবড় বিপদ গিয়েছিল রাতে, তাও সোনামানিক আমার সকালবেলা ছুটে এসেছিল খবর দিতে। আমি যখন বললাম, 'রুমীরা ধরা পড়েছে, তুমি এক্ষুনি পালাও।' তখন কিন্তু একটা কথাও বেরোয়নি ওর মুখ দিয়ে। একেবারে নীরবে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল। বলতে পারল না যে ওর বাড়িতেও সর্বনাশ ঘটে গিয়েছে। আহারে! যেখানেই থাকুক, আল্লা ওকে ভালো রাখুন।'

১১ অক্টোবর সোমবার ১৯৭১

শরীফ বলল, 'সেই যে মাসখানেক আগে কাগজে পড়েছিলাম ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের কথা, তার সম্বন্ধে আজ শুনে এলাম।'

'কী শুনে এলে? কোথায় শুনলে?'

'ডাঃ রাবির কাছে। রাব্বি— জানো তো; আমাদের সুজার ভাস্তে।'

আলমগীর কবির

প্রথম যেদিন স্বাধীন বাংলা বেতারে সালেহ আহমদের কণ্ঠে খবর শুনি, খুব চেনা-চেনা লেগেছিল, দু'একদিন পরেই চিনেছিলাম— সে কণ্ঠ হাসান ইমামের। ইংরেজি খবর ও ভাষ্য প্রচার করে যারা, সেই আবু মোহাম্মদ আলী ও আহমেদ চৌধুরী হল আলী যাকের আর আলমগীর কবির।

শরীফের এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু সুজা সাহেব, তাঁর ভাস্তে ডাঃ ফজলে রাব্বি।

শরীফ বলল, 'আজ ফকিরের অফিসে গিয়েছিলাম, ওখানে রাব্বির সঙ্গে দেখা। ওর মুখেই শুনলাম মতিউর রহমানের ফ্যামিলি ২৯ সেপ্টেম্বর করাচি থেকে ঢাকা এসেছে। মতিউর রহমানের শ্বশুর গুলশানের এক বাড়িতে থাকেন। সেখানে ৩০ তারিখে মতিউরের চল্লিশা হয়েছে। রাব্বি গিয়েছিল চল্লিশায়। মিসেস মতিউর নাকি বাংলা বিভাগের মনিরুজ্জামানের শ্যালী।'

'আমাদের স্যার মনিরুজ্জামানের? তার মানে ডলির বোন? দাঁড়াও, দাঁড়াও— এই বোনকে তো দেখেছি ডলিদের বাসায়— মিলি এর নাম।'

ডলির কথা মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ডলি, মনিরুজ্জামান স্যার, ওদের কোনও খোঁজই জানি না। দুটো বাচ্চা নিয়ে কোথায় যে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে— কে জানে। ওপারেও যায়নি, গেলে বেতারে নিশ্চয় গলা শুনতে পেতাম। স্বাধীন বাংলা বেতারে বহু পরিচিতজনের গলা শুনি, তারা ছদ্মনাম ব্যবহার করে, কিন্তু গলা শুনে চিনতে পারি। প্রথম যেদিন স্বাধীন বাংলা বেতারে সালেহ আহমদের কণ্ঠে খবর শুনি, খুব চেনা-চেনা লেগেছিল, দু'একদিন পরেই চিনেছিলাম— সে কণ্ঠ হাসান ইমামের। ইংরিজি খবর ও ভাষ্য প্রচার করে যারা, সেই আবু মোহাম্মদ আলী ও আহমেদ চৌধুরী হল আলী যাকের আর আলমগীর কবির। গায়কদের গলা তো সহজেই চেনা যায়— রথীন্দ্রনাথ রায়, আবদুল জব্বার, অজিত রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, হরলাল রায়। কথিকায় সৈয়দ আলী আহসান, কামরুল হাসান, ফয়েজ আহমদ প্রায় সকলেরই গলা শুনে বুঝতে পারি। নাটকে রাজু আহমেদ, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়— এদের সবার গলাই এক লহমায় বুঝে যাই।

১৪ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

আজ সারা শহরে হইচই! গতকাল রাতে দু'জন মুক্তিযোদ্ধা বনানীতে মোনেম খানের বাড়িতে ঢুকে তাকে গুলি করে পালিয়ে গিয়েছে। ভোররাতে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মোনেম খান মারা গিয়েছে। খবর কাগজে ছবিসহ বেশ বিস্তারিতভাবেই তার হত্যাকাহিনি ছাপা হয়েছে। কাগজে অবশ্য 'দুষ্কৃতকারী' এবং 'আততায়ী' বলা হয়েছে। সন্ধ্যার পর মোমেন খান তার ড্রয়িংরুমে বসে মেহমানদের সঙ্গে কথা বলছিল। মেহমানরা ছিল প্রাক্তন প্রাদেশিক শিক্ষামন্ত্রী আমজাদ হোসেন, কয়েকজন মুসলিম লিগ নেতা আর মোনেম খানের জামাই জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ আদেল। ড্রয়িংরুমের সদর দরজা খোলা ছিল, মোনেম খান দরজার দিকে মুখ করে বসেছিল। বাইরের বারান্দার বাতি নেভানো ছিল। এমনি অবস্থায় দরজার কাছ থেকে কে বা কারা মোনেম খানকে লক্ষ করে এক

আইয়ুব খান ও মোনেম খান (ডানদিকে)

এই মোনেম খান— এই বাংলারই কুসন্তান মোনেম খান, আইয়ুব খানের আমলে গভর্নর হয়ে বাঙালিদের বুকের ওপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিল ছয়-সাত বছর ধরে। মানুষ সহ্য করতে করতে শেষে আর না পেরে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে। প্রভু আইয়ুব খানের পতনের আগেই তার বশংবদ তাঁবেদার মোনেম খানের পতন হয়।

রাউন্ড গুলি ছোড়ে, গুলি তার পেটে বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোনেম খানের রক্তাক্ত দেহ সোফা থেকে মাটিতে পড়ে যায়। গুলি ছুড়ে আততায়ী অন্ধকারের মধ্যে পালিয়ে যায়। মোনেম খানকে হাসপাতালে নেওয়ার পর জানা যায় গুলি তার পেট-পিঠ ছেদা করে বেরিয়ে গিয়েছে। অবস্থা খুব গুরুতর। মাঝরাতে অপারেশনও করা হয় কিন্তু রুগিকে বাঁচানো যায়নি।

আজ ফখরুকে হাসপাতালে দেখতে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু কাগজে মোনেম খানের ঘটনা পড়ার পর ভাবলাম আজ আর হাসপাতালের দিকে না যাওয়াই ভালো। নিশ্চয়ই মিলিটারিতে গিজগিজ করছে জায়গাটা। দাঁতের ডাক্তার ফখরুজ্জামানের কিডনিতে ক্যান্সার ধরা পড়েছে গত মাসে। সে আছে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নিউ কেবিনে। ফখরুর সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বিশ বছরের। আপন ছোট ভাইয়ের মতো। মনটা খুব দমে গিয়েছে খবরটা শুনে। ক্যান্সারের মতো ভয়াবহ রোগের ছোবল!

ফখরু বিলেতে গিয়ে অপারেশন করাবে, স্থির করেছে। তার জোগাড়যন্তর চলছে।

বেরোব বলে ঠিক করেছিলাম, তাই ঘরে বসে থাকতে মন চাইল না। ভাবলাম নিউ মার্কেটে গিয়ে কিছু ওষুধপত্র কিনে, মিষ্টির দোকান থেকে আজ বিকেলে পাগলাপিরের মিলাদের মিষ্টি কিনে নিয়ে আসি এখনই।

যে দোকানেই যাই, সবখানে চাপা উল্লাস আর ফিসফিস কথাবার্তা। মোনেম খান মরেছে— এর চেয়ে সুখবর আর বুঝি কিছু হতে পারে না! বিচ্ছুরা কীরকম অনায়াসে বারান্দায় উঠে দরজার কাছ থেকে গুলি করে চলে গেল, ঘরভর্তি লোক কেউ কিছু করতে পারল না— এর চেয়ে সফল অ্যাকশন আর বুঝি কিছু হতে পারে না। মিষ্টির দোকানে গিয়ে আমি হতভম্ব। মিষ্টির দোকান সাফ! সকাল থেকে দলে দলে লোক এসে মিষ্টি কিনে নিয়ে গিয়েছে। ঢাকা কলেজের উল্টোদিকে প্রায় পাশাপাশি দুটো দোকান— মরণচাঁদ আর দেশপ্রিয়। দুটো দোকান থেকে কুচিয়ে-কাচিয়ে জিলিপি পেলাম সের দুয়েক আর রসগোল্লা-কালোজাম-চমচম সব মিলিয়ে সের দেড়েক! আর কিছু নেই দোকানে!

বাসায় ফিরে ভাবতে লাগলাম একটা অত্যাচারী লোকের ওপর কতখানি ঘৃণা থাকলে লোকে তার খুন হওয়ার খবরে এরকম খুশিতে উল্লসিত হয়ে মিষ্টি কিনে দোকান সাফ করতে পারে! এই মোনেম খান— এই বাংলারই কুসন্তান মোনেম খান, আইয়ুব খানের আমলে গভর্নর হয়ে বাঙালিদের বুকের ওপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিল ছয়-সাত বছর ধরে। মানুষ সহ্য করতে করতে শেষে আর না পেরে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে। প্রভু আইয়ুব খানের পতনের আগেই তার বশংবদ তাঁবেদার মোনেম খানের পতন হয়। তারপর কয়েক বছর মোনেম খান বাড়ির ভিতরেই দিন কাটিয়েছে। বাইরে আর বেরোয়নি। কিন্তু একাত্তরের মাঝামাঝি আবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পাকিস্তানি শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিছু একটা করার তোড়জোড় করছিল।

বিকেলে পাগলাপিরের আস্তানাতেও দেখলাম সমাগত লোকজনের মুখে চাপা উল্লাস। কে একজন ফিসফিস করে বলল, 'পাগলা বাবার উচিত আজ মিলাদ শেষে

ওই বিচ্ছুগুলোর জন্য দোয়া করা।'

কিন্তু পাগলাপিরের মুখ আজ অসম্ভব গম্ভীর! মেজাজও বেজায় রুক্ষ! কিছুটা বিচলিতও মনে হচ্ছে। কে জানে কী কারণে!

১৫ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৭১

গতকাল নিউ মার্কেটের ওষুধের দোকান থেকে যেসব ওষুধ কিনেছি, সেগুলো আজ প্যাকেট করতে বসেছি বেডরুমের দরজা বন্ধ করে। জামী তার দাদার কাছে বসে আছে। মা-লালু একটু বাইরে গিয়েছেন। এখন বিভিন্ন বর্ডারে যুদ্ধ খুব জোরেশোরে হচ্ছে। ওষুধের খুব দরকার। ওষুধ কিনে ছোট ছোট প্যাকেট করে রাখি। সুযোগমতো বিভিন্নজনের হাতে পাঠাই। শুধু ওষুধই নয়, টাকা, সিগারেট এসবও।

বেশিরভাগ কাটা-ছেঁড়ার ওষুধ কিনি— পেনিসিলিন অয়েন্টমেন্ট, টেরামাইসিন অয়েন্টমেন্ট, সালফানিলামাইড পাউডার, জামবাক, ডেটল, টিংচার আয়োডিন, টিংচার বেনজিন, তুলো, গজ। তাছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক— টেরামাইসিন, পেনব্রিটন, ক্লোরোমাইসেটিন। কারও কারও টাইফয়েডও হয়ে যেতে পারে।

আমাশয়ের ওষুধেরও খুব চাহিদা। সেগুলোও কিনি— ফ্ল্যাজিল, নিভেম্বিন, অ্যাম্বিকুইন, এন্টারোভায়োফর্ম, নিয়োভায়াসেপ্ট।

জ্বর-মাথা ধরার জন্য নোভালজিন, ড্রিস্পিন। সর্দি-কাশিতে আরামের জন্য ভিকস, ইউক্যালিপ্টাস তেল। মচকানো ব্যথার জন্য আয়োডেকস। এছাড়া ছোট কাঁচি ও ব্লেড একটা করে দিয়ে দিই প্রতি প্যাকেটে। এমার্জেন্সির সময় নিজেরাই যেন ব্যান্ডেজ করে নিতে পারে।

১৭ অক্টোবর রবিবার ১৯৭১

আজ ঝিনুদের বাসায় মিলাদ। নতুন বাসায় আসার মিলাদ। মিলাদ শেষে রাঙামা বললেন, 'মাগো, একটু বসে যাও। কথা আছে।'

ঝিনুর মাকে আমি রাঙামা বলে ডাকি। এই প্রৌঢ় বয়সেও এমন কাঁচা সোনার মতো রং, এমন দেবী প্রতিমার মতো রূপ, এমন মধুর স্নেহমাখা ব্যবহার— রাঙামা ছাড়া অন্য কোনও ডাক মুখেই আসে না।

লোকজন একে একে চলে গেলে রাঙামা

> রুমির এখনও কোনও হদিশ বের করা সম্ভব হয়নি। পাগলা বাবা ক্রমাগত আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন, আমরা ক্রমাগত বাবাকে প্রতি বৃহস্পতিবার একটি করে পঞ্চাশ টাকার নোট, পাঁচ-সাত সের মিষ্টি, এক কার্টন ৫৫৫ সিগারেট (বাবা ৫৫৫ ছাড়া খান না) নজরানা দিয়ে যাচ্ছি। যখনই দরকার, তখনই ড্রাইভারসহ গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখন আর ফজরের নামাজের আগে যাই না।

ভেতরের একটা ছোট ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন, সেখানে একটা চৌকিতে দুটো ছেলে বসেছিল। আমি ঢুকতেই একটি ছেলে উঠে এগিয়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করল। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে উঠলাম, 'ইকু।'

মান্নানের বড় ভাই বাকি সাহেবের ছেলে ইকু— ২৮ আগস্ট শাহাদত আলমের সঙ্গে মেলাঘর চলে গিয়েছিল।

'তুমি কবে এসেছ ইকু?'

'এসেছি এ মাসের প্রথমেই।'

ইকুর মুখে শুনলাম ষাটজন গেরিলার বিরাট একটা দলের সঙ্গে ও এসেছে। ক্যাপ্টেন হায়দার অনেক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এই দলকে ঢাকায় পাঠিয়েছেন গেরিলা অপারেশন করার জন্য। ওরা গোপীবাগের পিছন দিক দিয়ে ঢাকায় ঢুকেছে। ঢাকার বাইরে ওদিকে বাইগদা বলে একটা গ্রামে ওদের বেস ক্যাম্প— সেখান থেকে অল্পে অল্পে অস্ত্রশস্ত্র ঢাকার ভেতর নিয়ে আসছে।

তাদের অস্ত্র আনার পদ্ধতি শুনলাম। ভোরবেলা গ্রাম থেকে লোকেরা ঝুড়িভর্তি শাকসবজি নিয়ে ঢাকায় আসে। তাদের সঙ্গে মিশে সবজিওয়ালা সেজে ঝুড়িতে সবজির তলায় ছোট অস্ত্র লুকিয়ে আনে। বড় অস্ত্রগুলো সাধারণত বস্তার ভিতরে অন্য জিনিসের সঙ্গে ভরে রাত্রিবেলা নিয়ে আসে।

২১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

সকাল সাড়ে সাতটার সময় তৈরি হয়ে ডাঃ খালেকের সঙ্গে সেক্রেটারিয়েট এসেছি। ফখরুজ্জামানের মেডিক্যাল বোর্ডের অর্ডার হেলথ মিনিস্ট্রি থেকে হাতে হাতে বের করে না নিলে কতদিন যে লাগবে, কে জানে। এদিকে ওর বিলেত যেতে যত দেরি হবে, ওর কিডনির ক্যান্সারও তত বেশি খারাপ হতে থাকবে।

অর্ডার টাইপ হয়ে সই হয়ে হাতে আসতে আসতে বারোটা বাজল। কাগজ নিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এলাম। এখন এটাতে ডাঃ আলী আশরাফের সই লাগবে। তিনি অপারেশন থিয়েটারের ভেতর। ফখরুর বউ আঞ্জুকে সঙ্গে নিয়ে অপারেশন থিয়েটারের সামনে যে ছোট্ট অ্যান্টিরুম আছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে আছি। ওয়ার্ড বয়ের হাতে করকরে দুটো দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটা অপারেশন শেষ করে মুখের মাস্ক খোলামাত্রই যেন ডাঃ আলী আশরাফকে সে বলে যে আমি খুব জরুরি ব্যাপারে তাঁর জন্য এখানে অপেক্ষা করছি। অবশ্যই যেন দু'মিনিটের জন্য তিনি এ ঘরে আসেন। একটু দেরি হলেই কিন্তু আর ওঁকে পাওয়া যাবে না।

ডাঃ আলী আশরাফ খুব রাগী মানুষ। এভাবে অপারেশন থিয়েটার থেকে ডেকে আনার স্পর্ধা স্বরূপ ওয়ার্ড বয় তো বকা খাবেই, আমারও কপালে কী আছে, কে জানে। কিন্তু এদিকে আর তো সময় নেই। আজ ওঁর সই না হলে ফরেন এক্সচেঞ্জ জোগাড় করতে দেরি হয়ে যাবে। আগামীকাল, পরশু দু'দিনই এগারোটা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক, তার পরদিন রোববার— ব্যাঙ্ক বন্ধ।

ডাঃ আলী আশরাফ গনগনে মেজাজ নিয়ে এলেন, প্রচণ্ড বকাবকি করলেন আমায়— তাঁকে এভাবে দুই অপারেশানের মাঝখানে ডেকে পাঠানোর জন্য। আমিও গলা চড়িয়ে বললাম, 'এছাড়া আর উপায়

রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল

মাত্র কয়েকটা দিন ঢাকা শহর নিথর ছিল। তারপরই আবার বিচ্ছুরা কিলবিল করতে শুরু করেছে। আবার দলে দলে গেরিলারা ঢাকায় ঢুকছে বিভিন্ন দিক দিয়ে, ইউসুফ বাচ্চুরা সাভারের দিক দিয়ে, ইকুরা গোপীবাগের দিক দিয়ে। আরও কত কত দল কত দিক দিয়ে ঢাকায় ঢুকছে, তার সব খবর কি আমি জানি।

ছিল না। একটা লোক মরতে বসেছে। দেরি করলে তার আর কোনও চান্স থাকবে না।'

বকাবকি করতে করতেই সইটা করে দিলেন ডাঃ আলী আশরফে। সব ভুলে দাঁত বের করে হেসে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ফখরুজ্জামানের কেবিনে ঢুকে দেখি ডাঃ ফজলে রাব্বি তাকে দেখতে এসেছেন। শুনলাম ফখরুকে রাব্বি বলছেন, 'যান, ভালো হয়ে ফিরে আসুন। এসে দেখবেন আমরা হয়তো অনেকেই নেই।'

২২ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৭১

আজ থেকে রোজা শুরু হয়েছে। শরীফ, জামী, বুড়া মিয়া তিনজনেই রোজা। মা আর লালু গত পরশুদিন নিজেদের বাড়িতে ফিরে গিয়েছেন।

রুমির এখনও কোনও হদিশ বের করা সম্ভব হয়নি। পাগলা বাবা ক্রমাগত আমাদেরকে আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছেন, আমরা ক্রমাগত বাবাকে প্রতি বৃহস্পতিবার একটি করে পঞ্চাশ টাকার নোট, পাঁচ-সাত সের মিষ্টি, এক কার্টন ৫৫৫ সিগারেট (বাবা ৫৫৫ ছাড়া খান না) নজরানা দিয়ে যাচ্ছি। যখনই দরকার, তখনই ড্রাইভারসহ গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখন আর ফজরের নামাজের আগে যাই না, কারণ তিন সপ্তাহ ঝাড়ার পরও যখন লালুর মাইগ্রেন সারার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না, তখন স্বাভাবিক বুদ্ধি ও সৌজন্যবশতই নিঃশব্দে ভোরে যাওয়া বন্ধ করেছি। কিন্তু গতকাল বাবা আবার বললেন, কাল ভোরে আসিস। তাই আজ ভোরে গিয়েছিলাম। রোজার প্রথমদিন এত ভোরে কোথাও যাওয়া যে কী কষ্টকর। তবু গেলাম। গতকাল সাপ্তাহিক মিলাদের পর আমি বাবাকে চেপে ধরেছিলাম, খুব কান্নাকাটি করেছিলাম। বাবা তাই বলেছিলেন, তিনি সারারাত হুজরাখানায় আল্লার কাছে এবাদত করবেন, সকালে যেন যাই। খুব একটা আশা নিয়ে সকালে গিয়েছিলাম, কোনও সুখবর নিশ্চয় তিনি দেবেন। কিন্তু তিনি শুধু বললেন রোববার পর্যন্ত দেখি, তারপর যা হয় করা যাবে। আটটায় বাড়ি ফিরে আবার গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি— পাগলা বাবার দরকার।

কিছু ভালো লাগছে না, মাথা ধরে উঠছে। কষ্টে, হতাশায়, অক্ষম রাগে চোখ দিয়ে দরদর করে পানি বেরোচ্ছে, ঠেকাতে পারছি না। মাসুমা গতকাল একটা কাজের ছেলে এনে দিয়েছে— ওসমান। তাকেও কিছু কাজ দেখিয়ে দেওয়া উচিত, তাও পারছি না।

এইরকম পাগল পাগল অবস্থা থেকে রেহাই দিল মোতাহার, রেজিয়া আর মিনি। মোতাহারুল হক, শরীফের এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু, রেজিয়া তার বউ, মিনি তার বড় ভাইয়ের মেয়ে।

রেজিয়া অর্থাৎ বাচ্চু আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ওরও শুধু ছেলে— আমার মতো, কোনও মেয়ে নেই। তাই বোধহয় মিনিকে প্রায় প্রায়ই ওদের সঙ্গে দেখা যায়। মিনি খুব চমৎকার মেয়ে, হাসিখুশি, মিশুক, ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, রবীন্দ্রসঙ্গীত গায় ভারি সুন্দর। অন্য সময় মিনিকে গান গাইতে বললে বাহানা করে, গা-মোড়ামুড়ি দেয়, আজ বলা মাত্র ও গাইতে শুরু করল। আমার কান্নায় ফোলা লাল চোখের দিকে চেয়ে ও গাইল:

দুঃখ যদি না পাবে তো
দুঃখ তোমার ঘুচবে কবে?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
দহন করে মারতে হবে।

জ্বলতে দে তোর আগুনটারে
ভয় কিছু না করিস তারে।
ছাই হয়ে সে নিভবে যখন
জ্বলবে না আর কভু তবে।।

এড়িয়ে তারে পালাস নারে
ধরা দিতে হোসনা কাতর।
দীর্ঘ পথে ছুটে ছুটে
দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর।

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে দে একেবারে
তার পরে সেই জীবন এসে
আপন আসন আপনি লবে।।

মিনিরা থাকে রোকনপুরে— ওদের পৈতৃক বাড়িতে। মোতাহাররাও গুলশানের বাড়ি ছেড়ে রোকনপুরের বাড়িতে চলে গিয়েছে। বাচ্চুর বাপের বাড়িও শ্বশুরবাড়ির দুটো বাড়ির পরেই। মার্চে ক্র্যাকডাউনের পর থেকেই আমাদের সকলের মধ্যে একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে আত্মীয়স্বজন মিলে কাছাকাছি একত্রে থাকার। সামরিক জান্তার প্রতিকারহীন নির্যাতনের মুখে অরক্ষিত অসহায় বাঙালি পরিবারগুলো কাছাকাছি থেকে এভাবেই বোধ করি শক্তি ও সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করে।

আমার মানসিক অবস্থা দেখেই কি না জানি না, ওরা বহুক্ষণ রইল আমার সঙ্গে। মিনির কাছ থেকে জানতে পারলাম ঢাকার কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধার কার্যকলাপ।

বাচ্চুর বড় বোনের ছেলে জন, বাচ্চুর বড় ছেলে দোলনের বন্ধুর ছোট ভাই আরিফ, তাদের বন্ধু ফেরদৌস— এরা সব স্কুলের ছাত্র, কিন্তু সবাই দুর্ধর্ষ বিচ্ছু। জন থাকে নারিন্দায়, ফেরদৌস মগবাজারে, আরিফ ধানমণ্ডিতে কিন্তু এরা সবাই মিনিদের বাড়িতে আসে, খায়, প্ল্যান-পোগ্রাম করে। এদের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকে আসে— গান গায় যে মাহবুব, যাকে ওরা এল পি মাহবুব বলে ডাকে, সে আসে, সোহেল আসে, ফিরোজ আসে। এদের সঙ্গে যোগ রয়েছে নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু, রাইসুল ইসলাম আসাদ, মানিক এবং অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার। ওরা বিরাট এক দল সাভারের কাছে কোনও এক গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে, গ্রামের নাম মিনি জানে না, কিন্তু ওখান থেকে ঢাকা শহরে অস্ত্র আনতে মিনি আর ডালিয়া সালাহউদ্দিনের খালা শাহানা সাহায্য করে। আরিফ গাড়িতে করে মিনি আর শাহানাকে সাভারের কাছাকাছি এক নদীর ধার পর্যন্ত নিয়ে যায়, সেখানে গাড়িতে অস্ত্র ওঠানো হয়। গাড়িতে মহিলা থাকলে সাধারণত মিলিটারিরা চেকপোস্টে গাড়ি সার্চ করে না, কখনও-সখনও শুধু থামিয়ে দুয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করে ছেড়ে দেয়। সেজন্যই মিনি আর শাহানা গাড়িতে বসে থাকে।

বুঝলাম, মিনি যে নাসিরুদ্দিন ইউসুফ বাচ্চুর কথা বলছে, সে-ই হচ্ছে মঞ্জুরের ভাগনে বাচ্চু— যার কথা শরীফ আমাকে আগেই বলেছে। আমি মিনির কাছে ভাঙলাম না যে আমি ওদের কথা আগেই জেনেছি। আমি শুধু মিনির কথা শুনে যাচ্ছি, যত শুনেছি, তত আমার বুকের ওপর থেকে চাপ চাপ ভার হালকা হয়ে যাচ্ছে, আমার মনের ভেতর থেকে কষ্ট, হতাশা আর রাগ উবে যাচ্ছে। ২৯-৩০ আগস্টের গ্রেপ্তারের পর মাত্র কয়েকটা দিন ঢাকা শহর নিথর ছিল। তারপরই আবার বিচ্ছুরা কিলবিল করতে শুরু করেছে। আবার দলে দলে গেরিলারা ঢাকায় ঢুকছে বিভিন্ন দিক দিয়ে, ইউসুফ বাচ্চুরা সাভারের দিক দিয়ে, ইকুরা গোপীবাগের দিক দিয়ে। আরও কত কত

> সব বাঙালিই যে দেশপ্রেমিক নয়, সে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি আমরা সবাই। নইলে রুমীর বন্ধু বদি যে সব্বার আগে দুপুরবেলা ধরা পড়েছিল, সে তো তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়ি থেকে ধরা পড়েছিল। বন্ধুটি যে পাকিস্তানের দালাল ছিল, তাতে তো আর কোনও সন্দেহ নেই।

দল কত দিক দিয়ে ঢাকায় ঢুকছে, তার সব খবর কি আমি জানি।

এই যে গত পরশু বুধবার দুপুর একটার সময় স্টেট ব্যাঙ্কের ছতলায় একটা বাথরুমে বোমা বিস্ফোরিত হয়ে দু'জন পাকিস্তানি কম্যান্ডো মরেছে, যে বিচ্ছুরা এ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তাদের নাম আমি জানি না। তার আগের দিন মঙ্গলবার সকালের দিকে মতিঝিলে ই পি আই ডি সি, হাবীব ব্যাঙ্ক আর প্রুডেন্সিয়াল বিল্ডিংগুলোর সামনের রাস্তায় বোমা বিস্ফোরিত হয়ে ওখানে পার্ক করা ছটা গাড়ি নষ্ট হয়েছে, বিল্ডিং তিনটের সামনের দিকে সব জানলার কাচ ভেঙেছে। যে ছেলেরা দিনে-দুপুরে এই অসম সাহসিক বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, তাদের নামও আমি জানি না। তারও দু'দিন আগে ১৮ তারিখে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলে বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। কে করেছে, জানি না।

কিন্তু নাম না জানলেও এটা বুঝতে পারছি তারা মুক্তিবাহিনীর গেরিলা, তারা আমাদেরই প্রত্যেকটি বাঙালি ঘরের দামাল ছেলে। সেই যে রুমী একটা কবিতা আবৃত্তি করেছিল :

পারলে নীলিমা চিরে বের
করতো তোমাকে ওরা, দিত ডুব গহন পাতালে।
তুমি আর ভবিষ্যৎ যাচ্ছো হাত ধ'রে পরস্পর।
সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি, দুঃখ-তাড়ানিয়া
তুমিতো আমার ভাই, হে নতুন, সন্তান আমার।

'গেরিলা' নামের সেই কবিতাটির কথা এখন আমার মনে পড়ল।

মিনির মুখে এই দামাল ছেলেদের আরও একটা কীর্তির কথা শুনলাম : 'জানেন চাচি, এবার ১৪ আগস্ট কী হয়েছিল? বেলুনে গ্যাস ভরে বেলুনের সঙ্গে বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ আর নৌকো বেঁধে ছেড়ে দিয়েছিল ওরা। জনের বড় দুলাভাইয়ের বেলুনের ফ্যাক্টরি আছে, সেইখান থেকে অনেক বেলুন এনে বাসার মধ্যে লুকিয়ে গ্যাস ভরা হয়েছিল। কায়েদে আজম কলেজের কয়েকটা ছেলে গ্যাস নিয়ে এসেছিল। আমরা সব কাগজ দিয়ে ছোট ছোট ফ্ল্যাগ আর নৌকো বানিয়েছিলাম। ভোর রাতের দিকে আমাদের বাড়ির ছাদ থেকে ওগুলো ওড়ানো হয়। নৌকো বাঁধা একটা বেলুনের সুতো নবাবপুরের একটা ইলেক্ট্রিক তারে আটকে গিয়ে ঝুলছিল। তাই নিয়ে সেখানে কী হইচই! রাজাকাররা সেইখানে আর কাউকে দাঁড়াতে দেয় না। মোহন চাচা নবাবপুরে বাজার করতে গিয়ে এই দৃশ্য দেখে বাজার-টাজার ভুলে বাড়ি চলে আসেন। এই নিয়ে সেদিন সারা পাড়াতেই টেনশন! কী জানি, যদি পাড়া সার্চ করতে আসে মিলিটারি?'

'এসেছিল?'

মিনি ঝরঝর করে হেসে বলল, 'নাঃ, আসেনি।'

২৩ অক্টোবর শনিবার ১৯৭১

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের উপনির্বাচন নিয়ে ক'দিন খবর কাগজের পৃষ্ঠা সরগরম। কতগুলো আসনে কতজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করছে, তা বেশ ফলাও করে রোজ ছাপা হচ্ছে। কেউ কেউ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়ে যাচ্ছে।

ফকির বললেন, 'এরা তো নির্বাচিত হয়ে গেল, বাকিরাও হয়তো হবে। এরা কি কখনও ভেবে দেখেছে— এরপর এদের অদৃষ্টে কী আছে?' শরীফ ভুরু কুচকে বলল, 'কী আছে?'

'কাফনের কাপড়, লোবান আর পঞ্চাশ টাকার একটা নোট।'

আমি বললাম, 'পঞ্চাশ টাকার তো নয়, দশ টাকার নোট।'

'ওটা তো গ্রামের শান্তি কমিটির মেম্বারদের জন্য। হাজার হলেও এরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, এদের বেলায় দশ টাকা একটু কম হয়ে যায় না? মর্যাদাহানিকরও বটে।'

আজকাল শুনতে পাই মুক্তিযোদ্ধারা নাকি খুব বেশি খারাপ। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান, মেম্বার, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, মেম্বারদের একটা কফিনের কাপড়, এক প্যাকেট লোবান আর দশটা টাকাসহ একটা চিঠি পাঠিয়ে দেয়— 'যা খাওয়ার ইচ্ছে হয়, ওই দশ টাকায় খেয়ে নাও, তোমার দিন শেষ হয়ে আসছে।'

আমি বললাম, 'এতগুলো বাঙালি মনোনয়নপত্র দাখিল করবে, আমি কিন্তু আশা করিনি।'

ফকির বললেন, 'কেন আশা করেননি ভাবী? সব বাঙালিই যে দেশপ্রেমিক নয়, সে তো চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি আমরা সবাই। নইলে রুমীর বন্ধু বদি যে সব্বার আগে দুপুরবেলা ধরা পড়েছিল, সে তো তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়ি থেকে ধরা পড়েছিল। বন্ধুটি যে পাকিস্তানের দালাল ছিল, তাতে তো আর কোনও সন্দেহ নেই। বদি দুপুরবেলা আরেক বাঙালি বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ল বলেই না পরবর্তীকালে এতবড় সর্বনাশ হল। তেমনই অনেক অযোগ্য-অকর্মা বাঙালি, যারা এতদিন কিছুই করতে পারেনি, তারা এই সুযোগে অ্যাসেম্বলি মেম্বার হতে পারছে।'

শরীফ বলল, 'তবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এতসব ক্যান্ডিডেট নির্বাচিত হয়ে যাচ্ছে দেখে একটা সন্দেহও হচ্ছে। বেশিরভাগ জায়গাতেই বেয়নেটের গুঁতোর ভয় দেখিয়ে ক্যান্ডিডেট খাড়া করা হয়েছে, একটার বেশি পাওয়া যায়নি। তাই কনটেস্টও হয়নি। ক্লাসে একটাই মাত্র ছাত্র, কাজেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।'

'কেন, বহু জায়গায় তো একের বেশিও মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছে।'

'মনে হয়, ওগুলো সব লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য বানানো খবর। আসলে একটাই জোগাড় হয়েছে অতি কষ্টে।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। তোমাদের নিজেদের রান্না করা লাগবে না। আমাদের সঙ্গেই খাবে তোমরা। কি, আমাদের হাতের রান্না খেলে জাত যাবে না তো আবার?' চৈতন্য লজ্জা পেয়ে হাসল, 'কী যে বলেন আম্মা। এখন বলে পেরান লয়া টানাটানি—'

২৬ অক্টোবর মঙ্গলবার ১৯৭১

আজ সকালে হঠাৎ চৈতন্য এসে হাজির। চৈতন্য আমাদের অনেকদিনের পুরনো কাঠমিস্ত্রি। খুব সৎ আর পরিশ্রমী। তাই বন্ধুবান্ধব কারও কাঠমিস্ত্রির দরকার হলে আমরা বিনা দ্বিধায় চৈতন্যকে পাঠিয়ে দিই। বেশি সৎ আর সরল বলে চৈতন্য জীবনে তেমন উন্নতি করতে পারল না, মাঝে মাঝেই অভাব বেশি হলে আমাদের কাছে এসে বলে কোথাও কাজে লাগিয়ে দেন।

এখন ওকে দেখে আমরা হইহই করে উঠলাম, 'কী চৈতন্য? কেমন ছিলে এতদিন? কোথায় ছিলে? ইন্ডিয়া যাওনি?'

চৈতন্যরা সাতপুরুষের ভিটে ফেলে ইন্ডিয়ায় যেতে পারেনি। তাছাড়া বাড্ডার ওদিকে ওদের গ্রামে ঠিক সরাসরি মিলিটারির হামলাও হয়নি। কোনওমতে লুকিয়ে-চুরিয়ে থেকেছে, প্রাণে বেঁচেছে। তবে কাজ-কারবার নেই বললেই চলে। প্রথম কিছুদিন বসে খেয়ে কোনওমতে কাটিয়েছে। এখন দুবেলা উপোস দেওয়ার পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তাই সাহসে ভর দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

আমি বললাম, 'খুব ভালো সময়েই এসে পড়েছ। এই বাড়িতেই বেশকিছু কাজ জমে রয়েছে তোমাদের জন্য।'

মাঝে মাঝেই একবার করে গুজব ওঠে মিরপুর-মোহাম্মদপুর থেকে বিহারিরা এদিকপানে আসছে সব লুটপাট করতে। তখন পাড়ায় হইচই পড়ে যায়, সবাই নিজের নিজের বাড়ির দরজা-জানালার হুড়কো-ছিটকিনি ঠিক আছে কি না দেখতে থাকে। আমরাও অনেকদিন থেকে ভাবছি— আমাদের সামনের দিকের দরজা দুটোর পাল্লা বদলানো দরকার। পাল্লাগুলো এমন হালকা যে ভয় হয় এক লাথিতেই ভেঙে যাবে। তাছাড়া ডাইনিং রুম আর সিঁড়ির পাশের জানালা দুটোর কাচ বদলে কাঠ লাগিয়ে দেওয়ার কথাও ভাবছি কিছুদিন থেকে। কাচের জানালা বন্ধ করলেও যেন নিরাপদ মনে হয় না। চৈতন্যদের খোঁজ পাচ্ছিলাম না, নিউ মার্কেট থেকে অচেনা কাঠমিস্ত্রি ডেকে কাজ করানোতেও খুব সায় ছিল না। চৈতন্য নিজে থেকে এসে পড়াতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

চৈতন্য ওর ভাস্তে নিরঞ্জনকে সঙ্গে এনেছে। এর আগে সবসময় চৈতন্যই দরকারমতো কাঠ কিনে এনেছে। এবার বলল, 'আমার দুকানে যাইতে ডর লাগে। কাঠটা যদি সায়েবে কিন্যা আনেন।'

চৈতন্যরা যেখানে কাজ করে, সেখানেই থাকে। আগে বাড়ির উত্তরদিকের খালি গ্যারেজটায় থাকত। গেটটা এই গ্যারেজ বরাবর। গলিরাস্তা থেকে দেখা যায়। এবার ওদের থাকার ব্যবস্থা করে দিলাম দক্ষিণদিকের সারভেন্টস কোয়ার্টারের একটা ঘরে। বুড়া মিয়া একটা ঘরে থাকে, পাশের ঘরটা খালি।

চৈতন্যরা সারাদিন কাজ করে, দুপুরবেলা চিনি দিয়ে পাউরুটি খায়, সন্ধ্যায় বাজার করে রান্না করে। এবার চৈতন্য বলল, তাদের বাজারটাও যদি বুড়া মিয়া করে দেয়। তারা বাজারে যেতেও ভয় পায়।

আমি বললাম, 'ঠিক আছে। তোমাদের নিজেদের রান্না করা লাগবে না। আমাদের সঙ্গেই খাবে তোমরা। কি, আমাদের হাতের রান্না খেলে জাত যাবে না তো আবার?'

চৈতন্য লজ্জা পেয়ে হাসল, 'কী যে বলেন আম্মা। এখন বলে পেরান লয়া টানাটানি—'

বাড়ির ভেতরের উঠানে ওরা কাজ করে, দুপুরে-রাতে মাছ-তরকারি-ভাত ওদের ঘরে দিয়ে আসে বুড়া মিয়া। ওরা একদমই বাইরে বেরোয় না।

২৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার ১৯৭১

নিরঞ্জনের একটা পা খোঁড়া। কিন্তু মুখে কথার খই। চৈতন্য কথা বলে কম, হাসে আরও কম, হাঁটে ধীরে। নিরঞ্জন ঠিক উল্টো। খোঁড়া পা নিয়ে তুরতুর করে চলে, অনর্গল কথা বলে, যখন-তখন হাসে।

আমি প্রায় প্রায়ই ওদের কাজ দেখার জন্য মোড়া নিয়ে বসি উঠোনের একপাশে, নিরঞ্জন তার কাকার সঙ্গে হাত চালায়, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখও চলতে থাকে। গুলশান, বনানী, বাড্ডা অঞ্চলের সব খবর তার নখদর্পণে।

আজ বলল, 'দিদিমা, শোনছেননি মুনেম খাঁর লাশ নাকি কবর থনে উঠায়া ফেলছে?'

আমি চমকে গেলাম! সে কি কথা? শুনিনি তো? কারা করল? কেন?

বেশ একটা আত্মবিশ্বাসের ভাব নিয়ে নিরঞ্জন বলল, 'মুক্তিরা ওঠাইছে। অর মতো বেইমানের লাশ নাকি এই দ্যাশে থাকতে দিব না।'

চৈতন্য ধমক দিল, 'কি আজাইরা কথা কস নিরঞ্জন! এত কথা কস ক্যান?'

আমি বললাম, 'আহা, বলতে দাও, আমি শুনতে চাই। চৈতন্য, আমার কাছে কোনও কথা বলাতে তোমাদের ভয় নেই। আমার ছেলেওতো 'মুক্তি' ছিল। নিরঞ্জন, তুমি মুক্তিদের কথা এত জান কী করে?'

নিরঞ্জন উৎসাহ পেয়ে বলল, 'বারে জানমু না? আমাদের উইদিগে কী কম মুক্তি আছে? হেরা অ্যাকশুন করে, হ্যাগোর হাতে ইশটিনও আমি দেখছি না?'

চৈতন্য নিরুপায়ের মতো বলল, 'এই ছ্যারা ডুবাইবো আমারে। এত কথা কয়।'

'তোমার কোনও ভয় নেই চৈতন্য। আমার কাছে বললে কোনও ক্ষতি নেই। ওতো বাইরে কোথাও যায় না। হ্যাঁ নিরঞ্জন। তোমাদের গ্রামের মুক্তিদের কথা বল।'

'আমাগোর গেরামে তো মুক্তি নাই। তবে আশপাশের গেরামে আছে। আমরা শুনি তাগোর কথা। অনেক পোলা আগরতলা থন টেরনিং লয়া আইছে। আমাগোর উইদিকের এক পোলাই তো মুনেম খাঁরে মারছে। আমি সব জানি।'

আমি ভয়ানক কৌতূহলী হয়ে উঠলাম, 'বল কী? তোমাদের ওদিককার ছেলে? তুমি ঠিক জান যারা মেরেছে, তারা মুক্তিবাহিনীর ছেলে?'

অগোর মইধ্যে এক পোলা মুনেম খাঁরে মাইরা আসার পর কথাডা চাউর হয়া যায়। গেরামে কোনও কথা তো গোপন থাকে না। ওই পোলা অনেকদিন থেইকাই চেষ্টা করতাছিল— অয় নাকি মেলাঘর থেইকাই মুনেম খাঁরে মারনের অর্ডার লয়া আইছিল। মুনেম খাঁর বাড়ির গরুর রাখাল অরে সাহায্য করছে।

'হ, তারা আগরতলা থন টেরনিং লয়া আসছে। তাগোর হাতে ইশটিন আছে, তাগো কাছে গিরনেড আছে। একদম আনারসের লাহান দেখতে।'

'তুমি দেখেছো?'

'আমি নিজের চকখে দেখি নাই। তবে শুনছি।'

'আচ্ছা নিরঞ্জন, তুমি মেলাঘর বলে কোনও জায়গার নাম শুনেছো? ওই আগরতলার কাছে?'

'শুনছি মনে লয়। মেলাঘর, আগরতলা, হ,— ওই পোলারা মেলাঘরের পোলাই বটে।'

'বলো দেখি, কীভাবে মোনেম খাঁকে মেরেছে? কী বৃত্তান্ত শুনেছো?'

'অগোর মইধ্যে এক পোলা মুনেম খাঁরে মাইরা আসার পর কথাডা চাউর হয়া যায়। গেরামে কোনও কথা তো গোপন থাকে না। ওই পোলা অনেকদিন থেইকাই চেষ্টা করতাছিল— অয় নাকি মেলাঘর থেইকাই মুনেম খাঁরে মারনের অর্ডার লয়া আইছিল। মুনেম খাঁর বাড়ির গরুর রাখাল অরে সাহায্য করছে। মুনেম খাঁর মেলাই গরু আছিল তো— তার যে রাখাল, হেই রাখাল মুনেম খাঁর ওপর সন্তুষ্ট আছিল না। হেরে নাকি বেতন দিন না, বেতন চাইলেই পুলিশের ডর দেখাইত। মুনেম খাঁ লোক খুব খারাপ আছিল তো। অই রাখালের লগে কী কইরা যেন ওই পোলা ভাব কইরা ফালায়। সইন্দা বেলায় রাখাল যখন গরুর পাল লয়া বাড়ির ভিতর ঢুকত, সেই সময় তার লগে ওই মুক্তিপোলা বাড়ির ভেতর ঢুকে। তাছাড়া তো ঢুকন একদম অসাদ্য। সামনের গেটে বন্দুক হাতে পাহারা, ভিতরে পিস্তল হাতে মুনেম খাঁর 'বোটিগাড।' ওই পোলা একদিনে পারে নাই, দুই দিন সন্দায় ঢুকছে কিন্তু সুবিধা করতে পারে নাই, মুনেম খাঁ দু'তলায় ছিল, শ্যাষে পিছনের পাচীর টপকায়া পলায় গেছে। তিন দিনের দিন মুনেম খাঁ একতলায় বসার ঘরে বইসা বাইরের লোকের সঙ্গে কথা কইতেছিল, সেই সময় তারে মারছে ইশটিন দিয়া। তারপর পিছনের পাচীর টপকায়া পলাইছে। মুনেম খাঁর সেই রাখালও পলাইছে।'

নিরঞ্জনের কথায় আমি চমৎকৃত হলাম, এই সব অল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত গ্রামের ছেলেদের আমরা কতই না অবহেলার চোখে দেখি, অথচ এদের বুদ্ধি প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, খবর সংগ্রহের তৎপরতায় এরা রয়টারের সংবাদদাতাকেও হার মানায়!

'তুমি ওই মুক্তিযোদ্ধাকে দেখেছ?'

'দেখছি, মুনেম খাঁ মরণের পরদিন তো অরে দেখতে আশপাশের গ্রামের অনেকেই যাইতেছিল। আমি গিয়েছিলাম। দূর থনে দেখছি। অত লোক জানাজানি হইতে অর বাপে কাকায় অরে কই জানি পাঠায়া দিছে।'

'নাম জানো ছেলেটার?'

নিরঞ্জন লজ্জিত হাসল, 'শুনছিলাম তো। ভুইলা গেছি। কেমন জানি খটোমটো নাম, জিব্বার আগায় আইতে চায় না।'

আজ শরীফ দুপুরে ফিরল অন্যদিনের চেয়ে অনেক দেরি করে। প্রায় আড়াইটায়। দেখি মুখ লাল, চোখে উত্তেজনা। ঘরে ঢুকেই বলল, 'জবর খবর! জবর খবর! ডি আই টি বিল্ডিংয়ে বোম ব্লাস্ট করেছে।'

'তাই নাকি? কখন?'

'এই তো সোয়া একটার সময়। আমাদের অফিসের কাছেই তো। একটুখানি খবরাখবর জোগাড় করে আসতে দেরি হল।'

'কী সর্বনাশ। ব্লাস্ট শুনেই তো ভেগে চলে আসা উচিত ছিল।'

শরীফ হাসতে লাগল, 'ব্লাস্ট শুনে রাস্তায় নামলে আর দেখতে হত না।

মিলিটারিতে ক্যাঁক করে ধরে নিত। অফিসের ভিতর বসে থাকাই তো নিরাপদ। ফোনে খবরটবর নিলাম। তারপর রাস্তাঘাট একটু ক্লিয়ার দেখে তবে বেরোলাম।'

'কীরকম ভেঙেছে? কোন কোন তলা?'

'সাততলায়। টাওয়ারের একদিকে মস্ত একটা গর্ত হয়ে গিয়েছে। আমাদের অফিসের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল— সেই ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বেরচ্ছিল। আর ভিতরে আগুন জ্বলছিল।'

আমি তাজ্জব। কী সাংঘাতিক কাণ্ড। একতলা নয়, দোতলা নয়, একেবারে সাততলায়? এখন তো শুনেছি, প্রতি তলাতেই সিঁড়ির মুখে আলাদা আলাদা চেকপোস্ট। নিচতলায় বিল্ডিংয়ে ঢোকার মুখে গেটে চেকপোস্ট, বিল্ডিংয়ে উঠতে চেকপোস্ট, তারপরও প্রতি তলায়। এতগুলো চেকপোস্টে এতগুলো মিলিটারির চোখে ধুলো দিয়ে উঠল কী করে? আর এতবড় বিস্ফোরণ ঘটাবার মতো এত বিস্ফোরকই বা ভিতরে নিল কী করে? সত্যি, বিচ্ছুরা দেখাচ্ছে বটে! আমি বললাম, 'আমারও কিছু জবরখবর আছে।'

'বলো। তার বদলা আমিও আরও দুটো খবর বলতে পারব।'

আমি শরীফকে নিরঞ্জনের খবর বললাম। শরীফ বলল, গতকাল ভোর রাতে মতিঝিল গার্লস হাই স্কুলের হেডমিস্ট্রেসের বাসায় বোমা ছুড়েছে মুক্তিরা। তাতে বিল্ডিংয়ের বেশ ক্ষতি হয়েছে, তিনজন জখমও হয়েছে। আর গতকাল সন্ধ্যা রাতে বিচ্ছুরা খিলগাঁওয়ে একটা জায়গায় রেললাইনের খানিকটা অংশ ধসিয়ে দিয়েছে বোমা মেরে।

খবর শুনে আমি একটু হেসে বললাম, 'রোজই এই রেটে নতুন নতুন খবর শুনতে পেলে বেশ হয়!'

শরীফও হাসল, 'আশা করি পেতে থাকব।'

২৯ অক্টোবর শুক্রবার ১৯৭১

আজ থেকে ঠিক ষাট দিন আগে, রাত বারোটার সময়, পাক আর্মি আমার রুমীকে ধরে নিয়ে গিয়েছে।

৩০ অক্টোবর শনিবার ১৯৭১

সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। বঙ্গোপসাগরে একটা ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়েছে। তারই পরোক্ষ ঝাপটা গতকাল থেকে ঢাকাতেও একটু একটু পাওয়া যাচ্ছে। হিমেল বাতাস দিচ্ছে। সবাই হালকা গরম কাপড় নামিয়ে ফেলেছে।

আজ শরীফের জন্মদিন। গতকাল বায়তুল মোকাররমের ফুটপাতের দোকান থেকে সুন্দর চিকনের কাজ করা সাদা একটা টুপি কিনেছি। আর কিনেছি স্পেশাল একটা তসবি— অন্ধকারে এটা থেকে একটা আলোর আভা দেখা যায়। এ দুটো দিলাম আজ সকালে— জন্মদিনের উপহার! বাগানে একটাও ফুল নেই কোনও গাছে।

জামী একটু হেসে বলল, 'তোমার জন্মদিনে বিচ্ছু অ্যাকশানের একটা খবর তোমাকে উপহার দিচ্ছি।' তারপর খবর পড়ার ভঙ্গিতে বলল, 'গতকাল সন্ধ্যায় মর্নিং নিউজ অফিসের গেটে এক মুক্তিযোদ্ধা একটি গ্রেনেড ছুড়েছে। বিস্ফোরণে কেউ হতাহত না হলেও এলাকায় যথেষ্ট ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে।'

ক্রমশ

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

আমাজনের জঙ্গলে

আমাজন ঘুরে এসে লেখা বিস্ময়কর কিশোর উপন্যাস।
ষষ্ঠ মুদ্রণ। ₹৫০

'শৈশবের এমন জাদুছবি, সেইসঙ্গে অরণ্য ও অরণ্যবাসী মানুষজনের এমন পরিচয়, এ যেন মনে পড়ায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গল্পের সঙ্গে সঙ্গে এত সত্য কথা যাতে আছে, সেই বইটি ভারতের নানা ভাষায় অনুবাদ হোক। সকল ভাষার শিশুরা পড়ুক।'

মহাশ্বেতা দেবী, আজকাল

দেবুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩,
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), **স্টার মার্ক**-এর সব দোকান
ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে পাওয়া যায়।

স্বর্ণাক্ষর

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড
২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন: ২২৮৩-২৩২০ **ফ্যাক্স:** ২২৮৭-৬৪৪৮ **ই-মেল:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

আমার বাবা

সুকুমারী ভট্টাচার্য

সুকুমারী ভট্টাচার্য

সরসীকুমার দত্ত ছিলেন কৃতবিদ্য শিক্ষক, ধর্মানুসন্ধিৎসু, উদ্ভাবনী মেধাবান, গান্ধীবাদী ও সামাজিক দায়বোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। বিচিত্র ও বহুমুখী জীবন কাটিয়ে যাওয়া মানুষটিকে স্মরণ করছেন তাঁর সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির বিদুষী কন্যা। এই সংখ্যায় শেষ পর্ব।

(গত সংখ্যার পর)

বাংলা পড়াতেন। স্কটিশ চার্চ কলেজের পণ্ডিত দুর্গামোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বাবার হৃদ্যতা ছিল, সেটা ছিল অবশ্য বাবার সংস্কৃত জ্ঞানের ওপরে প্রোথিত। তাঁর পড়ানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রের মন্তব্য মনে পড়ে। ইংরেজির অধ্যাপক জ্যোতি ভট্টাচার্য প্রথম দর্শনেই আমাকে বলেছিলেন, বউদি, তুমি দাদার স্ত্রী হিসেবে আমার কাছে যতটা আপন ও সম্মানের, তার চেয়েও বেশি দামি হয়েছ সরসীবাবুর মেয়ে হিসেবে। আমি দেশেবিদেশে নানা শিক্ষকের কাছে পড়েছি, কিন্তু সরসীবাবুর মেধা ও স্বয়মুদ্ভাবিত শিক্ষাপ্রণালীর কোনও তুলনা কোথাও পাইনি। প্রখ্যাত নাট্যকার বাদল সরকার আমার বিশেষ কনিষ্ঠ প্রিয়ছাত্র ছিল। এই সেদিন চলে গেল। সেও এই কথাই বলেছিল।

স্কুলে বাবা পড়াতেন নবম ও দশম শ্রেণিতে। কিন্তু স্কুলের নীচের শ্রেণিতে শিক্ষক না এলে ছেলেদের প্রচণ্ড কোলাহল বন্ধ করার জন্য অন্য যে-কোনও শিক্ষককে সেই ছোট ক্লাসে পাঠানো হত। এমনই এক নীচের ক্লাসে গিয়ে বাবা দেখেন দুটি ছেলের মধ্যে প্রবল মারামারি হচ্ছে। তার মধ্যে ছ-সাত বছরের একটি ছেলে বাবা ঢোকামাত্রই আদেশ দিল, 'ওকে মারো, ও আমার পেনসিল নিয়েছে।' বাবা কিছুই করছেন না দেখে বাবার হাত ধরে টানতে টানতে হেডমাস্টারের ঘরে নিয়ে গিয়ে বাবাকে দেখিয়ে হুকুম দিল 'একে মারো'। হেডমাস্টার ও বাবা যুগপৎ হেসে ফেললেন। মৌচাকে ঢিল পড়ল। ছেলেটি পরম বিরক্তি ও অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, 'তোমরা কেউ কোনও কাজের নয়', বলে দু-জনকে দুটি চড় মেরে বেরিয়ে গেল।

আর একদিন বড়দের ক্লাসে ডেঁপো ছেলেদের এটা-ওটা জিজ্ঞেস করে এবং প্রত্যেকটার ভুল উত্তর পেয়ে শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তো life is not a bed of roses মানে কী? ক্লাস চুপ। এক মিনিট পরে শেষ বেঞ্চির একটি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলে বলল, 'আমি বলব স্যার?' 'বলো।' সে পরম বিজ্ঞতা ও পরিতুষ্টির সঙ্গে বলল, 'জীবন ফুলশয্যা নয়।'

এমন একাধিকবার ঘটেছে, বাবা না হেসে শুনেছেন। আবার অনেকে বলে যাদের মধ্যে সূক্ষ্ম বুদ্ধির চিহ্ন দেখতেন স্কুলের পরেও তাদের বহু জিজ্ঞাসার সমাধান করতেন। বাবার জীবৎকালে ওঁর কথায় কখনও জানতে পারিনি শিক্ষক হিসেবে কী বিপুল পরিমাণ শ্রদ্ধা ওঁকে ঘিরে জমে উঠেছিল। নিজের থেকে এসব কথা বলবার লোক তিনি ছিলেন না। তাই আমি এগুলি দশক কয়েক পর বিখ্যাত কিছু ছাত্র ও তাঁর সহকর্মীদের কাছে শুনে অবাক হই।

অবশ্য সেটা আমার অজ্ঞানতা। কারণ আমাকেও তো বাবা ভারতীয় দর্শন ইতিহাস সাহিত্য কত প্রাঞ্জলভাবে কতকিছু বুঝিয়েছিলেন, সেকথা ভুলবার নয়। তখন ভাবতাম বুঝি সব শিক্ষকই এত সমৃদ্ধভাবে পড়ান। বাবার কাছে ছেলেবেলায় পড়া বোঝানোর সময় তিনি যেভাবে সহজে বোঝাতেন তার তুলনা নেই। কিন্তু অধ্যাপক বাবাকে ভালো করে চিনলাম কলেজে উঠে। জটিল কঠিন প্রশ্নের যেমন সহজে উত্তর দিতেন যুক্তির পরম্পরা দিয়ে, তার তুলনা নেই। আজ বুঝি, বাবার ইচ্ছে ছিল আমি দর্শন ভালো করে বুঝে শেষ পর্যন্ত দার্শনিক হই। তিনি দর্শন অত ভালো করে পড়বার সুযোগ পাননি, পড়াতেন ইংরেজি, বাংলা ও ইতিহাস। পাশ করে যখন বললাম সংস্কৃত পড়ব তখন বাবার মুখটা বিষাদে মলিন হয়ে উঠল। দু-তিন মিনিট চুপ করে থেকে বললেন, 'কেন, সংস্কৃত পড়তে চাস?' বললাম প্রাচীন ভারত কীভাবে চিন্তা করত, যে আদর্শের

নিরিখ তাঁরা রেখে গিয়েছেন সেটা কেন কোন প্রয়োজনে বা উদ্দেশ্যে, তা জানবার জন্য সংস্কৃত পড়তে চাই। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতের চিত্তের বিবর্তন শিখতে চাই। তুমি কিন্তু আমাকে কিছু কিছু দর্শন পড়িয়ো, কারণ দর্শনও প্রাচীন ভারতের চিন্তাকে পুষ্ট করেছিল। শর্ত হয়ে গেল। বাবা খানিকটা খুশি হলেন।

বাবা পড়তেন খুব খুঁটিয়ে, পড়ে পুরো আয়ত্ত করতেন। ফলে আমরা তাঁর কাছ থেকে যা পেতাম সেটা এক পরিলক্ষিত সিদ্ধান্ত। পড়াতে বাবা ভালোবাসতেন। এবং পড়তেও। বাবার যুক্তিপরম্পরা গঠন থেকে শিখেছিলাম অনেক, যদিও কাজে লাগাতে পারিনি বিশেষ। কিন্তু বাবার কাছে পড়া একটা আনন্দময় প্রক্রিয়া। তার মধ্যে যুক্তির একটা সতেজ মেরুদণ্ড ছিল যা কখনও কেবলমাত্র বিলাসিতা হয়ে ওঠেনি। সে মূলধন কি আজও ফুরিয়েছে? মনেও হয় না। এখনও কথা বা আলোচনার ফাঁকে মনে হয় এই ধরনের প্রসঙ্গে বাবা তো এই কথা বলতেন। ওই স্মৃতিটুকুর মূল্য অনেক। এরই মধ্যে একসময়ে বেশ খেটেখুটে হোমিওপ্যাথিক বই আনিয়ে পড়ে পরীক্ষা দিয়ে এম ডি হলেন এবং মাস দুয়েকের মধ্যে মানিকতলার শেষ প্রান্তে বড় রাস্তার ওপরে একখানি ঘর ভাড়া করে দুটি বইয়ের আলমারি কিললেন, রোগীর আগমন প্রথম দিন থেকেই; কিছু নাম ও পরিচিতি হল; কিছু কিছু রোগও সারতে লাগল।

মাঝে মাঝে রবিবারে ছুটির দিনে আমরা ওই ডিসপেনসারিতে বসে থাকতাম। দেখতাম মাঝে মাঝেই বাবার স্থানীয় এক আজ্ঞাবহ অনুচর ছোট ছোট চিরকুট ও কোনও রোগীকে নিয়ে আমাদের বাড়ি যেত এবং দু-তিন কিলো চাল বা একখানি কাপড়, চাদর বা শীতবস্ত্র নিয়ে ফিরত। বাবার স্কুলের পারিশ্রমিক এমন ছিল না যে এইভাবে খয়রাতি করা যায়। মা-র এই প্রশ্নে বাবার উত্তর ছিল, রোগী অনাহারে বা অপুষ্টিতে ভুগছে সে তো শুধু ওষুধে সারবে না। খাদ্যও দিতে হবে, শীতার্ত রোগীকে বস্ত্রও দিতে হবে। দিল্লির ভবানী সেনগুপ্ত (যে চাণক্য সেন নামে লিখত) বাবাকে মেসোমশাই বলত; বিশেষ সম্মান করত। এইসব কাজকে সে বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে দেখত। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বাবার কম্পাউন্ডারের কাজ করল বেশ

গাড়িটা থেকে বিশাল আকৃতির ছটা পিতলের বারকোশ নামল, সেগুলো থেকে নামল সোনা-রুপোর বস্তু, দামি রেশমি বস্ত্র এবং নানান মিষ্টান্ন, পায়েস, ফল। বাবা বললেন, 'মা, আমাদের পেশায় উপহার নেওয়া বারণ।' অনেক জবরদস্তির পর শুধু এক বারকোশ মিষ্টি ও পায়েস নিলেন।

কয়েকমাস। অবশেষে একদিন মাকে জিজ্ঞেস করল ডাক্তারখানা থেকে এ পর্যন্ত ক-পয়সা বাড়িতে এসেছে। সেইসঙ্গে মাকে পরামর্শ দিল, 'ও ডাক্তারখানা তুলে দিন মাসিমা, নইলে অচিরেই আপনার পরিবার দেউলে হয়ে যাবে।' কথাটা রূঢ় বাস্তবের হলেও ভবিষ্যদ্‌বাণী হিসেবে একেবারে সত্যি। উঠে গেল ডাক্তারখানা। দুটো বইয়ের আলমারি বিক্রি করা গেল। তৃতীয়টাতে বাবার দামি ওষুধের বইগুলো রাখা হল। ডাক্তারখানা উঠে যাওয়ার পর বাবাকে মাঝে মাঝে করুণ চোখে আলমারিটার দিকে তাকাতে দেখেছি। যদিও সারাজীবন লোককে ওষুধ দিয়েছিলেন। অধিকাংশই বিনামূল্যে।

বেশ কিছু দুরারোগ্য রোগ সারাতে দেখেছি, সেগুলি সব বলবার সময় নেই। একটির কথাই বলব। যতদিন ডিসপেনসারি ছিল, আমার ছুটির দিনে প্রায়ই ওখানে বসতাম। একবার সকাল নটা নাগাদ বসে আছি, এমন সময়ে প্রকাণ্ড এক বিলিতি লিমোজিন গাড়ি সামনে এসে দাঁড়াল। একজন প্রায়-প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা নামলেন, সঙ্গে এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী। দুজনেরই মুখ বিষণ্ণ। ভদ্রমহিলা নেমে এসেই বাবার পা জড়িয়ে ধরলেন, 'আমার একটা উপায় করো বাবা। এই মেয়েকে সাত মাসের পেটে নিয়ে বিধবা হয়েছি। ও বড় হতে আমাদেরই সমান মানের এক জমিদারের ছেলে ওকে বিয়ে করে। কিন্তু আড়াই বছরেও ছেলেপুলে হল না বলে ওর বাবা বলছেন এত বড় জমিদারবংশ শেষ হয়ে যেতে দেব না, ছেলের আবার বিয়ে দেব। আমার মেয়ের কী অবস্থা হবে, বাবা? অনেক শুনেছি তুমি বাবা ধন্বন্তরি। একটা উপায় করো বাবা। জামাই ডাক্তার দেখিয়েছে, তার নাকি কোনও দোষ নেই।'

বাবা বললেন, 'অনেকটা দেরি হবে আপনার। কিছু খেয়ে আসুন।' ঘণ্টাখানেক পরে ফিরলেন। আমাকে দিয়ে বাবা বাড়িতে বলে পাঠালেন উনি দই মিষ্টি কলা খাবেন, ফিরতে অনেক দেরি হবে। বিস্তর বই নামিয়ে দেখে নোট করে অবশেষে ছটায় ওদের ওষুধ দিয়ে তিনমাস পরে খবর দিতে বললেন। তিন মাস গেল। ছ-মাস ন-মাস হল কোনও খবর এল না। বাবা খুব হতাশ হয়ে পড়লেন।

অবশেষে এক বছর দু-মাস পরে সেই লিমোজিন গাড়ি ও অন্য একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। একমাসের একটি বাচ্চা, দেবশিশুর মতো দেখতে, কোলে নিয়ে সোজা বাবার পায়ের কাছে নামিয়ে বললেন, 'এ হল তোমার আশীর্বাদ বাবা। তবে আশীর্বাদ করো, যেন মানুষ হয়।' বলতে বলতে অন্য গাড়িটা থেকে বিশাল আকৃতির ছটা পিতলের বারকোশ নামল, সেগুলো থেকে নামল সোনা-রুপোর বস্তু, দামি রেশমি বস্ত্র এবং নানান মিষ্টান্ন, পায়েস, ফল।

বাবা বললেন, 'মা, আমাদের পেশায় উপহার নেওয়া বারণ।' অনেক জবরদস্তির পর শুধু এক বারকোশ মিষ্টি ও পায়েস নিলেন। সে বারকোশটি এখনও আমার কাছে আছে। কিছুক্ষণ কথা বলে ওঁরা চলে গেলেন। বাবা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'যাক, ওই ওষুধটা কাজ করেছে।'

প্রসঙ্গত বলি, বাবার হাতের লেখা ছিল মুক্তোর মতো। চশমার অনেক পাওয়ার ছিল। তা সত্ত্বেও একবার একটি চালে রবীন্দ্রনাথের পুরো একটি কবিতা আর একবার একটি পোস্টকার্ডে প্রকাণ্ড বড় এক কবিতা লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন।

সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ খ্রিস্টান পরিবারে বেশ খানিকটা সাহেবিয়ানা অনুপ্রবিষ্ট ছিল। পোশাকে খাদ্যে কথাবার্তায় আচরণে এটা প্রকট হত। এই ব্যাপারটা বাবা একেবারেই বরদাস্ত করতে পারতেন

না। বলতেন, যে কথার বাংলা প্রতিশব্দ আছে তার জন্য ইংরেজি বলে নিজের ভাষার অপমান করব কেন? যেমন বলতেন বাঙালি বাংলা বলবে স্বাভাবিক বাংলা স্বরক্ষেপে। তার মধ্যে আগন্তুক ইংরেজি উচ্চারণের লেশমাত্র থাকবে না। বাংলা সাহিত্যের ওপরে তাঁর গভীর আকর্ষণ ছিল। উনবিংশ শতকের সাহিত্য ভালো জানতেন ও আমাদের পড়তে বলতেন, এমনকী যাদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত। বলতেন এঁদের লেখা পড়লে বুঝতে পারবি মধুসূদন ও তাঁর সমসাময়িকরা কোথায় বড়, কেন বড়। বলতেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে কবিতা শোনা অদ্ভুত মোহসৃষ্টিকারী, প্রধানত তাঁর শব্দপ্রয়োগের জন্য। বাবা পছন্দ করতেন কথ্য বাংলা, কিছু কিছু প্রচলিত বাগ্‌ভঙ্গি সমেত। তার মধ্যে খনার বচন ইত্যাদি লোকচলিত ভাষা এক ধরনের সাবলীলতা আনে যাতে কথ্য ভাষার আকর্ষণ বাড়ে।

বাড়িতে পুজো-আচ্চা ছিল না বটে, কিন্তু তিনটি উৎসব— খ্রিস্টের জন্মদিন (বড়দিন) , খ্রিস্টের পুনরুত্থানের কাহিনির দিন এবং বাড়ির সকলের জন্মদিন। এতে যার জন্মদিন সে নতুন জামাকাপড় পেত। একটু ভালো খাবার ও অনিবার্য ভাবে থাকত পায়েস। কখনও চন্দনের ফোঁটাও দিতেন মা। কেক কখনও প্রাধান্য পেত না। প্রণামের চল ছিল, ক্রমে বন্ধ হয়ে যায়। লোক নেমন্তন্ন করা কখনও, জন্মদিনটায় হলেও, সর্বদা নয়। সব মিলে পুজো-আচ্চা বাদে হিন্দু উৎসবের সঙ্গে মিল ছিল খানিকটা।

বাবার স্বাদেশিকতা কিন্তু অন্ধ ছিল না, বিদেশের যা কিছু ভালো, গ্রহণীয়, তার সম্বন্ধে মুক্ত দৃষ্টি ছিল। যা ভালো তা কেন ভালো বুঝিয়ে দিতেন এবং নিজেদের জীবনে তার স্থান করে দিতে শেখাতেন। সব যে পেরেছি তা নয়, কিন্তু বাবার উদ্দেশ্য ও মনোভাব বুঝে নিতে পারতাম।

এই কারণে ভালো বিদেশি সাহিত্যে যাতে আমাদের অনুরাগ জন্মায় তারও চেষ্টা করতেন। মা বাবা দু-জনেই বেহালা বাজাতেন। দু-জনেই দুটো বেহালা বিবাহের উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। দু-জনেই ছবি আঁকতেন। প্রতিকৃতিই শুধু, একটুও উঁচুদরের নয়, তবে ওই আগ্রহটা আমাদের আকৃষ্ট করত। দরিদ্র সংসারে সারা দিনের পর একটু সময় বের করে নিয়ে দৈনন্দিন

ভালো বিদেশি সাহিত্যে যাতে আমাদের অনুরাগ জন্মায় তারও চেষ্টা করতেন। মা বাবা দু-জনেই বেহালা বাজাতেন। দু-জনেই দুটো বেহালা বিবাহের উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন। দু-জনেই ছবি আঁকতেন। প্রতিকৃতিই শুধু, একটুও উঁচুদরের নয়, তবে ওই আগ্রহটা আমাদের আকৃষ্ট করত।

প্রয়োজনের উর্ধ্বে শিল্পজগতে একটুখানি পা রাখতে পেরে দু-জনেই কৃতার্থ বোধ করতেন। কোনও অর্থেই আমাদের বাড়িটা শিল্পচর্চায় লিপ্ত ছিল না। কিন্তু শিল্প যে জীবনবোধের মানকে খানিকটা উঁচুতে তোলে সেটা সম্বন্ধে আমরা যাতে অবহিত হই সেই চেষ্টাটুকু ছিল। মা আমাকে বড় শিল্পীদের প্রদর্শনীগুলোতে নিয়ে যেতেন এবং দু-তিনঘণ্টা সময় ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে কাটাতেন। এতে আমি শিল্পানুরাগী হয়ে উঠিনি। কিন্তু আজ বুঝি যে জ্ঞান হয়ে অবধি এতে মুগ্ধ হতে শিখেছি। শিল্পী শম্ভুমামাকে (রবীন্দ্রনাথের ফটোগ্রাফার শম্ভু সাহা) বলেছি সে কথা। ওঁর পরিচিত যন্ত্রশিল্পী কয়েকবার আমাদের বাড়িতে এসে এসরাজ বাজিয়েছেন। শম্ভুমামাও বাঁশি বাজাতেন। ছবিও আঁকতেন। ওই সময়টা একটা উচ্চতর পরিবেশে চলে যেত মনটা। বাবা শান্তিনিকেতনের উচ্চতর পরিবেশের উচ্চতর স্তরে মনটাকে নিয়ে যেতে পারতেন, কবিতা নাটক আবৃত্তি গানের কিছু প্রভাব রয়ে গিয়েছিল তাঁর জীবনে। এটা টের পেতাম গান, কবিতা ইত্যাদি শোনার সময়ে তাঁর মুগ্ধ তন্ময় দৃষ্টিতে। অথচ গদগদ ভাবটা একেবারেই ছিল না। ছিল শ্রদ্ধাপ্লুত তন্ময়তা। এই সময়টাই কেমন করে যেন ধীরে ধীরে অবচেতনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে তা বুঝতে পেরেছিলাম।

বছরে প্রায় আট-ন' মাস প্রতি শনিবারে বাবা আমাকে জাদুঘর দেখাতে নিয়ে যেতেন। এমনিতেই বাবা ইতিহাসে আকৃষ্ট ছিলেন, স্কুলের ওপরের তিন ক্লাসে পড়াতেনও। আমাকে প্রাচীন গ্রিস, রোম ও আলেকজান্দ্রিয়া, চিন এসব দেশের প্রত্নবস্তু দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতেন সেগুলি কোন ঐতিহাসিক পরিবেশে নির্মিত হয়েছিল। আর একটি জিনিস আমি প্রায় প্রত্যেক বারেই দেখতাম, সেটা হল পাথরের গায়ে লতাপাতার ছোপ। সে লতাপাতা ঝরে গিয়েছে, কিন্তু তাদের অস্তিত্ব ছাপ রেখে গিয়েছে। সে যে কী সুন্দর দেখতে! এখনও মনে গাঁথা তাদের মনোহারিণী রূপরেখাগুলি। প্রাচীন ঐতিহাসিক বস্তু নিয়ে সারা সপ্তাহ পড়ে শনিবারে আমাকে তাদের উৎপত্তির বিবরণ শোনাতেন। জাদুঘরযাত্রাটা আমার কাছে তীর্থযাত্রার মতো ছিল। কী আগ্রহ নিয়েই না যেতাম এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করতাম! অতি প্রাচীন ইতিহাসকে তাঁর বিবরণে কেমন যেন জীবন্ত করে তুলতেন, তার কিছু কিছু এখনও মনে আছে।

লেখাপড়ার ব্যাপারে বাবাকে তুষ্ট রাখা কঠিন ছিল। সামান্যতম ত্রুটিও শুধরে দিতেন। যেমন-তেমন করে কোনও কাজ করা একেবারেই পছন্দ করতেন না। একবার আমাকে বললেন, 'আমি কখনওই তোর কাছে এটা চাইব না যে তুই ক্লাসে প্রতিবার প্রথম হবি। আমি শুধু বলব যে পরীক্ষা দিয়ে তুই যেন নিজে বলতে পারিস এর চেয়ে ভালো করে আমি পড়া তৈরি করতে পারতাম না।' দু-বছর পরে বাবাকে বললাম, 'তোমার দুষ্টুমি বুদ্ধি এবার টের পেয়েছি।' ছোট স্কুলে প্রত্যেকবার প্রথম হওয়ার চেয়ে অনেক কঠিন নিজের সাধ্যশক্তির চরম উৎকর্ষ রাখতে পারা। পরে অবশ্য সেই চেষ্টাই করতাম।

পড়াশোনার চেয়ে অনেক বড় এক উচ্চমানের দাবি করতেন, যেন সব নৈতিক ও সামাজিক অর্থে পুরো মানুষ হয়ে উঠতে পারি। সেটা পারিনি। গ্লানি কোনওদিন যাবে না। আমার অভিজ্ঞতায় বাবা ছিলেন এক সম্পূর্ণ মানুষ। তাঁর কন্যা বলেই আমার যা কিছু গর্ব উচ্চাশা এবং অপূর্ণতার বোধ।

বাবার আর একটা অভ্যাস ছিল যা দেশের বাড়ি বা মামার বাড়িতে গেলে দেখা যেত। আমাদের নিয়ে সকালে বেড়াতে বেরিয়ে কামারের নেহাই, কুমোরের চাক বা পোয়ান, জেলের জাল, তাঁতির তাঁত এগুলি দেখিয়ে নাম বলে ও কোন যন্ত্রে কীভাবে কাজ হয় তা বুঝিয়ে দিতেন। পুকুরের পাশে দাঁড়িয়ে টানা বেড়াজাল, খ্যাপলা জাল বা কুঁড়োলি, আরও কত রকমের জালের নাম ও কাজ বুঝিয়ে দিতেন। দীর্ঘ নগরজীবনের অভিজ্ঞতায় আজ সেসব বেশির ভাগই ভুলে গিয়েছি। বাবা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পেশার লোকদের ও তাঁদের পেশার প্রতি সম্মান দেখিয়ে দাদা কাকা বলে সম্বোধন করতেন। আমাদের বুঝিয়ে দিতেন এঁদের পেশাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে খাওয়া-পরার জোগান দিচ্ছে। বলতেন, সর্বদা এঁদের সম্মান করবি, কারণ এঁরা যা তৈরি করছেন, তাই দিয়েই আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা চলছে। কত বিভিন্ন বিষয়ে যে বাবার সজাগ সশ্রদ্ধ কৌতূহল ছিল তা ভাবলে অবাক লাগে। পরে আর একটা জিনিস বুঝেছি, যাঁরা হাতে পায়ে খাটেন তাঁদের বাবা সম্মান করতেন এবং আমাদেরও তাঁদের সম্মান করতে শেখাতেন। কিছু শিক্ষা এখনও মনের মধ্যে প্রোথিত হয়ে রয়েছে।

লেখাপড়ার চেয়ে যেটাতে বাবা বেশি জোর দিতেন তা হল চরিত্র। এবং সেটাও সরাসরি উপদেশ দিয়ে নয়। নিজের আচরণ যেখানে নীতিবিচ্যুত হয়েছে মৃদুস্বরে তার একটা বিবরণ। এটা সরাসরি বকুনির চেয়ে অনেক অনেক বেশি মর্মভেদী। অনেক বাবা-মাকে দেখেছি অন্য ছেলেমেয়ের ভুলত্রুটি বিস্তারিত করে নিজের সন্তানদের শোনাতে। এতে ফল বড় খারাপ হত। নিজের ছেলেদের একটা আত্মতৃপ্তি যেমন জন্মাত তেমনি অন্যদের প্রতি অবজ্ঞাও বাড়ত। এইসব ক্ষতিকর উপায় ত্যাগ করে নিজের সন্তানদের আচরণটা স্পষ্ট বর্ণনা করলে ছেলেমেয়ে নিজেরাই দেখতে পায়, তাদের নিজেদের আচরণের সমালোচনা নিজেরাই করতে পারে। এটাই তাদের মনে থাকে এবং হয়তো কতকটা স্থায়ীভাবেই। বকাবকি করে মারধর করে যে সংশোধন বা শাসন তাতে গুরুজনদের ওপরে একটা প্রচ্ছন্ন ক্রোধ জন্মায়, তাতে শিক্ষাটা বঙ্কিম ও কষ্টকর অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়।

আমাদের বাড়িতে মারধর করে শাসন দেখিনি। মুখের কথায়, কখনও-বা গল্পচ্ছলে যা শাসন পেয়েছি তার অনেকটাই এখনও মনে আছে। বাবা স্বভাবে গম্ভীর ছিলেন কিন্তু হাসতে ও হাসাতে পারতেন। গল্পের মধ্যে হাসির উপাদান একটি স্নিগ্ধতা সঞ্চয় করত। স্কুলে শুনেছি বাবার পড়ানোর পদ্ধতিটা অনেকটা অন্য রকম ছিল, আগেই বলেছি সেকথা।

এমনিতেই মাঝে মাঝে অন্য কথার মাঝখানে প্রশ্ন করতেন, কেন এমন করে হল, না হলে কী হত? পদ্ধতিটা সুপ্রাচীন। প্লেটো এই পদ্ধতিতে পড়াতেন। আমাদের দেশে উপনিষদের আখ্যানগুলিতেও মাঝে মাঝে এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখতে পাই। গুরু-শিষ্য সংলাপে যখন এই পদ্ধতির প্রয়োগ দেখি তখন বুঝি আত্মবিশ্লেষণ ঠিক এইভাবেই হওয়া উচিত। গার্গী এই ধারায় বেশি দূর এগিয়ে গিয়েছিলেন বলে যাজ্ঞাবল্ক্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন, 'তুমি আর প্রশ্ন কোরো না গার্গি, তা হলে তোমার মাথা খসে পড়বে।' এটা প্রায় প্রত্যক্ষে নিজের অজ্ঞানের স্বীকৃতি। বাবা ততটুকুই এ পদ্ধতির অনুসরণ করতেন যতটায় শিক্ষার্থীর জ্ঞান বাড়ে, আত্মবিশ্বাস না কমে যায়। কখনও প্রাচীন সাহিত্যের কোনও উপাখ্যান থেকে বিশ্লেষণ করে তার যে অংশটা কাজে লাগবে তাই দিয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের প্রসার বাড়াতেন, কখনওই তার আত্মবিশ্বাসে ঘা দিয়ে নিজের গৌরব বাড়াবার চেষ্টা করতেন না। আজ মনে হয় শিক্ষার্থীর কাছে যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি তিনি পেতেন তাতে বেশ খানিকটা ভালোবাসাও মিশে থাকত। এই পিতাকে এত কম দিন পেয়েছি, তাঁর কাছে জ্ঞানের অনুশীলনের সময় এত কম বছর পেয়েছি যে এখনও একটা ক্ষোভ রয়ে গিয়েছে।

ধর্ম সম্বন্ধে আমাকে বিশেষ প্রশ্ন করতেন না। স্কুলের শেষের দিক থেকেই, বিশেষত কলেজের দ্বিতীয়-তৃতীয় বর্ষ থেকে ধর্ম সম্বন্ধে নানারকম বই পড়তাম এবং নানা ধর্মের বক্তব্য এবং নানারকম দার্শনিক মতের সঙ্গে তাদের বিরোধ বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করত। এ বিষয়ে বাড়ির সকলের থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছিলাম, যদিও কাউকে না জানিয়ে। খুব কষ্ট হত, কারণ চিন্তাজগতে আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু বাবা; তাঁর সঙ্গে মানসিক দূরত্ব বাড়ছিল। একদিন সাহসে ভর করে বাবাকে দুখানি বই পড়তে দিলাম। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের ওপরে একটি ও ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে একটি। বিস্মিত হয়ে দেখলাম গভীর অভিনিবেশ নিয়ে বাবা দুটোই পড়ছেন। আমাকে শুধু বললেন, 'আগে এগুলো পড়তে দিসনি কেন?'

একদিন সাহসে ভর করে বাবাকে দুখানি বই পড়তে দিলাম। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের ওপরে একটি ও ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে একটি। বিস্মিত হয়ে দেখলাম গভীর অভিনিবেশ নিয়ে বাবা দুটোই পড়ছেন। আমাকে শুধু বললেন, 'আগে এগুলো পড়তে দিসনি কেন?'

এরই মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল

ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্বের ওপরে একটি ও ডারউইনের বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে একটি। বিস্মিত হয়ে দেখলাম গভীর অভিনিবেশ নিয়ে বাবা দুটোই পড়ছেন। আমাকে শুধু বললেন, 'আগে এগুলো পড়তে দিসনি কেন?' দার্শনিক গঠনের মনে ওগুলো থেকে যা পেতেন আমার পক্ষে ততটা বোঝা সম্ভব ছিল না। দেখতাম বাবা ভ্রূ কুঁচকে একমনে বই পড়ছেন, নোট নিচ্ছেন। নোটগুলো নিজেই ছিঁড়ে বা ফেলে দিয়েছিলেন। আমি রেখে দিলে আমারই লাভ হত। তা হল না। তার অল্প কিছুকালের মধ্যে বাবার মৃত্যু হয়। বুঝতে পারি, একেবারে শেষের দিকে কোনও সিদ্ধান্তের মনোভাব নিয়ে বই দুটো পড়তেন। দার্শনিক চিন্তাধারায় কৈশোরের শেষ দিক থেকেই তাঁর মনটা দীক্ষিত ছিল এবং বিজ্ঞানে তাঁর বরাবরের আগ্রহ। ফলে এই দুটো মনকে আমি যা পেয়েছিলাম বাবা নিঃসংশয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছিলেন। বাবা বাংলা ভাষার নির্ভুল প্রয়োগ সম্বন্ধে খুব সচেতন ছিলেন। দুটি উপায়ে এটা নিশ্চিত করতেন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের বাংলা প্রচুর পড়তেন, দুটো ভাষার পার্থক্য কোথায় তা দেখিয়ে দিয়ে আমাদের অবহিত করতেন। মান্য বাংলা ভাষার কাছাকাছি কথ্য ভাষা বলতে ও লিখতে শেখাতেন, কথাবার্তার মধ্যে ভুল প্রয়োগ দেখলে শুধরে দিতেন।

খ্রিস্টান সমাজ ছোট সমাজ। ১৯৩৮ সালে তাদের যেসব ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় বিশেষ ভালো করেছিল তাদের সংবর্ধনার জন্য একটি সভার আয়োজন করেছিল। আমাদের বসিয়েছিল ঠিক মাঝখানে। প্রচণ্ড ভিড়। সে ভিড়ের প্রান্তে দাঁড়িয়ে বাবা। একটি ছেলে বলল, 'ওই সাদা বুটিদার শাড়িপরা মহিলার সঙ্গে একবারটি দেখা করতে চাই। কী করা যায় বলুন তো।' বাবা গম্ভীরভাবে বললেন, 'আমারও ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করা দরকার। দেখি ভিড়ের ওপাশ দিয়ে যদি কাছে হয়।' বলে চলে গেলেন এবং আমাদের পরিবারে সকলকে নিয়ে বাড়ি এলেন। পথে গল্পটা বললেন। এমন বেশ কয়েকবার গম্ভীর মুখে পরিহাস করতে শুনেছি। ওঁর ছাত্ররাও তাঁর এই ধরনের কয়েকটি পরিহাসের কাহিনি মনে রেখেছেন।

বাবা সহজে কাউকে তুচ্ছ করতেন না, কিন্তু যে অন্যায়কারী সে নিজের বাড়ির লোক হলেও ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দিতেন অন্যায়টা কেন অন্যায়, এবং এর পরেও সেটা হতে দেখলে কঠোর ভাবে তার প্রতিবাদ ও প্রতিবিধান করতেন। বাল্যে কৈশোরে অনেক সুশিক্ষা পেয়েছি। সব যে কাজে লাগাতে পেরেছি তা নয়। তবে যুক্তিসহ কথা বললে সাধারণত তার একটা প্রভাব পড়ে চরিত্রে।

> '...হঠাৎ অনেক বেশি টাকা পেলে এঁরা হয়তো নিচু হয়ে হরির লুট কুড়োবেন। সেজন্য এখন যা পাই তার চেয়ে ততটা বেশি মাইনে হওয়া উচিত, যাতে সংসারে মোটামুটি সচ্ছলতা থাকে, কিন্তু আতিশয্য না হয়।'

এরই মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল, জিনিসপত্রের দাম বাড়ল। এক স্কুলশিক্ষকের পক্ষে সংসার চালানো কঠিন হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে বাবা গৃহশিক্ষকের কাজ নিলেন। সকালে উঠে গোহাটা থেকে আমাদের দুধ এনে, চা খেয়ে বাজার যেতেন, পরে স্নান সেরে খেয়ে স্কুলে যেতেন। সাড়ে চারটে নাগাদ ফিরে কয়েক মিনিট বিশ্রাম করে চা খেয়ে তৈরি হয়ে ছাত্রটিকে পড়াতে যেতেন। একদিন ছাত্রটির অসুখ, সে পড়বে না, তাই আমার সঙ্গে হাঁটতে বেরোলেন। সেইদিনের কর্মক্লিষ্ট মুখটা দেখে আমার একটা যন্ত্রণা হতে লাগল। একটু ক্ষুণ্ণ উত্তেজিত স্বরে বাবাকে বললাম, 'যাই বলো বাবা, শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বেশ খানিকটা বেশি হওয়া উচিত। বাড়িতেও তো তাঁরা পঠনপাঠনের জন্য প্রস্তুতি নেন? বিষয়টাকে আশপাশ থেকে বোঝবার জন্য? এই মানুটাকে যদি সারাক্ষণ অন্যান্য কাজে খাটতে হয়, ভালো করে পড়াবার জন্য, তা হলে পুরো শিক্ষকজগৎটারই অবমাননা ও তাঁদের ওপরে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা হয়। তোমাদের মর্মান্তিক দক্ষিণাটা নেহাত কম। এটা বেশ খানিকটা বাড়লে তোমাদের দক্ষতা ও পড়ানোর তৃপ্তিও বাড়ে।' বাবা একটু থেমে বললেন—'দেখ এই শিক্ষকরা বহুকাল ধরে প্রয়োজনের তুলনায় কম টাকা পাচ্ছেন, টাকার প্রয়োজন এঁদের সত্যিই আছে। ফলে তলে তলে এঁদের লোভও জমেছে খানিকটা। হঠাৎ অনেক বেশি টাকা পেলে এঁরা হয়তো নিচু হয়ে হরির লুট কুড়োবেন। সেজন্য এখন যা পাই তার চেয়ে ততটা বেশি মাইনে হওয়া উচিত, যাতে সংসারে মোটামুটি সচ্ছলতা থাকে, কিন্তু আতিশয্য না হয়।' বাবা দেখে যাননি, কিন্তু পরে আমরা অনেক শিক্ষককে নিচু হয়ে হরির লুট কুড়োতে দেখেছি। বেশ কিছু শিক্ষক যাঁদের সৎ বলে জানতাম তাঁদের লোভী অর্থসঞ্চয়ে একনিষ্ঠ হতে দেখেছি।

শিক্ষকরা শিক্ষা দেন দু-ভাবে: পঠনপাঠনের মাধ্যমে আর আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও। সচ্ছলতা প্রয়োজন, প্রাচুর্য নয়। তাঁর নিজের আচরণ ও আদর্শ থেকে বেশ কিছু সহকর্মীও ছাত্রজীবনে নীতির একটা উচ্চ আদর্শ লাভ করেছেন। এ বস্তু আজকের জগতে এত বিরল হয়েছে যে বাবার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। এ আদর্শে অনুপ্রাণিত কয়েকজন বাবার সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে এই নির্লোভ সংযমের কথা বলেছেন। পরে অবশ্য দেখেছি কেউ কেউ আদর্শ নিয়ে শুরু করেও পরে অর্থসন্ধানী লোভীতে পরিণত হয়েছেন। বাবা একা নন, তখনও দেশে নির্লোভ অর্থসঞ্চয়ে বিমুখ, বরং নতুন বই ও নতুন শিক্ষার দিকে একান্ত আগ্রহী অনেকে ছিলেন। এঁরা কেউ কেউ পরস্পরের সঙ্গে শিক্ষাভ্রাতৃত্ব বজায় রেখে চলেছিলেন। বাবার মত ছিল, বুনো রামনাথ আর বিলাসী শিক্ষাকর্মীর মাঝামাঝি একটা অবস্থান অনায়াসেই নেওয়া যায়।

শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন বলে রসহীন কঠোর শিক্ষাব্রতী ছিলেন, একথা কিন্তু সত্য নয়। বাবা যথেষ্ট হাসতে এবং হাসাতে পারতেন, হয়তো এটাও তাঁর জনপ্রিয়তার একটা কারণ ছিল। ছাত্রদের উত্তরপত্রে নম্বর বা উচ্চনীচ নম্বর দেওয়া সম্বন্ধে তখনই তাঁর নিজস্ব ভিন্ন মতামত ছিল যা আজকে আবার শিক্ষাজগতে আলোচনার বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছে। ভালো ছাত্রের ধীরে ধীরে শিক্ষাগত অবক্ষয় ও খারাপ ছাত্রের ধীরে ধীরে উন্নতি কীভাবে হয় তা অনুসন্ধান করতেন। ছাত্রদের ডেকে গল্পের বা আলাপের মধ্য দিয়ে কোন

মানসিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদের শিক্ষার উন্নতি হচ্ছে তা খুঁজে বের করে আবার ওই গল্পের ছলে তাদের পথ দেখিয়ে দিতেন। বহুবার এর ফল পেয়েছেন। যাদের একেবারে পছন্দ করতেন না তারা হল যাদের ডেঁপো ছেলে বলে। প্রায়শই এরা ধনীগৃহের সন্তান। বাড়ি থেকে এরা প্রশ্রয় পেত, 'হাতখরচ' বলে অনেকটা টাকা পেত। হোটেলে খাওয়া, সিনেমা দেখা ইত্যাদিতে তাদের 'পকেটমানি' খরচ করে ফেলত। টাকা দিয়ে অনেক বিলাসব্যসনের বস্তু কেনা যায়, কিন্তু চরিত্রগঠনে টাকা সৎভাবেও খরচ করা যায় সেটা অনেকেই জানত না, আরও অনেকে জেনেও জানত না। এই শেষোক্তদের কাছে বাবা কথা বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন, তার কারণ এসব ছেলে পেত মা-বাবার আনুকূল্য। এ ছায়াটা এখনও বর্তমান।

বাবা বিশ্বাস করতেন প্রায় সব ছেলেই যথাকালে যথোপযুক্ত শাসন পেলে এবং বেশি কাঁচা টাকা হাতে না পেলে খানিকটা শুধরোবেই। এর পরীক্ষায় বরাবরই তিনি সাফল্য পেয়েছিলেন, এখনও তাঁর কিছু ছাত্র যথাসময়ে স্বভাব পরিবর্তন করে সমাজের উন্নতির জন্য অসাধ্য কল্যাণব্রতে কৃতী হয়েছেন। সাংখ্য বাবার বহুপঠিত বিষয় ছিল। মনস্তত্ত্বের সঙ্গে এর বেশ কিছু মিল ছিল। অভিপ্রায় ছিল একটা বই লেখার, সময়ের অভাবে সেটা আর হল না। বাবার বিজ্ঞানমনস্কতা তাঁর কলেজের পাঠ্যতালিকায় বেশ কিছু বিজ্ঞানের বই পড়ার ফল।

বাহান্ন বছর বয়সে মৃত্যু কতকটা অকালমৃত্যুই বটে। কত কিছু বলতেন ভাবতেন হয়তো লিখতেনও। সেসবের সময় হল না।

তবু দু-একটা ঘটনা মনে পড়ে। বি এ পরীক্ষায় অনার্সে সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য ঈশানবৃত্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু ওই বৃত্তি দেওয়ার মালিকের নির্দেশ ছিল বৃত্তিপ্রাপককে হিন্দু হতে হবে; আমার জন্ম খ্রিস্টান পরিবারে, কাজেই ওটা আমার নাগালের বাইরে; অন্যটা অনার্সের প্রাপকদের মধ্যে উচ্চতম নম্বর যার, তার জন্য জুবিলি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বৃত্তি। সেটা পেলাম, কারণ তার ক্ষেত্রে জাতিবর্ণ নির্দেশ ছিল না। তখনকার দিনে তারও অর্থমূল্য বত্রিশ টাকা; সেটার জন্য খুশি ছিলাম বটে কিন্তু চল্লিশ টাকা— যা তখন একজন কেরানির মাসিক মাইনে, যেটা আমাদের গরিবের সংসারে সত্যকার সাহায্য হত, তা পেলাম না বলে, বাড়ির সমস্যা আর্থিকভাবে আরও দূর করতে পারলাম না বলে অসম্ভব কষ্ট পেয়েছিলাম। আরও এইজন্যে যে, লেখাপড়ার জগতে জাতিবর্ণ বিভাগ দিয়ে মূল্যায়ন আমার কাছে অত্যন্ত অসংগত মনে হয়েছিল। দিনকতক বেশ মনমরা হয়েছিলাম। সন্ধেবেলা বাবা ছাত্র পড়াতে যেতেন, আমি একা ঘরে চুপ করে বসে থাকতাম। একদিন বাবার ছাত্র পড়বে না বলে তাঁর সঙ্গে হাঁটতে বেরোলাম। বাবা জিজ্ঞেস করলেন, 'গয়া স্টেশনে ট্রেন ঢোকার আগে কী হয় মনে আছে তোর?' গয়ায় আমার বড়পিসিমা থাকতেন, আমরা মাঝেমধ্যে তাঁর কাছে যেতাম। তাই মনে ছিল, বললাম, 'হ্যাঁ পরপর পাঁচটা টানেলে ট্রেন ঢোকে।' 'ঢোকার সময়ে কী হয়?' বললাম, 'বাইরের আলোগুলো নিভে যায়। আর ট্রেনের ভেতরের আলোগুলো জ্বলে ওঠে।' প্রায়ান্ধকার রাস্তায় বাবা আমার সামনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওই আলোগুলো কখনও নিভতে দিসনে।' বাবার কথাকটি আমার জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে আছে। জীবনের অন্ধকারের দিনে ওই কথাগুলো অবলম্বন করে আসন্ন হতাশার গুহা থেকে বহুবার উঠে দাঁড়াতে পেরেছি।

প্রায়ান্ধকার রাস্তায় বাবা আমার সামনে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওই আলোগুলো কখনও নিভতে দিসনে।' বাবার কথাকটি আমার জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে আছে। জীবনের অন্ধকারের দিনে ওই কথাগুলো অবলম্বন করে আসন্ন হতাশার গুহা থেকে বহুবার উঠে দাঁড়াতে পেরেছি।

মোটের ওপর গান্ধীবাদী হলেও বেশ কিছু আপত্তিও ছিল

বাবার দেশপ্রেম ছিল নীরব। একজন দরিদ্র শিক্ষকের পক্ষে কাজে যা করা সম্ভব ছিল তা বিনা দ্বিধায় করেছেন। একটি নিঃসম্বল ছাত্রকে মোটা খরচগুলি প্রত্যেক সপ্তাহে দিতেন। ছেলেটি বুদ্ধিমান ছিল এবং পরে পরীক্ষায় ভালো ফল করেছিল। এই ছেলেটির কৃতজ্ঞতার সীমা ছিল না। কত রকমের ছোটখাটো জিনিসের, যেমন— ছাতা, চটি, পাঠ্যপুস্তক, জল-খাবারের পয়সা বা ওষুধ কেনার পয়সা দিয়ে তাদের ছোটবড় সংকট থেকে উদ্ধার করেছেন যে তার ইয়ত্তা নেই। নিজে থেকে কাউকে জানাতেন না, কখনও কখনও শুধু মাকে জানাতেন। স্কুলের নির্দেশে দুখানি বই লিখে দিয়েছিলেন। এবং একটি বেশ বড় অনুবাদকর্মও করেছিলেন। ওই টাকাটা ছাত্রহিতের জন্য মূলত ব্যবহার করতেন। তিনটি এই ধরনের পারিশ্রমিকে

স্কুল ওঁকে বেশ ঠকিয়েছিল। পরে আর কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এরকমভাবে আত্মসম্মান খর্ব হতে দেননি। সংসারের খরচ থেকেও গরিব ছাত্রদের সাহায্য করতেন। এক-এক সময় খুব দরিদ্র ছাত্রদের পরীক্ষার আগে পড়িয়ে দিতেন পুরো পাঠ্যতালিকার সমস্ত অংশটা। বলা বাহুল্য, সবটাই বিনা পয়সায়। এমন কয়েকজন অনেক বড় পদ পেয়ে বড় পদের অধিকারী হয়ে কখনও কিছু উপহার নিয়ে এসে প্রণাম করেছে। চলে যাবার পর আমি জিজ্ঞেস করেছি, 'ছেলেটি কে বাবা?' বলতেন, 'কবে লেখাপড়ার সংকটে হয়তো কিছু বুঝিয়ে দিয়েছি ওকে, ছেলেটা তা ভোলেনি। তাই।'

এমন বহু লোককে সাধ্যমতো সাহায্য করতেন, কাউকে কিছু বলতেন না। না বলে নীরবে এই শিক্ষাটি দিতেন যে বাইবেলে যে শিক্ষা আছে তোমার ডান হাত কী করে তোমার বাঁ হাত যেন তা জানতে না পারে।

একজন চিনা ফেরিওয়ালা জিনিস বেচতে এসে ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও ভাঙা ইংরেজি ও হিন্দিতে বাবার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। ওঁদের মধ্যে একসঙ্গে চা-খাবার খাওয়া আর উপহার আদানপ্রদানে বছর তিনেক খুব বন্ধুত্ব হয়। বিদায় নেবার দিন দু-জনেরই চোখে জল।

বলতেন, কত দূর দেশ থেকে গাধা ভাড়া করে, কতকটা ট্রেনে, এইভাবে মাথায় বেঁধে বোঝা নিয়ে আসে, কত টাকাই বা রোজগার! নিত্যনতুন দেশ দেখার আগ্রহ ওর প্রবল— এইখানটায় দু-জনের মিল।

একটা ঘটনা মনে পড়ে। আমাদের বাড়িতে একটি নীল এনামেল করা সাবানদানি ছিল। একদিন আমার হাত থেকে পড়ে গিয়ে তার একটা খুব ছোট্ট টুকরো খসে যায়। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্বরে বাবা বললেন, 'ভাঙলি, তাও কার জিনিস? কবির।' বললাম, 'তা হলে তুমি ওটা পেলে কী করে?' বললেন, 'কবি আর আমি পাশাপাশি ঘরে থাকতুম। এক স্নানের ঘরে স্নান করতুম। একবার উনি বিলেত গেলেন আমার সাবানকৌটো নিয়েই। বাড়ি আসবার সময়ে আমি ওঁরটা নিয়ে এলুম। দুটো একই রকম দেখতে ছিল।' কবির ব্যবহার্য একটা বস্তুর সম্বন্ধে এতটা মমতাবোধ।

কবির আসন্ন-মৃত্যুর কথা জেনে বাবা যৎসামান্য খেয়ে স্কুলে গিয়ে কিছু পরে ফিরে এলেন। উদ্‌ভ্রান্তের মতো নয়। প্রশান্ত ভাবে চোখ না নামিয়ে মাকে বললেন, 'চলে গেলেন, taller than the tallest.' আর কিছু না বলে কাচের পাত্রে জল ভরে সঙ্গে একটি গ্লাস নিয়ে উঠে গেলেন। তখন চারটে হবে। বললেন কেউ যেন না ডাকে। ছাদের ভিতর দিক থেকে তালা দিয়ে একা সারারাত রইলেন। সকালে থমথমে চেহারা ও জবাফুলের মতো লাল চোখ দেখে বুঝলাম কথা বলা যাবে না। পরদিন স্কুল বন্ধ। সেদিনও নীরবে একাকী, আমাদের সাহস হয়নি কথা বলার। তৃতীয় দিনে দরকারি দু-একটা কথা বললেন। তারপর আমাদের সাহস বাড়লে খুব ধীরে দু-চারটি কথা বললেন। কোথায় ব্যথা লেগেছিল তা ওরই মধ্যে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন: ইন্দ্রপাত। অদ্ভুত এক স্থৈর্যে নিজেকে প্রকাশ বা অযুক্তি থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। ওই গাম্ভীর্য আমরা কেউ পাইনি, কিন্তু মাঝে মাঝে যেন বাবাকে সম্মান করার জন্যই বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে গম্ভীর হয়ে যাই। ভেবে দেখেছি ওই পরিবেশে যে ধরনের আলাপ চলে, তার সঙ্গে সুর মেলালে বাবাকে, তাঁর আচরণকে, যেন নীচে নামিয়ে আনা হয়।

বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তেমন কেউ ছিলেন না। কিন্তু গুণী পণ্ডিত কিছু লোক বাবাকে শ্রদ্ধা করতেন, যাঁদের সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব ছিল। বাবাও তাঁদের শ্রদ্ধা করতেন। সংস্কৃতজগতে সর্বজনশ্রদ্ধেয় পণ্ডিত দুর্গামোহন ভট্টাচার্যের (তাঁর বহুবিদ্যাবিদ পুত্র শ্রীমান দীপক ভট্টাচার্য পিতার আরব্ধ অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ সংহিতার সংস্করণ সম্পন্ন করেছিলেন)। আরও দু-চারজন বাঙালি ও অবাঙালি পণ্ডিতের সঙ্গেও বাবার বন্ধুত্ব ছিল।

গান্ধীজির যন্ত্রবিমুখতা আধুনিক যুগে সম্পূর্ণ অচল একটা তত্ত্ব। বিশের শতকে দ্বিতীয় শতকের জীবনযাত্রা যাপন করা চলে না। কাজেই গান্ধীজির স্বল্পব্যয়ের পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন আদর্শকে সম্মান করলেও নিশ্চিতভাবে গান্ধীজির অনুসরণ করতে পারতেন না।

আমরা যখন বেশ ছোট তখন এক পারিবারিক বন্ধুর সঙ্গে মা-বাবার বেশ উত্তেজিত আলোচনা শুনতাম, বল্‌শেভিক তত্ত্ব নিয়ে। কোথাও কোনও সংগ্রাম বা বিপ্লব হচ্ছে ওই নামে। আমাদের সরিয়ে রাখা হত ওই আলোচনা থেকে। তা ছাড়া আমরা এত ছোট ছিলাম যে বুঝিয়ে দিলেও বুঝতে পারতাম না। শুধু বলতে চাই যে, পৃথিবীর কোনও প্রান্তে যদি অশান্তি ক্ষয়ক্ষতি ধ্বংস-হিংসা বিপ্লব ও পুনর্গঠন হত, সেসব সম্বন্ধে বাবা (মা-ও) অবহিত থাকতেন।

মোটের ওপর গান্ধীবাদী হলেও বেশ কিছু আপত্তিও ছিল বাবার। বলতেন এত বড় একটা দেশের মানুষের বস্ত্রসংকট দূর করার জন্য খদ্দর বুনে সমাধান করা যাবে না। সে সময়ও লোকে দিতে পারবে না, সে মূল্যও না। তা ছাড়া গান্ধীজির যন্ত্রবিমুখতা আধুনিক যুগে সম্পূর্ণ অচল একটা তত্ত্ব। বিশের শতকে দ্বিতীয় শতকের জীবনযাত্রা যাপন করা চলে না। কাজেই গান্ধীজির স্বল্পব্যয়ের পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন আদর্শকে সম্মান করলেও নিশ্চিতভাবে গান্ধীজির অনুসরণ করতে পারতেন না। একদিকে গান্ধীবাদীদের নিষ্প্রশ্ন অনুসরণ, অন্যদিকে গান্ধীজির প্রতি শাসকদলের ব্যবহার— এই দুটোর কোনওটাই বাবা মেনে নিতে পারতেন না। ফলে গান্ধী সম্বন্ধে যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও, তাঁর রাজনীতি সমাজনীতি নিয়ে ভিন্নমতও বেশ ছিল। মোটের ওপর দেশের স্বাধীনতার জন্য একনিষ্ঠ আগ্রহ দু-জনের মধ্যে একই রকম অনুপ্রেরণা জাগাত।

বাবাকে বুঝতাম কতটুকু বা? কিন্তু শ্রদ্ধা করার মতো বহু উপাদান চোখে পড়ত।

(সমাপ্ত)

সম্পাদক অশোক মিত্র ও লেখকের সৌজন্যে 'আরেক রকম', ১৬ জুন ২০১৩ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

ভ্রমণ কথা

এক টুকরো ভাঙা দেওয়াল

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

ফ্রান্সের রোয়াসিতে শার্ল দ্য গল এয়ারপোর্টে বার্লিনের প্লেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি, একটা কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে হঠাৎ আমাকে দেখে একেবারে চমকে উঠে, হাসিভরা উদ্ভাসিত মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। পরের মুহূর্তেই যেন কোনও ভুল বুঝতে পেরে সে আবার চলতে শুরু করল। চলে যেতে যেতে দুবার মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখল, তার মুখে দুবারই আমি আনন্দের হাসি দেখে অবাক।

বার্লিন এয়ারপোর্টে লাগেজের অপেক্ষায় কনভেয়ার বেল্টের কাছে দাঁড়িয়ে নিজের স্যুটকেসের রং মনে করবার চেষ্টা করছি, হঠাৎ দেখি সেই মেয়েটি হাসিমুখে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে আরও হেসে বলল, তোমাকে দেখতে ঠিক আমার বাবার মতো। তাই চমকে উঠেছিলাম। বাবা এখন এখানে আসবে কী করে! বাবা তো পর্তুগালে। আমাদের বাড়ি পর্তুগালের কান্তানহেদেতে।

আমি কী বলব ভেবে না পেয়ে বললাম, তুমি কি প্যারিসে থাকো, না বার্লিনে? এখানকার পেনসন বা পনজিয়ন (Pension, পারিবারিক মালিকানা ও তত্ত্বাবধানে আট-দশ ঘরের ছোট হোটেল) কোন অঞ্চলে কী ধরনের পাওয়া যায় তুমি কি জানো?

মেয়েটি আমাকে নিশ্চিন্ত করার ধরনে বলল, তোমার কোনও চিন্তা নেই। এখুনি একজন আসবে, সে তোমাকে ভালো কোনও পেনসন দেখে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

নিশ্চিন্ত হব, নাকি অজানা কোনও দুর্ভাবনার কারণ ঘটছে বুঝতে পারি না।

প্রায় সাত ফুট লম্বা, রোগা-পাতলা একটি ছেলে এল। মেয়েটি বলল, এই তোমাকে পেনসন খুঁজে দেবে। এর নাম মার্টিন।

আমাকেও আমার নাম বলতে হল। মেয়েটি বলল, তার নাম সোনিয়া। সোনিয়া লুরেঙ্কো। বাবা দোমিঙ্গোস আন্তোনিয়ো লুরেঙ্কো।

স্ত্রীওয়াল্ট

মার্টিন ততক্ষণে এক ঝটকায় আমার বিশাল স্যুটকেস কাঁধে তুলে নিয়েছে। আমি যত তাকে বোঝাতে যাই শুধু ফিতে ধরে টানলেই স্যুটকেসটা কুকুরছানার মতো পিছন পিছন যাবে, মার্টিন ততই বলে—ওকে, নো প্রবলেম!

এয়ারপোর্টের হোটেল রিজার্ভেশন কাউন্টারে হোটেল-পেনসনের তালিকায় চোখ বুলিয়ে দু-তিনটে পেনসনে ফোন করে সে আবার আমার স্যুটকেস তুলে নিয়ে

ভাঙা গির্জার চেয়ে একটা দোকানের শো উইন্ডোতে বার্লিনের ভাঙা প্রাচীর আমাকে বেশি মুগ্ধ করে দিল। দেশ দুভাগ করা কত বছরের সেই উদ্ধত হৃদয়হীন দেওয়াল দুদেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মিলনাকাঙক্ষায় মাটিতে মিশিয়ে গেছে। ছোট বড় নানা মাপের ভাঙা টুকরো নানা দামে বার্লিনের দোকানে এখনও বিক্রি হচ্ছে। আমিও প্রথমদিনেই ১০ মার্কে একটা ছোট্ট টুকরো কিনলাম, এটা চার্লি চেক পয়েন্টের দেওয়ালের টুকরো।

বাইরে তার হুডখোলা ছোট গাড়িতে তুলে নিল। আধঘণ্টা পর বার্লিনের বিখ্যাত রাস্তা কুরফুরস্টেন ডম থেকে ডাইনে ঘুরে উলান স্ট্রাসে বা উলান স্ট্রিটে পড়ে ফুটপাতের ওপরেই পুরনো আমলের মস্ত একটা অট্টালিকার সামনে গাড়ি থামাল। মার্টিন ডোরবেল বাজাতেই দরজা খুলে গেল, আমরাও চওড়া কাঠের সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায় উঠে আরেকটা বন্ধ দরজার ঘণ্টি বাজিয়ে ভিতরে হোটেলের জার্মান মালিককে পেয়ে গেলাম।

ঘর একটা আছে বটে, আমি যেমন চাই ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমও আছে, তবে এ শুধু আজকের রাতটার জন্য। ভাড়া ১০০ ডয়েচ মার্ক অর্থাৎ আমাদের মুদ্রায় আড়াই-তিন হাজার টাকা। আর মালিকের প্রাক্তন স্ত্রী যেহেতু ভারতীয়, আমিও ভারতীয়, অতএব আগামীকাল থেকে একই ভাড়ায় তাঁর চেনাজানা কোনও হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা করাটা তাঁর পক্ষে খুবই আনন্দের হবে।

শুনে মার্টিন হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। আবার পাঁচ-ছ মিনিটেই তিনতলায় উঠে এল, তার কাঁধে আমার সেই হস্তিশাবকটি।

কাল আবার দেখা হচ্ছে একথা জানিয়ে, আমাকে ধন্যবাদ প্রকাশের কোনও সুযোগ না দিয়ে দুজনেই নেমে গেল।

এভাবে হঠাৎ একদিন, গ্রীষ্মের এক চমৎকার বিকেলে আমি বার্লিনে চলে আসব, বাল্যে কৈশোরে বা তরুণ বয়সের কোনও আজগুবি দিবাস্বপ্নেও ভাবিনি। বার্লিন আমার কাছে একইসঙ্গে ইউরোপের সবচেয়ে জীবন্ত শহর আর ইতিহাসের কেন্দ্রীয় যাদুঘর বা সদর কার্যালয়।

হোটেলের ঘর ও স্নানঘর দেখে ভালো লাগল। সব কিছুই ঝকঝকে, তকতকে, পরিপাটি। বাক্সটি রেখে আমি বার্লিনের রাস্তায় নেমে পড়ি। এই পেনসনটি আসলে একটি চৌমাথায়। চারদিকেই বড় বড় চওড়া রাস্তা। পাঁচ মিনিট হাঁটলেই কুরফুরস্টেন ডম। সে রাস্তায় পড়ে ফুটপাত ধরে ডানদিকে হাঁটতে থাকি। দোকান রেস্তোরাঁ কাফে বার। আর অবিরাম জনস্রোত। সামনেই ছবিতে দেখা বার্লিনের সেই ভাঙা গির্জা।

ভাঙা গির্জার চেয়ে একটা দোকানের শো উইন্ডোতে বার্লিনের ভাঙা প্রাচীর আমাকে বেশি মুগ্ধ করে দিল। দেশ দুভাগ করা কত বছরের সেই উদ্ধত হৃদয়হীন দেওয়াল দুদেশের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মিলনাকাঙক্ষায় মাটিতে মিশিয়ে গেছে। ছোট বড় নানা মাপের ভাঙা টুকরো নানা দামে বার্লিনের দোকানে এখনও বিক্রি হচ্ছে। আমিও প্রথমদিনেই ১০ মার্কে একটা ছোট্ট টুকরো কিনলাম, এটা চার্লি চেক পয়েন্টের দেওয়ালের টুকরো। দশ-বারো বছর আগে, তখন পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়ে গেছে যে ভাঙা জার্মানি আবার জোড়া লাগবে, সেই শুভ ঘটনার আর মাত্র মাস কয়েক বাকি। পুনর্মিলিত জার্মানির রাজধানী দেশ ভাগের আগের মতোই বার্লিন হবে, না বন হবে, তাই নিয়ে তখনও তর্ক-বিতর্ক চলছে, সেই সময় পশ্চিম জার্মানির বন-এ বিখ্যাত জার্মান সাপ্তাহিক রাইনেস্কুর মেরকুর-এর অফিসে আমি কিছুদিন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনা বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে যাওয়া-আসা করতাম। ভারতীয় সংবাদপত্র সমিতির মধ্যস্থতায় আমার এই এক সপ্তাহের শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন জার্মান সংবাদপত্র প্রকাশক সমিতি। এসেছিলাম কোপেনহেগেনে পত্রিকা-সম্পাদকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে, সেখান থেকে বন-এ কয়েকটা দিন ওই পত্রিকার কর্মপদ্ধতি দেখে দেশে ফেরার কথা। তখন বিদেশে কেন যে শুধু সম্মেলন ও পত্রিকা-অফিস সেরে, কোথাও কিছু না দেখে, না বেড়িয়ে চলে আসতাম সেকথা ভেবে এখন খুবই অবাক হই, খুব আফসোস হয়। যাইহোক, সেবার বন-এ একদিন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক আমাকে বললেন, ৩ অক্টোবর তুমি অবশ্যই চলে এসো, রি-ইউনাইটেড জার্মানির নতুন রাজধানী বন-এ তোমাকে আমি নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম। তুমি এক সপ্তাহের জন্য রাইনেস্কুর মেরকুরের অতিথি হয়ে থাকবে।

এর সপ্তাহখানেক পরে, যতদূর মনে পড়ে লন্ডনে দি টাইমস পত্রিকার নতুন অফিসে একদিন সন্ধেবেলা টিভিতে বনকে রাজধানী করার পক্ষে সেই প্রধান সম্পাদক মশাইকে জোরালো সওয়াল করতেও দেখলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনও রাজধানী হল না, আমারও নেমন্তন্ন ফস্কে গেল। আমার অনুপস্থিতিতেই দুই জার্মানি মহাসমারোহে এক হয়ে গেল, বার্লিন হল তার রাজধানী। সেই বার্লিনের চূর্ণ-বিচূর্ণ দেওয়ালের টুকরো।

পরদিন সকালে বার্লিন দর্শনের বাসে চড়ে বসি। শহরের যে-কোনও স্টপ থেকে উঠুন, যে-কোনও স্টপে নেমে পড়ুন। আবার যখন খুশি সেই স্টপ থেকে একই রকম আরেকটা বাসে চড়ুন, প্রত্যেক স্টপেই কুড়ি মিনিট পরপর বাস পাবেন। এইসব বাস চক্রাকারে একই রুটে ঘুরছে। আজকাল ইউরোপের অধিকাংশ শহরে ছাদখোলা দোতলা এই সিটিভিসন বাস চলছে। এই বাসে চড়েই শহর ঘুরি। আপনমনে দেখে বেড়াই। ছবি তুলি।

এক ফাঁকে পেনসনে ফিরে কাছেই, প্রায় রাস্তার ওপারে আরেকটি পেনসনে থিতু হই। আগের পেনসনওলা সকালেই এয়ারপোর্টে চলে গেছেন, যাচ্ছেন দিল্লি আগ্রা কাঠমান্ডু, আমার জন্য একটি চিরকুটে নতুন এই পেনসনের ব্যবস্থাপত্র করে গেছেন।

সন্ধ্যায় সোনিয়া-মার্টিন এসে হাজির। কালকের পেনসনে গিয়ে আমার নতুন ঠিকানা নিয়ে চলে এসেছে। তারা আমাকে

কফি খাওয়াতে নিয়ে যাবে। আমি দুজনকে ঘরে বসিয়ে নিচে নেমে রাস্তার ওপারের ছোট্ট সুপার মার্কেট থেকে বড় এক বোতল কোকাকোলা কিনে ফিরে আসি। আসার সময় পেনসন মালিকের ছেলের কাছ থেকে বাড়তি দুটো গ্লাসও চেয়ে আনি।

গল্পে গল্পে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। আমি যে মাত্র গতকালই জীবনে প্রথম এই ঐতিহাসিক শহরে এসে পৌঁছেছি সেকথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। রাত হয়ে যাচ্ছে দেখে সোনিয়া বলল, তুমি এবার নিশ্চয়ই ডিনার করবে? চলো আমরা তোমাকে সঙ্গ দেব। আমাদের দুজনের খাবার রান্না করে রেখে এসেছি, ফলে আমরা তোমার সঙ্গে খেতে পারব না।

নীচে নেমে দুজনে দুটি পোস্টের সঙ্গে ভারি লম্বা চেন দিয়ে বাঁধা দুটো সাইকেল খুলতে খুলতে বলল, আমরা অনেক দূরে থাকি, সাইকেলে প্রায় দুঘণ্টার পথ। না হলে তোমাকেও আমাদের বাড়িতে ডিনারে নিয়ে যেতাম।

মার্টিন বার্লিনে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে, একেবারে শেষের মুখে। সোনিয়া প্যারিসের কাছে সিতে ইউনিভারসিতে (Cite' universite) থেকে স্কলারশিপ পেয়ে পড়াশোনা করে। মার্টিন একবার পড়াশোনার সূত্রে লিসবনে গিয়েছিল, সেখানেই দুজনের প্রথম দেখা। সোনিয়া এই প্রথম বার্লিনে এসেছে, আবার ফিরে যাবে। আমাকে বলল, এখানকার মেয়েগুলোকে দেখেছ, পামগাছের মতো লম্বা একেকটা, একে এখানে একলা রেখে ফিরে যেতে আমার ভাবনা হয় না?

মার্টিন সোনিয়ারই বয়সি। সাধারণ গরিব ঘরের ছেলে। সোনিয়া বলল, এত কম ভাড়ায় থাকে যে শীতকালে তার মেসে রুম হিটিংয়ের ব্যবস্থাও নেই। কী কষ্ট ভাবো তো!

পেনসন থেকে কুরফুরস্টেন ডমে ডিনারের রেস্তোরাঁ পর্যন্ত সাইকেল দুটোকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। রেস্তোরাঁর স্টুয়ার্টকে দিয়ে মার্টিনের ক্যামেরায় আমাদের তিনজনের ছবিও তোলানো হল।

পরদিন কন্ডাক্টেড ট্যুরে গেলাম স্প্রীওয়াল্ট বা স্প্রেওয়াল্ট। প্রথমে ট্যুরিস্ট কোচে বার্লিন শহর থেকে একশো কিলোমিটার। সেখান থেকে দিশি নৌকোয় জলজঙ্গলের

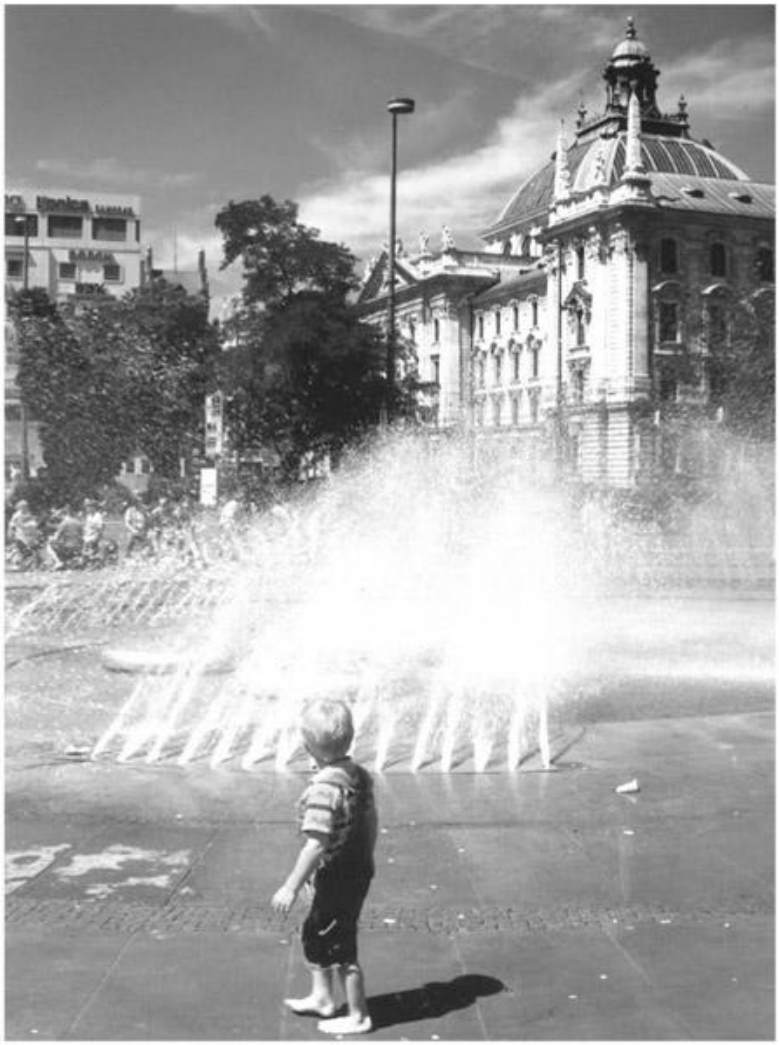

মিউনিখের কার্ল প্লাৎস

শিরা উপশিরায়।

আগের দিন আমি যখন টিকিট কিনতে যাই, তখন পর্যটন সংস্থার একজন কর্মচারী আমাকে পইপই করে বারণ করেছিলেন স্প্রেওয়াল্টে যেতে, কেননা এই ট্যুরটি শুধুমাত্র জার্মানদের জন্য, দলে একজনও বিদেশি থাকছে না। ধারাভাষ্যও শুধুমাত্র জার্মান ভাষাতেই দেওয়া হবে ইত্যাদি। আমাদের সুন্দরবন ধরনের জায়গাটার কথা শুনে আমি সেখানে যাব বলে ভেবে রেখেছি, অতএব আমাকে নিরস্ত করবে কে?

স্প্রী বা স্প্রে হল নদী, আর ওয়াল্ট মানে বন। অঞ্চলটার নাম বাংলায় স্প্রেঅরণ্য। সকাল সাড়ে আটটায় ট্যুরিস্ট কোচ ছাড়ল ২১৬ কুরফুরস্টেন ডম-এ ট্র্যাভেল এজেন্সির অফিসের সামনে থেকে। ঘণ্টা

একদিন সন্ধেবেলা হাঁটতে হাঁটতে একটা কাফেতে ঢুকে মজার অভিজ্ঞতা হল। বেশ বড় এই কাফেটির নাম কাফে কিইজে (Caffe Kisse)। এখানকার নিয়ম শুনলে আমাদের নারীবাদীরা আহ্লাদে আটখানা হবেন। কেবলমাত্র মহিলারাই এখানে তাঁদের পুরুষ নৃত্যসঙ্গী বেছে নেন।

দুয়েক বাসে যেতে নতুন ও পুরনো বার্লিনের ঘরবাড়ি দেখতে দেখতে গেলাম।

বাস থেকে নেমে অল্পখানিক হেঁটে নৌকারোহণ। দিশি নৌকোয় চড়ে বনের মধ্য দিয়ে টানা দুঘণ্টা খালে খালে ঘুরে বেড়ালাম। সুন্দরবন ও কেরালার খাঁড়ির কথা মনে পড়ে। মাইলের পর মাইল বনজঙ্গল, দীর্ঘ নদীর বা খালের শাখাপ্রশাখা। শুনলাম সব কটি শাখাপ্রশাখা যোগ করলে এই জলপথের দৈর্ঘ্য ১০০০ কিলোমিটার।

ইউরোপ-আমেরিকার সর্বগামী ট্যুরিস্টরা এই জায়গাটার কথা এখনও জানে না। ট্যুরিস্ট কোচের সবাই দেখলাম জার্মান। বিদেশি বলতে একমাত্র আমি। এখনও পর্যন্ত শুধু জার্মানরাই এখানে বেড়াতে আসেন। জার্মানির নানা জায়গা থেকে কাজে বা ছুটিতে বার্লিনে এলে কেউ কেউ স্প্রীওয়াল্ট ঘুরে যায়।

এই স্প্রী নদীর জঙ্গলেই আমার সঙ্গে আলাপ হল আন্দ্রে ও রেজিনা ব্লিৎসের। এরা এসেছে মিউনিখ থেকে। আন্দ্রে বিখ্যাত সিমেন্স কোম্পানিতে প্রজেক্টস ম্যানেজার। আগাগোড়া শুধু জার্মান ভাষায় ধারাভাষ্য আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না সেটা লক্ষ করে সে নিজে থেকে আমাকে জরুরি কথাগুলো ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। বলল, ওরাই মাত্র দুবছর আগে স্প্রীওয়াল্টের নাম শুনেছে, এই প্রথম দেখতে এসেছে। সেদিক থেকে আমি খুবই ভাগ্যবান।

জলজঙ্গল পরিক্রমার শেষে কাছেই একটা রেস্তোরাঁয় লাঞ্চের সময় ওরা দুজনেই আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি ওদের টেবিলে বসতে পছন্দ করব কি না। সানন্দে একসঙ্গে বসা হল, খাওয়াও হল, কিন্তু মুশকিল হল আমাকে আমার খাবারের দাম দিতে দেওয়া হল না।

বিকেলে বার্লিনে ফিরে তারা আমাকে বারবার মিউনিখে তাদের বাড়ি যাবার নিমন্ত্রণ করে অফিস ও বাড়ির ফোন ফ্যাক্স ঠিকানা বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিল। মিউনিখে কোথায় কোন কাফেতে আমার অবশ্যই যাওয়া উচিত তার একটা তালিকা ও পথনির্দেশও আগেই তৈরি করে দিয়েছিল।

হোটেলে ফিরতে ফিরতে ভাবি, বিশাল এই বিশ্বে কোথায় ছিল সোনিয়া-মার্টিন, কোথায় থাকে আন্দ্রে-রেজিনা, কোথায় কোন সুদূর কোণে পড়ে থাকি আমি, অথচ দেখা হওয়া মাত্রই মনে-মনে হৃদয়-হৃদয়ে এমন সহজে আমাদের সেতুবন্ধ হয়ে যায়! মানুষের স্বভাবই যদি এমন, তাহলে কেন দেশে-দেশে ধর্মে-ধর্মে জাতে-জাতে দলে-দলে জনে-জনে বন্ধুভাবের এত অভাব?

আমি কলকাতায় ফিরে এসে ও সোনিয়া-মার্টিনের চিঠি পাই। সোনিয়া কবে পর্তুগালে যাচ্ছে, কবে আবার ফ্রান্সে 'সিতে ইউনিভার্সিতে'-তে ফিরছে, কবে তার পরীক্ষা, মার্টিন লেখাপড়া শেষ করে কোথায় কীরকম চাকরি পেয়েছে, তাকে এখন মাসে কতবার জার্মানি-পর্তুগাল করতে হচ্ছে, আমি হঠাৎ বার্লিনে এলে তখন সে যদি পর্তুগালে থাকে তাহলে বার্লিনে তার ভাইকে কোন ফোন নম্বরে পাওয়া যাবে—এসব কথাই তারা আমাকে লিখে জানায়।

আন্দ্রেরাও লেখে এবার শীতে অস্ট্রিয়ায় তাদের স্কি হলিডে কেমন কাটল, আমি থাকলে কত আনন্দ হত, খুব শিগগিরই আবার কবে মিউনিখ আসছি ইত্যাদি।

মহাকবি গ্যেটে, শিলার, হাইনে, বিসমার্ক প্রমুখ বিখ্যাত জনদের নামে লম্বা লম্বা রাস্তা ধরে সকাল দুপুর বিকেল সন্ধে শুধু হেঁটে বেড়িয়েও বার্লিনের বেশ খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। একদিন সন্ধেবেলা হাঁটতে হাঁটতে একটা কাফেতে ঢুকে মজার অভিজ্ঞতা হল। বেশ বড় এই কাফেটির নাম কাফে কিইজে (Caffe Kisse)। এখানকার নিয়ম শুনলে আমাদের নারীবাদীরা আহ্লাদে আটখানা হবেন। কেবলমাত্র মহিলারাই এখানে তাঁদের পুরুষ নৃত্যসঙ্গী বেছে নেন। পুরুষরা এখানে কোনও মেয়েকে নৃত্যসঙ্গিনী হবার নিমন্ত্রণ জানাতে পারবেন না। আপনি হয়তো বসে বসে কফি বা কোলা বা ফ্রুট জুস বা মিনারেল ওয়াটার (গ্যাস ছাড়া বা গ্যাসযুক্ত) বা লাল বা সাদা ওয়াইন পান করছেন (যা-ই নিন এক গ্লাসের দাম ১০ মার্ক, ওটাই এই কাফের প্রবেশমূল্য, কেননা আর কোনও পয়সা নেওয়া হয় না), হঠাৎ অন্য কোনও টেবিল থেকে একজন মহিলা উঠে এসে আপনার দিকে বাঁ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবেন, কী বলবেন ঠিক জানি না, নাচের আমন্ত্রণমূলক কিছু বলবেন, আপনাকেও তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত ধরে সোজা নাচের ফ্লোরে যেতে হবে। এক রাউন্ড বা দু রাউন্ড বা তিন রাউন্ড মেয়েটি যতক্ষণ চাইবেন আপনাকেও তাঁর সঙ্গে ততক্ষণ নাচতে হবে। অথবা হয়তো এক রাউন্ড নাচের পর আপনি টেবিলে ফিরে এসেছেন, আরেকজন মহিলা আপনার পাণিদাত্রী হলেন।

নারীর এই অধিকার নিয়ে মঞ্চে, লিফলেটে ফলাও করে লেখা আছে। এক গ্লাস মিনারেল ওয়াটার নিয়ে সেইসব গর্বিত ঘোষণা পড়ছি, হঠাৎ ভয়ানক চমকে উঠলাম, দেখি আমার টেবিলে কালো পোশাক পরা এক মহিলা একটু ঝুঁকে বাঁ হাত বাড়িয়ে কী যেন বললেন, শুধু বুঝলাম যে ভাষাটা জার্মান। আমি ঘাবড়ে গিয়ে আনাড়ির মতো ইংরিজিতে বললাম, আমি জার্মান ভাষা জানি না, নাচতেও পারি না।

মহিলা আমার কথা বোধহয় কিছুই বুঝলেন না, কিছুটা বিরক্তি মিশিয়ে জার্মান ভাষায় কিছু বলতে লাগলেন, শুনে পাশের টেবিলের এক জার্মান ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করে নাচের জায়গায় চলে গেলেন।

আমি স্টুয়ার্টকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, নাচতে না জানলে এখানে আসতে নেই। ভবিষ্যতে যাঁরা আসবেন তাঁদের জানাই, জ্যাকেট পরে বা স্নিকার পায়ে এখানে প্রবেশ নিষেধ।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ডান দিকে একটা বিশ্ববিদ্যালয় দেখে চমকে উঠি, যতদূর মনে পড়ছে, কার্ল মার্কস, ফ্রয়েড এখানে পড়াশোনা করেছেন! শহরের রাস্তায় রাস্তায় এভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্প-সংগীত সমাজবিপ্লব রাষ্ট্রবিপ্লবের রথী মহারথীদের নিশ্বাস গায়ে লাগলে কার না গায়ে কাঁটা দেবে!

বার্লিন থেকে গেলাম মিউনিখে। একদিন আন্দ্রে-রেজিনা আমাকে নিয়ে গেল মিশায়েলি বিয়ার গার্টেন অর্থাৎ সেন্ট মাইকেল বিয়ার গার্ডেন। উদ্দেশ্য আমাকে প্রকৃত বেভেরিয়ান রীতিনীতির খানিকটা ধারণা দেওয়া। প্রথমে আন্দ্রে আমাকে কার্ল প্লাৎস থেকে গাড়িতে তুলে তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল, দু-মিনিটেই রেজিনা ও আন্দ্রের বোন বেরিয়ে এলেন, তাদের সঙ্গে কয়েকটা ডেকচি ক্যাসারোল ইত্যাদি। সেসব গাড়ির ডিকিতে নিয়ে তারা আমাকে নিয়ে সেই বিয়ার গার্ডেনে পৌঁছলেন। লেকের ধার বরাবর প্রায় দু-আড়াই হাজার লোক বড় বড় মগে বিয়ার নিয়ে নৈশভোজ সারছে। এখানে বাড়ি থেকে রান্না খাবার এনে

এখানকার শুধু বিয়ার নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে ডিনার সারতে পারেন। আবার চাইলে এখানকার বিয়ারের সঙ্গে এখানকার খাবার নিয়েও পুরো ডিনার এখানেই করতে পারেন। আন্দ্রে-রেজিনারা বাড়ির রান্না নিয়ে এসেছিলেন, আনন্দ করে খাওয়া গেল। এ নিছক আমাদের বাইরে খাওয়া বা হোটেল-রেস্তোরাঁয় নৈশভোজ নয়। রাতের খাওয়া উপলক্ষে পুরো উৎসবের পরিবেশে আত্মীয়-বন্ধু সম্মেলনে সন্ধ্যাযাপন।

লেকে রাতেও হাঁস চরছে, আলোকসজ্জিত ছোট একটা নৌকোও খুব চক্কর দিচ্ছে, শুনলাম রিমোট কন্ট্রোলে। এই হল বেভেরিয়ানদের বিয়ার গার্টেন, মস্ত বড় একটা পার্কে মুক্তাকাশ পানাহার।

মিউনিখের কার্ল প্লাৎস-এ আমি রোজই কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াই। একটা গাইড বইয়ে পড়েছিলাম এখানকার মারিয়ান প্লাৎস-এ ঘণ্টার পর ঘণ্টা না কাটালে মিউনিখের মর্মোদ্‌ঘাটন হয় না। আমি ঘুরে ঘুরে মারিয়ান প্লাৎস আর খুঁজে পাই না। একদিন ওরকম ঘুরতে ঘুরতে সামান্য ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পথশিল্পীদের উচ্চাঙ্গ সংগীত শুনছি, শারীরিক ক্লান্তিতে মানুষের মন বোধহয় সংগীতে আরও দ্রুত ধরা দেয়, আমার তখন বেশ একটা মুগ্ধতা এসে গেছে, প্রশংসাসূচক দুয়েকটা মন্তব্যও হয়তো করে ফেলেছি, হঠাৎ শুনি কেউ একজন আমাকে বলছেন, এই মিউজিক আপনার ভালো লাগছে? ভালো যে লাগছে প্রশ্নকর্ত্রী খানিকটা নিশ্চয়ই বুঝেছেন, আমি বললাম, রাস্তায় এরকম উচ্চাঙ্গ সংগীত লন্ডনে শোনা যায় না। গত বছর আমি ভিয়েনায় শুনেছি, অনেক বছর আগে মাদ্রিদের রাস্তায় পেরুর বাঁশি শুনেছি, তবে রাস্তায় এরকম সংগীত বোধহয় শুধু মিউনিখ আর ভিয়েনাতেই এখনও শোনা যায়।

ওঁরা দুজন ছিলেন, একজন চিনাতত্ত্ববিদ, চিনের প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাস নিয়ে জার্মান ভাষায় বই লিখছেন, নাম ক্রিস্টিনে। অন্যজন ভাস্কর, চাকরিও করেন। এঁর নাম প্রিকিতে। দুজনে অভিন্নহৃদয় বন্ধু।

কিছুটা ভিন্ন হৃদয় হওয়া সত্ত্বেও কার্ল প্লাৎস থেকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে এঁরা আমারও বন্ধু হয়ে গেলেন। তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা, কফি খাওয়ার জন্য যেখানে নামা হল সেই জায়গাটার নাম মারিয়ান প্লাৎস! দুদিন ধরে খুঁজে খুঁজে হয়রান, আজ না খুঁজেই পেয়ে গেলাম।

কফি খেতে খেতে মিউনিখের জোড়া গির্জা, প্রশাসন দপ্তরের নতুন ও পুরনো অট্টালিকার স্থাপত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনেক তথ্য জানা গেল। ক্রিস্টিনে গ্রিম ভাইদের রূপকথার ভক্ত ও স্যাঁৎ-এক্সুপেরির ছোট্ট রাজকুমারের অন্ধ ভক্ত শুনে মনে ভারি আনন্দ হল। তার কারণ গ্রিম ভাইদের গল্প বালকবয়সে হুমড়ি খেয়ে পড়েছি আর ছোট্ট রাজকুমার চিরকালই আমার প্রিয় বই, মাসকয়েক আগেও নতুন পড়েছি।

নানা বিষয়ে ক্রিস্টিনের জ্ঞান ও

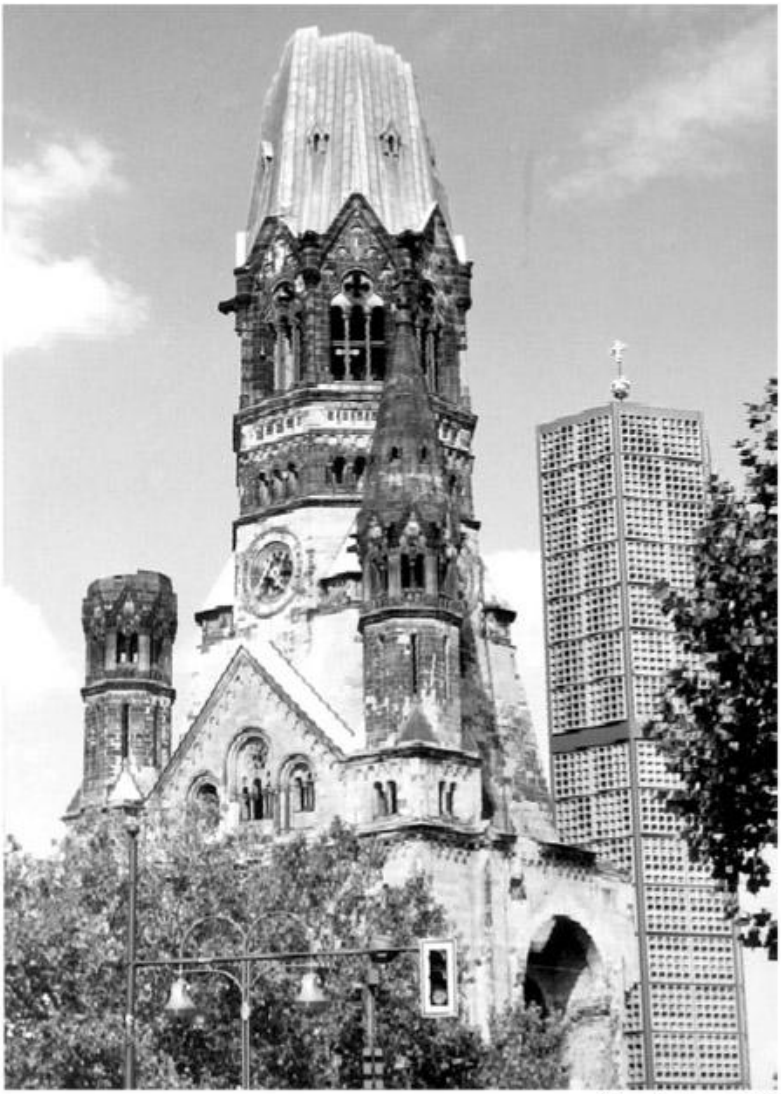

বার্লিনের বিখ্যাত ভাঙা গির্জা

রাস্তায় এরকম উচ্চাঙ্গ সংগীত লন্ডনে শোনা যায় না। গত বছর আমি ভিয়েনায় শুনেছি, অনেক বছর আগে মাদ্রিদের রাস্তায় পেরুর বাঁশি শুনেছি, তবে রাস্তায় এরকম সংগীত বোধহয় শুধু মিউনিখ আর ভিয়েনাতেই এখনও শোনা যায়।

সিলভিনস্টাইন নামের এক হ্রদ দেখলাম। শান্ত নীল জল, পাড়ে রোদ-লাগা সবুজ বন। অস্ট্রিয়ার মধ্যেও খানিকটা ঘোরা হল। যাবার সময় হার্টপেনিং নামে একটা চমৎকার গ্রামে মহা আড়ম্বরে বেভেরিয়ানদের উৎসব হচ্ছে দেখে আমরাও উৎসবের মধ্যে ঢুকে পড়ি। সেখানে পান-ভোজন গান-বাজনায় মন সহজেই মেতে ওঠে। কে বলবে এইসব মানুষজনের মধ্যে আমি আজই প্রথম এসেছি!

কৌতূহল। চিনের প্রত্নতত্ত্ব শুধু নয়, প্রাচীন কবিতা সম্পর্কেও তাঁর অগাধ জ্ঞান। গবেষণার কাজে তাঁকে চিনদেশে থাকতে হয়েছে, আবার মোঙ্গলিয়ায় তাঁবুতেও বাস করেছেন। অনেক পরে অন্যের কাছে শুনেছি তিনি একজন পাশকরা ইঞ্জিনিয়ারও। আবার সেরামিকের কাজেও অতি দক্ষ।

এই দুই গুণী ও জ্ঞানী বন্ধু মিউনিখ থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে একটি গ্রামে থাকেন, রবিবার তাঁরা টেগেনসী নামে একটি বিখ্যাত হ্রদে বেড়াতে যাবেন। সেখানে নীল জল আর সবুজ পাহাড় দেখবার নিমন্ত্রণ জানালেন আমাকে। কোথায় কখন দেখা হবে, কাল ফোনে বা ফ্যাক্সে আমাকে জানিয়ে দেবেন, আমিও আমার মিউনিখের হোটেলের ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর লিখে দিলাম। দুজনে তাঁদের গ্রামে ফিরে গেলেন।

পরদিন ফ্যাক্স পেলাম, 'প্রিয় শ্রীচক্রবর্তী'কে প্রিকিতে ও ক্রিস্টিনে জানাচ্ছেন, আজ তাঁদের আবার মিউনিখে আসতে হল ক্রিস্টিনের মা ও তাঁদের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। মা ও তাঁদের বন্ধু পরদিন ক্যালিফোর্নিয়ায় যাবেন। আমি আগ্রহী হলে আজ রাত নটায় তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে। আমি যেন অমুক হ্যান্ডি টেলিফোন (আমাদের মোবাইল ফোনের মতো) নম্বরে ফোন করি, কোথায় কখন দেখা হবে আমাকে বুঝিয়ে দেবেন।

টেলিফোনে রাস্তা বুঝে নেবার সময়ও জানি না যে এটা আসলে ডিনারের নেমন্তন্ন। ক্রিস্টিনের মা ইসাবেলার বিদেশযাত্রার আগে একসঙ্গে চারজনের এই নৈশাহার, আমিও সেখানে আমন্ত্রিত। ইসাবেলা চিত্রশিল্পী, তাঁর বন্ধু উলরিখেও শিল্পী ও চিত্রশিল্পের শিক্ষিকা। আমিই একমাত্র বাইরের লোক।

যে দেশে এসেছি সে দেশের মানুষের সঙ্গে পরিচিত হলে, সেখানকার সহৃদয় ও সুগভীর মনের অধিকারী মানুষজনের কাছ থেকে আপ্যায়ন পেলে কার না মন ভরে ওঠে! মিউনিখ আমার মন ভরে দিল। আহার্যের চেয়েও বেশি, আড্ডায়।

রাত বারোটায় ইসাবেলা আর তাঁর বান্ধবী উলরিখে চলে গেলেন, কাল দুজনেই যাবেন ক্যালিফোর্নিয়ায় এক শিল্পীসম্মেলনে যোগ দিতে। আমরাও হাঁটতে হাঁটতে মিউনিখ রেলস্টেশনের সামনের রাস্তায় এসে পড়লাম। এখান থেকে আমার হোটেল মিনিট দশেকের রাস্তা, সেটুকু আমার মুখস্থ।

আমি ভেবেছিলাম শুধু আমার অনুরোধ রাখতেই ওঁরা আমার সঙ্গে স্টেশন পর্যন্ত এসেছেন, এখন দেখলাম তা নয়, প্রিকিতে টিকিটের মেশিনে পয়সা ঢুকিয়ে একটা টিকিট নিয়ে সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, কাল ১১টা ৪০-এ এখান থেকে ট্রেনে উঠলে ১২টা ২০তে হোলসকিরচেনে পৌঁছে যাবেন, আমরা স্টেশনে অপেক্ষা করব।

কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে ট্রেনে উঠব, ট্রেনের সামনে কী ডিরেকশন বা ডেসটিনেশন লেখা থাকবে, দুজনে পালা করে আমাকে প্রায় পাখি-পড়া করিয়ে দিলেন।

নীল হ্রদের বদলে ডিনার পেয়ে আমার মনে একটু গোপন খুঁতখুঁতি ছিল, শনিবার সন্ধ্যার ডিনারটি যে অধিকন্তু তা তো আর তখন জানতাম না। নীল হ্রদের নিমন্ত্রণ এখনও বহাল আছে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম।

২

পরদিন হোলসকিরচেনে পৌঁছে দেখি প্রিকিতে-ক্রিস্টিনে গাড়ি নিয়ে হাজির। শুধু তো নীল জলের হ্রদ আর সবুজ বনে ঢাকা পাহাড়ই নয়, তাঁরা আমাকে আরও অনেক কিছু ঘুরিয়ে দেখালেন। নিয়ে গেলেন জার্মানি-অস্ট্রিয়ার সীমানায়। সেখানে সিলভিনস্টাইন নামের এক হ্রদ দেখলাম। শান্ত নীল জল, পাড়ে রোদ-লাগা সবুজ বন। অস্ট্রিয়ার মধ্যেও খানিকটা ঘোরা হল। যাবার সময় হার্টপেনিং নামে একটা চমৎকার গ্রামে মহা আড়ম্বরে বেভেরিয়ানদের উৎসব হচ্ছে দেখে আমরাও উৎসবের মধ্যে ঢুকে পড়ি। সেখানে পান-ভোজন গান-বাজনায় মন সহজেই মেতে ওঠে। কে বলবে এইসব মানুষজনের মধ্যে আমি আজই প্রথম এসেছি! অস্ট্রিয়া সীমান্ত থেকে ফেরার পথে ইসার নদীর তীরে দেখলাম ইসার উৎসব।

মধ্যাহ্নভোজ হয়েছিল হার্টপেনিংয়ে উৎসবের আসরে, নৈশভোজ হল একটা গ্রিক রেস্তোরাঁয়। তারপর তাঁরা আমাকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে ইসাবেলার পেন্টিং, প্রিকিতের ভাস্কর্য, ছোটদের নানারকম বই দেখতে দেখতে মিউনিখে ফেরার সময় হয়ে গেল।

রাত প্রায় বারোটায় দুজনে আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে এলেন। ট্রেন ছাড়তে তখনও দু-চার মিনিট বাকি, দুজনেই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, আমি ট্রেনের কামরায় দরজার কাছে, মনে হচ্ছে যেন বহুদিনের বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, অথচ ঠিক দুদিন আগেও কেউ কাউকে চিনতাম না।

তাই বলে দুদিনের দেখা দুদিনেই শেষ হয় না। হোলসকিরচেন থেকে ফিরে আসার সময় ক্রিস্টিনেকে অনুরোধ করেছিলাম, যেসব জায়গায় তাঁরা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেইসব জায়গার নামগুলো সম্ভব হলে যেন পরদিনই আমাকে ভিয়েনায় লিখে পাঠান। ভিয়েনায় এয়ার ফ্রান্সের আতিথ্যে দুদিন বিনা খরচে আর্টিস হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেই হোটেলের ফ্যাক্স নম্বর আমি লিখে দিই।

ভিয়েনায় পৌঁছেই দুপাতা জোড়া সচিত্র, স-পথচিত্র সব কটি জায়গার নামের

তালিকা পেয়ে যাই। পরদিন একটি চিঠিও পাই, দুই বন্ধু ঘন সবুজ বনপথ ধরে সাইকেল চালাতে চালাতে এই কথা ভেবে আনন্দ পেয়েছেন যে ভিয়েনায় বা ভারতে বা পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তাঁদের এমন একজন বন্ধু আছে যে সারা পৃথিবী দেখে বেড়াবার জন্য পাগল, যখন যে দেশে যাদের সঙ্গেই তার দেখা হয়ে যাক সবাইকেই সে গভীর আনন্দ দিয়ে যায়।

চিঠি পড়ে আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি কার কথা লিখেছে।

কলকাতায় ফিরেও প্রিকিতে-ক্রিস্টিনের চিঠি পাই। আমি মিশর ও চিনের প্রাচীন কবিদের লেখা ভালোবাসি জেনে ক্রিস্টিনে মাঝে মাঝেই চিনা ভাষার প্রাচীন কবিতা ইংরিজিতে অনুবাদ করে পাঠান। আমিও দুয়েকটা বাংলা লেখার ইংরেজি তাঁদের জন্য পাঠিয়ে দিই।

আমার একটা শাদা ঘোড়ার রূপকথা আছে শুনে ক্রিস্টিনে আমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন— আপনার 'শাদা ঘোড়া' পাঠাতে যেন ভুলে যাবেন না, বইটা যতক্ষণ না এসে পৌঁছয় আমি ততক্ষণ আমার নিজস্ব শাদা ঘোড়ার স্বপ্ন নিয়ে থাকব।

আমি তখনও জানতাম না, ছোটবেলায় সত্যিই তার— একটা নয়, দুটো— শাদা ঘোড়া ছিল। আর সে নিজে ছিল অশ্বারোহণের প্রশিক্ষক, তখন তার বয়স মাত্র ষোল। কিশোরী ক্রিস্টিনের হাতে তৈরি কয়েকটা ছোটদের বই দেখেছিলাম, জার্মান ভাষায় বিখ্যাত রূপকথা উপকথা পুরাণকথার বই, আগাগোড়া মুক্তাক্ষরে লেখা, অসামান্য পৃষ্ঠাবিন্যাস, পাতায় পাতায় বিস্ময়কর সব ছবি, হাতের লেখা, হাতের আঁকা সবই একটি ষোল বছরের মেয়ের, দেখেও বিশ্বাস হয় না। এ মেয়ে পরে চেঙ্গিস খানের বংশধরদের সঙ্গে খোদ মোঙ্গলিয়ায় তাঁবুতে কাটাবে, কিংবা চিনদেশের ভাষা ও প্রত্নতত্ত্বের পণ্ডিত হবে এ আর এমন বেশি কী!

বড়দিনের দু-তিন আগে ডাকে আসা একটা প্যাকেট খুলে দেখি ভেতরে চমৎকার মোড়কে জড়ানো মোৎসার্ট ও বিঠোফেনের দুটি ক্যাসেট। সঙ্গে তাঁদের বাড়ির কাছাকাছি তুষারাবৃত নদীর ফটো সাঁটা হাতে তৈরি গ্রিটিংস কার্ড, ভেতরে এই চিঠি:

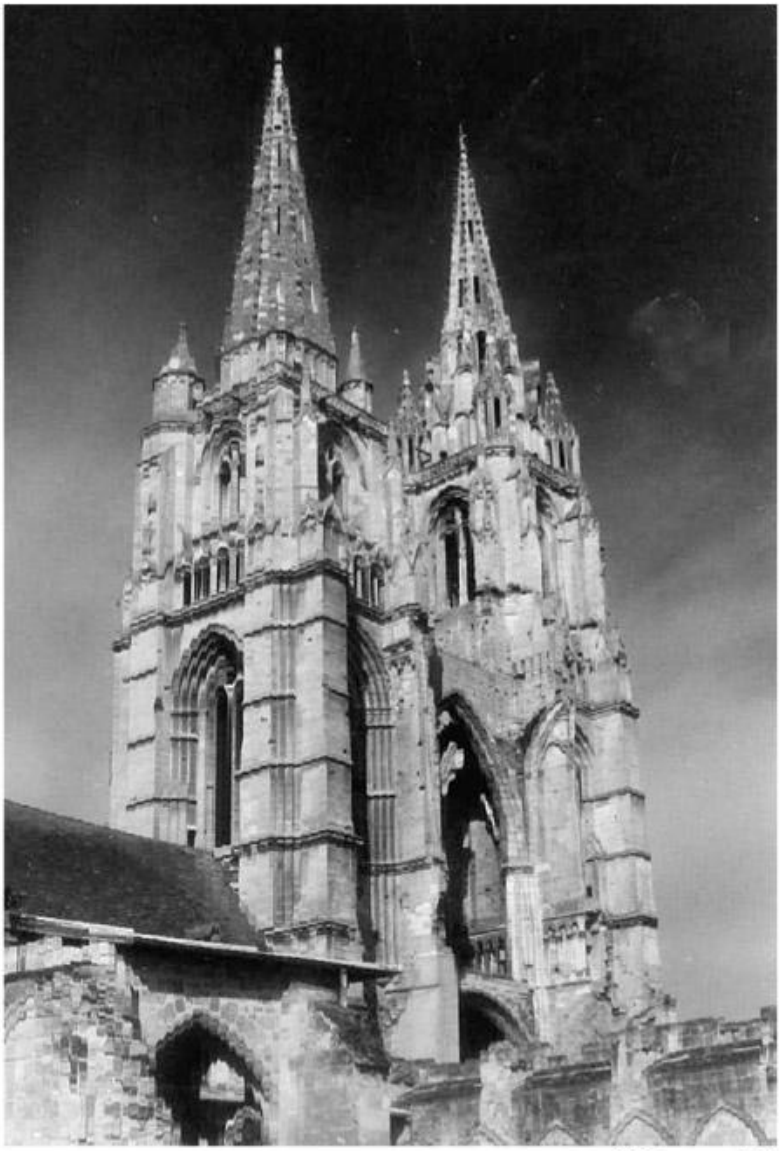

মিউনিখের জোড়া গির্জা,

প্রিয় অমরেন্দ্র

আমরা আশা করছি তুমি তোমার ভ্রমণ উপভোগ করেছ এবং সুস্থ আছ। প্রচুর ঝিকমিকে বরফের মধ্যে আমরা খুবই আনন্দে ছিলাম কিন্তু সূর্য ও বৃষ্টি সব শুভ্রতা লেহন করে নিয়েছে। তাও আমরা তোমার জন্য সে দৃশ্য ক্যামেরায় ধরে রেখেছি, যাতে তুমি ঠান্ডায় না কেঁপেই ভালো করে দেখতে পার।

তোমার জন্য যে সংগীত পছন্দ করেছি, তার মাধ্যমে আমরা ক্রিসমাস ও নববর্ষের আগের অদ্ভুত শান্ত কনকনে পরিবেশের একটু আভাস পাঠাতে চেয়েছি।

আশা করি, এই বাজনা তোমার দেশের ঝলমলে, উষ্ণ আবহাওয়ার সঙ্গেও মানাবে। যদি না মানায়, তাহলে ওই তুষারক্ষেত্রের ওপর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটো (ছোট নদীর ধার দিয়ে হেঁটে বাঁদিকে), যেখানে আমরা উষ্ণ ওয়াইন আর কুকি খাচ্ছি।

শুনেছিলাম, সামনের বছর কখনও তোমার সঙ্গে দেখা হবে— হবেও বা!

তার আগে, আমরা তোমার সঙ্গে কুকি খাচ্ছি— কল্পনা করছি, তুমি আমাদের গোল টেবিলে বসে আছ।

তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য নববর্ষের শুভেচ্ছা।

ক্রিস্টিনে ও প্রিকিতে

প্রথম প্রকাশ 'ভ্রমণ' পত্রিকায়

ছবি: লেখক

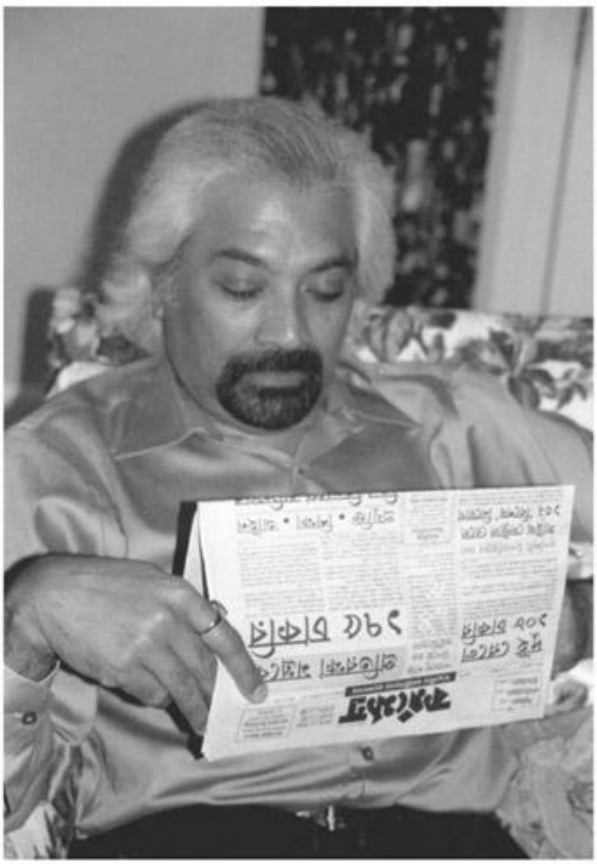

সাম পিত্রোদা: আমেরিকার ওয়ার্ল্ড টেল লিমিটেডের কর্ণধার, অন্ত্রেপ্রেনারশিপ ও টেলি-কমিউনিকেশনস্-এ বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সরকারের টেলিকম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। 'রিসার্জেন্স অব বেঙ্গল' কর্মসূচির উপদেষ্টা।

"একবার ভেবে দেখুন গোটা ভারতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেই কত রকম যোগ্যতার কত লোকের দরকার। এরকম আরও নানা ক্ষেত্রে, ধরুন কৃষিনির্ভর শিল্প ফুড প্রসেসিংয়ে, লক্ষ লক্ষ কাজ আছে। আপনি 'কর্মক্ষেত্র'-য় প্রকাশিত যেসব কর্মপরিকল্পনার কথা বললেন, যেমন পাকা তেঁতুল প্যাকেট করা, বা তরমুজের রস বোতলবন্দী করা, কিংবা পাটের জিনিসপত্র বানানো— এগুলো তো গ্রামে গ্রামে শুরু হওয়া দরকার। উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইনফরমেশন টেকনোলজির সুফল এইসব কাজেও প্রয়োগ করা উচিত। সরকারের ভূমিকা এইখানেই। আর পরিকাঠামো জোগানোয়। বাকি সব নিজেদেরই করতে হবে। কাজের জাত বিচার করে যাঁরা বসে থাকবেন তাঁদের জীবন নিয়ে ভাবনায় কোনও ভুল হচ্ছে কি না সেটাই আগে ভাবা দরকার।"

৫ জুলাই, ২০০১-এ বস্টনে একান্ত সাক্ষাৎকারে 'কর্মক্ষেত্র'-র প্রধান সম্পাদককে সাম পিত্রোদা

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে কর্মক্ষেত্র: www.ekarmakshetra.com

উদ্যোগ, না উদ্‌যোগ?

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

ফ্রি স্কুল স্ট্রিট তখনও মির্জা গালিব স্ট্রিট হয়নি, আর ক্ল্যারিয়ন অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানি তখন ভারতের দ্বিতীয় বৃহৎ বিজ্ঞাপন সংস্থা। আমি যে ব্যাঙ্কে তখন কাজ করি জনসংযোগ আর বিজ্ঞাপন বিভাগে, সেই ব্যাঙ্কের বিজ্ঞাপনের এজেন্সি তখন ক্ল্যারিয়ন।

ক্ল্যারিয়নের অফিস থেকে বেরিয়ে দেখি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও বেরুচ্ছেন। সেই সময়ে তিনি কপি লেখেন, ক্ল্যারিয়নে মধ্যে মধ্যে। তিনি হাঁটতে ভালোবাসতেন, যদিও জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের টাকায় গাড়ি কেনেন। বলতে কি, একটু হতাশই হয়েছিলাম, যখন শুনলাম, 'পদাতিক'-এর কবি পুরস্কার পেয়ে গাড়ি কিনেছেন। 'ম্যাও' কবিতা লিখে তখনও তিনি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে হেলেননি, অর্থাৎ সেটা সেই সময়, দক্ষিণ-কলকাতার রাস্তায় ঝুলি কাঁধে বাসের পিছনে দৌড়নো সুভাষদাকে দেখে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করতেন, 'সুভাষদা কোথায় যাচ্ছেন', শুনতেন 'তাসখেন্ত কি আজারবাইজান' বা ওই জাতীয় কিছু। ক্ল্যারিয়ন থেকে বেরিয়ে সুভাষদাকে দেখে বললাম, 'সুভাষদা, চায়ের দোকানে একটু বসলে কীরকম হয়', তিনি জানালেন, 'ভালোই হয়'। এর পরে, বাবার কাছে শুনেছিলাম, সুভাষদা আমার নাম করে বলেছেন, 'ওর সঙ্গে আর কখনও চা খাব না, হাজারবার বললেও না'।

ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর ছিল না। সেই সময়ে ধনঞ্জয় দাশ ১৯৪৮-১৯৫০ সালের মার্কসবাদী বিতর্কগুলো ছাপছেন, আর আমরা উৎসুক হয়ে পড়ছি, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সেই সময়কার বামপন্থীদের সমালোচনা, রবীন্দ্রনাথ কি বুর্জোয়া কবি? রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবদ্দশাতেই শুনে গিয়েছিলেন, তাঁকে বুর্জোয়া কবি বলা হচ্ছে এবং তিনি ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, ''প্রলেটারিয়েট সাহিত্য'' বললেই উত্তেজিত হয়ে বলছেন, 'ওরা কী বলছে? আমি হাতে কলমে গ্রামের লোকেদের সঙ্গে কাজ করেছি।' তবে ১৯৪৮-৫০-এ বিতর্কটা আরও জোরে হয়েছিল, বামপন্থীদের মধ্যেই পক্ষেবিপক্ষে মতামত শোনা যাচ্ছিল। চা খেতে খেতে সুভাষদাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তিনি তখন জেলে, ১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টি দেশদ্রোহী বিবেচনায় বেআইনি ঘোষিত হয়ে গিয়েছে। জেলে রবীন্দ্রনাথ-বিতর্ক ঠিকই পৌঁছেছিল, সেখানেও কমরেডদের মধ্যে সংশয় ছিল, ভবানী সেনরা রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া অ্যাখ্যা দিয়ে ঠিক করেছেন কিনা। সুভাষদার অবস্থান কী ছিল। প্রশ্নের জবাবে, তিনি জানালেন, তিনি মানতে কষ্ট পেয়েছিলেন, কিন্তু কী করা, পার্টির নির্দেশ, রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি হিসেবেই গণ্য করতে হবে। এই কথোপকথন আমি এক কাগজে লিখেছিলাম, আর সেটা পড়েই সুভাষদার সতর্কতা, আমার সঙ্গে কথা বলা বিপজ্জনক।

অবশ্য, পারিবারিক সূত্রে সুভাষদা আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করেন, দাদার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে, বাবা যখন কালিন্দীতে থাকেন, তখন সেখানে দাদার ফ্ল্যাটে। তার পরেও দেখা হয়, দেখা হলে উপদেশ দেন, কীভাবে মোটা হওয়া যায়। এককালে তিনিও নাকি আমার মতো রোগা ছিলেন। 'বেশি বেশি ভাত খাবে, আজ যা খেলে, কাল আর একটু বেশি খাবে, হঠাৎ তো খাওয়া বাড়ানো যায় না। না খেয়ে খেয়ে পাকস্থলীটা ছোট করে ফেলেছ, আস্তে আস্তে খেতে খেতে পাকস্থলী বড় করো।' এইরকমই এক সময়ে, মনে আছে, সুভাষদার একটা কথা, যেটা মনে গেঁথে আছে। বাড়ির কোনও এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে, বিয়ের দিন সুভাষদা আসেননি, এসেছেন পরের দিন দুপুর বেলা, যখন আমরা দুপুরে খাচ্ছি। বিয়েবাড়ির পরের দিন, বলা বাহুল্য, বৃহত্তর পরিবারের অনেকেই আছেন। সুভাষদা আসতে, সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সুভাষদাকে বসাতে ব্যস্ত। সুভাষদা এক নজরে সবাইকে দেখে বললেন, 'আমি আলোর পাশে বসি', বলে বাবার পাশে বসলেন। বাবা তখনও পুরো অন্ধ হয়ে যাননি, সূর্যের আলো থাকলে একটু একটু পড়তে পারেন। জানালা দিয়ে রোদ্দুরের এক ফালি এসে পড়েছিল বিয়েবাড়ির লম্বা টেবিলের এক কোনায়, যেখানে বাবা বসেছিলেন।

বাবা যখন কালিন্দীতে, তখন তাঁর 'বাংলা বানান' বইয়ের কয়েকটা সংস্করণ হয়েছে, অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যখন-তখন বাবার কাছে যান, বাংলা বানান নিয়ে নানান সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে। সুভাষদা একদিন গিয়েছেন, কিন্তু বাবা তখন চোখে একেবারেই দেখেন না। শুনলেন সুভাষ এসেছেন। সুভাষ তো অনেকেরই নাম, নাম শুনে বাবা কী করে বুঝবেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কবি সুভাষ বুঝে, সমাদর করে পাশে বসিয়ে, বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী উচ্চারণ করো? উদ্যোগ না উদ্‌যোগ'। ব্যাপারটা তখন বেশ চরমে। রেডিওতে, টেলিভিশনে, 'উদ্যোগ' শুনে শুনে বাবা ক্ষিপ্ত! যিনিই আসেন, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেন, উদ্যোগ, না উদ্‌যোগ? ভয়ে ভয়ে সুভাষদা বললেন, 'আমি তো উদ্যোগই বলি।' শুনে বাবা শোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন, উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'তুমিও, তুমিও।' বাড়ির নাতনির শ্বশুরমশাই সেদিন বাড়িতে এসেছেন, তিনি গ্রামে থাকেন, শিক্ষকতা করেন, জোতজমি আছে। তাঁকে ডেকে বাবা বললেন, 'তুমি কী উচ্চারণ করো?' তিনিও ক্ষীণকণ্ঠে জানালেন, 'আজ্ঞে, আমরা গাঁয়ের লোক, আমরা তো উদ্‌যোগ বলি।' এবার উত্তেজনা আনন্দের। 'দ্যাখো দ্যাখো, একটা চাষাও ঠিক উচ্চারণ করে, অথচ তোমরা কবিরা ভুল করো।' কুটুম্বকে চাষা বলায় ক্ষুব্ধ মা বেশ জোরেই পাশের ঘর থেকে বললেন, 'কারে কী কয়'।

গল্পের নির্মাণ প্রসঙ্গ

শেখর বসু

প্রতিদিনের জীবন থেকে উঠে এসেছে আমার গল্পগুলি। কখনও কোনও তুচ্ছ ঘটনা, কখনও কোনও তুচ্ছাতিতুচ্ছ কথা বা মন্তব্য, কখনও বা একটু আড়ালের কোনও ছবি থেকে গল্প পেয়েছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই পাওয়া আকস্মিক। গল্প বোধহয় এই ভাবেই ধরা দেয় সবার কাছে। তবে গল্প পাওয়ার পদ্ধতিগত এই মিল এক হলেও বিশেষ কোনও ঘটনা পাঁচজন লেখকের হাতে পাঁচরকম হয়ে ওঠে। আসলে গল্পবীজ মাথার মধ্যে জমা পড়ার পরে অঙ্কুরিত, পল্লবিত হয় বিশেষ ওই লেখকের মানসিক গঠনের সঙ্গে তাল রেখে। বিশেষ ওই লেখকের প্রবণতা, মনস্কতা, সাহিত্যশিক্ষা গল্পটির আকৃতি-প্রকৃতি ঠিক করে দেয়।

আধুনিক সাহিত্য শেষ পর্যন্ত নির্মাণ। লেখকের শিক্ষা, সংস্কার, সচেতনতা, রুচি, মানসিক গঠন সৃষ্টিকর্মের ওপর ছাপ ফেলবেই। দৈবনির্দেশ বা দৈবী মহিমা বা অলৌকিক ইন্দ্রজাল সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে আবিষ্কার করে থাকেন কেউ কেউ, কিন্তু চর্চানিরপেক্ষ ভাবে তার আশায় বসে থাকলে হতাশ হতে হয় অধিকাংশ সময়েই।

প্রমথ চৌধুরী আজ থেকে শতখানেক বছর আগে লিখেছিলেন—নানা মুনির নানা মত থাকাটা দুঃখের বিষয় নয়, নানা মুনির মতের ঐক্যটাই সাহিত্যসমাজে আসল দুঃখের কারণ।

নানা লেখক গল্প পান একই উপায়ে। আকস্মিকতায় ভর দিয়েই গল্পবীজ দেখা দেয়। কিন্তু এই মিলটি অত্যন্ত সাধারণ মিল। গল্পবীজ জারিত হয় ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায়। তার ফলে গল্প আর এক থাকে না। এটা বাঞ্ছিত। কিন্তু বাঞ্ছাপূরণ অনেক সময় হয় না। নানা লেখকের মতের ঐক্য তখন দুঃখের বিষয় হয়ে ওঠে।

ভালো লেখকের সংখ্যা প্রতি যুগেই খুব কম। সাহিত্যের ইতিহাস বলে, এই কমসংখ্যক ভালো লেখকদের প্রত্যেকেই স্রোতের বিরুদ্ধে পাড়ি দিয়েছিলেন। সাহিত্যে যা প্রচলিত ও স্বীকৃত, গোড়া থেকেই তার বিরুদ্ধে তাঁদের সংশয় দেখা গিয়েছিল। সাহিত্যে অমুকের মতো হওয়া, তমুকের মতো হওয়ার কোনও জায়গা নেই। যাঁরা জনস্রোতে মিশেছেন, তাঁদের কারও কারও তাৎক্ষণিক কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটলেও অতি দ্রুত তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন।

আমরা ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় 'শাস্ত্রবিরোধী ছোট গল্পের পত্রিকা এই দশক' বার করেছিলাম। পত্রিকাকে কেন্দ্র করে একটি গল্প-আন্দোলন চলেছিল বছর দশেক। শেষের দিকে পত্রিকা প্রকাশ স্বাভাবিক কারণে অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু আন্দোলন থামলেও সংশ্লিষ্ট লেখকদের লেখা থামেনি কখনও। থামেনি অনুসন্ধানের চেষ্টাও।

খাঁটি বাস্তবতার সন্ধানে বাংলা সাহিত্য একদা কম সময় নষ্ট করেনি। আমাদের সাহিত্যের পাঠকমাত্রই জানেন—কল্লোল, কালিকলমের লেখকরা কীভাবে দুর্গম স্থানে, নিষিদ্ধ পল্লি ও ফুটপাতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন বাস্তবসম্মত গল্পের খোঁজে। নতুন বাস্তবতার নতুন সংজ্ঞা তৈরি হয়েছিল। বলা হয়েছিল, পদ্ম বাস্তব নয়, তবে মৃণাল বাস্তব। বিরোধী পক্ষ তখন নয়া বাস্তববাদীদের চেপে ধরেছিলেন। মজা করে বলা হয়েছিল—যা যার নীচে থাকে, সেই তার বাস্তব। এই হিসেবে বাস্তবতা আছে পাঁকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। প্রমাণ জোলা।

জোলা, বালজাক, নুট হ্যামসুন প্রমুখ লেখক বাংলার নয়া বাস্তববাদীদের উসকে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন অত্যন্ত দামি একটা কথা বলে তরুণ লেখকদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বাস্তবতার খোঁজ করা অর্থহীন, কারণ প্রত্যেক লেখকেরই অনেকখানি অবাস্তব। কথাটি আজও প্রাসঙ্গিক। কিন্তু উচ্চকণ্ঠ ভিড়ের লেখকরা রবীন্দ্রনাথের কথায় খুব একটা কান দেননি সেদিন।

সাহিত্যে তারপর কত ঢেউ বয়ে গিয়েছে। ডাডা, পরাবাস্তবতা, জাদু-বাস্তবতা। উল্লেখযোগ্য পর্ব এবং পর্যায়ও এসেছিল বেশ কয়েকটি। তিন লাতিন আমেরিকান লেখক—মার্কেজ, ফুয়েন্তেস, লোসা গোটা পৃথিবীতে ম্যাজিক-রিয়েলিজম ছড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু ওই দেশেরই তরুণ লেখকেরা এখন সেই জাদু-বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে চাইছেন। এই দলে আছেন—ইলয় উরোজ, প্যাডিলা জর্জ ভল্‌পি প্রমুখ তরুণ তুর্কিরা। এঁরা বলছেন, জাদু-বাস্তবতায় দোষের কিছু নেই, তবে তার দিন ফুরিয়েছে। এঁরা দেশজ বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে উঠে মানসিকতার দিক থেকে বহুজাতিক হতে চান।

সাহিত্যধারা সম্পর্কে সামান্য কয়েকটি কথা এই কারণেই বললাম যে, সু-সাহিত্য পাঠের শিক্ষা আছে এমন একজন আধুনিক লেখক গল্পবীজ হাতে পেয়েই প্রাণের আবেগে লিখতে বসে যান না। বীজটি তাঁর শিক্ষা, অভিজ্ঞতায় জারিত হয়। তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে। তারপর তিনি গল্প লিখতে বসেন। তবে ভালো গল্প পূর্বনির্দিষ্ট পথ ধরে এগোতে এগোতে হঠাৎই অন্য পথে বাঁক নেয়। গল্পে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হলেই এটি সম্ভব।

শেখর বসুর

স্বনির্বাচিত দুটি গল্প

নির্জন পথে

কুকুরটার চোখে চোখ পড়তেই কেমন যেন চমকে উঠেছিল তুষার। অবিকল মানুষের চোখের মতো চোখ। দ্বিতীয়বার তাকাতেই মনে হল, কিছু যেন বলতে চায় ও। কিংবা এমনও হতে পারে— কিছু জিজ্ঞেস করলেই পরিষ্কার বাংলায় উত্তর দিয়ে দেবে।

মাথার মধ্যে উদ্ভট চিন্তাটা খেলে যেতেই বেশ মজা পেয়েছিল তুষার। কুকুরটাও বোধহয় ওদের মতো রাস্তা পেরোতে চায়। বাইপাস দিয়ে সাঁ-সাঁ করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল।

তুষারের ডানদিকে অপেক্ষারত আরও দু'জন পথচারী। বাঁদিকে ব্রাউন রঙের দেশি কুকুর। ট্রাফিক সিগন্যালে জ্বলজ্বলে সবুজ রঙের তির। লাল আলো না জ্বললে এ রাস্তা পেরনো অত্যন্ত বিপজ্জনক। এদিকে পথ-দুর্ঘটনার সংখ্যা ইদানীং বেশ বেড়ে গিয়েছে।

লাল, সবুজ আলোর জ্বলানেভা সব সময় বোধহয় এক নিয়মে হয় না। ব্যবধান কখনও বেশি, কখনও কম। এখন বোধহয় বেশির পালা। সবুজ আলো জ্বলছে তো জ্বলছেই।

দু'দিকে দুটো রাস্তা। একটা যাওয়ার আর একটা আসার। মধ্যিখানে কোথাও-কোথাও ডিভাইডার। জেব্রা-ক্রসিং দুটো রাস্তায় মোটামুটি সমান্তরাল রেখায়।

এদিকে লাল আলো জ্বলে উঠতেই ছুটন্ত গাড়িগুলো সাদা দাগের ওপাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পথচারীরা চঞ্চল হয়ে জোরে পা চালিয়ে এই রাস্তাটা পেরিয়ে ডিভাইডারবরাবর আধখানা ফুটপাতের ওপর উঠে পড়েছিল।

এদিকে লাল আলো জ্বললেও ওদিকে কিন্তু সবুজ আলো আগের মতোই। ওই রাস্তা ধরে গাড়িগুলো যেমন সাঁ-সাঁ করে ছুটছিল, তেমনি ভাবেই ছুটে চলেছে। আধখানা ফুটপাতের ওপর এদিকের পথচারীরা সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে। একটু এগিয়ে গেলেই বিপদ হতে পারে।

কয়েকটা মুহূর্ত এভাবে কাটাবার পরে সামনের রাস্তায় লাল আলো জ্বলে উঠল। গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে পড়েছে ওদিকের সাদা দাগের পেছনে। জেব্রা-ক্রসিং ধরে ওদিকের রাস্তা পেরোবার সময় তুষার লক্ষ করল ব্রাউন রঙের দেশি কুকুরটাও রাস্তা পেরোচ্ছে। বাহ্! একেই বলে বুঝি প্রকৃতির শিক্ষা! বাঁচার জন্য কোন পথে কখন কীভাবে চলতে হবে— প্রকৃতিই শিখিয়ে দেয়।

বাইপাস পেরিয়ে বেলেঘাটার রাস্তা ধরেছিল তুষার। মিনিট-পাঁচেক হাঁটলেই শিবরঞ্জনের বাড়ি। ওখানে ছোটখাটো একটা আড্ডা নিয়মিত বসে। শিবু তুষারের ছোটবেলার বন্ধু। সারাজীবন অধ্যাপনা করার পরে বছর-দুয়েক হল ও চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে। তবে ক্লাস-লেকচার দেওয়ার অভ্যাসটা ধরে রেখেছে এখনও। মাঝেমধ্যে সহ্যের সীমা ছাড়ালে বন্ধুরা চেঁচামেচি করে ওকে থামায়। তবে এটা সত্যি কথা, গোটা পৃথিবীর অনেক কিছুই জানে শিবরঞ্জন।

তুষার ঠিক করেছিল, ট্রাফিক দেখে কুকুরের রাস্তা পার হওয়ার গল্পটা আড্ডায় বেশ রসিয়ে শোনাবে; কিন্তু সুযোগ পেল না। গিয়ে দেখে আড্ডা জমে গিয়েছে। অহিংসা যে আজকের সমাজে কতখানি প্রয়োজনীয় সেটা বোঝাতে গিয়ে শিবরঞ্জন নিজেই কেমন যেন হিংস্র হয়ে উঠেছিল। তারপর প্রসঙ্গ নানা দিকে ঘুরতে ঘুরতে আড্ডা শেষ হয়েছিল একসময়।

চাকরি থেকে তুষারও মাস-দুয়েক হল অবসর নিয়েছে। তবে কনসালটেন্সি ওর পিছু ছাড়েনি। সপ্তাহে দু'-তিনটে দিন তাতে যায়। বাকি সময়টুকু একেবারে নিজের। ইচ্ছেমতো খরচ করা চলে।

ব্যাঙ্কওয়ালার প্রায়ই সুখী চেহারার বুড়ো-বুড়ির ছবি কাগজে ছেপে বড় বড় হরফে ক্যাপশন দেয়: জীবন শুরু হয় ষাট বছর বয়সে। কথাটা বোধহয় মিথ্যে নয়। সব বয়সেরই আলাদা একটা মাধুর্য আছে।

সেই মাধুর্য আজ সকাল থেকে একটু একটু করে উপভোগ করেছে তুষার। বিকেল হতেই বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। সল্টলেকের এদিকের পথঘাট বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। দু'দিকে ঝাঁকড়া গাছের সারি। জোর হাওয়া দিলে গাছগুলো মাথা নাড়ায়। ওই দৃশ্য দেখতে গেলে আকাশে চোখ চলে যায়।

বেলাশেষের মেঘে নানা ধরনের অদ্ভুত ছবি ফুটে ওঠে। ওই সব ছবির দিকে তাকিয়ে

থাকতে থাকতে হঠাৎই ব্রাউন রঙের কুকুরটার কথা মনে পড়ে গেল ওর। কাল তো ঠিক এই সময়, না-না একটু পরে, ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে রাস্তা পার হচ্ছিল কুকুরটা।

আজ আর শিবুর আড্ডায় যাবে না তুষার, সুতরাং উলটো দিকের পথ ধরে হাঁটছিল। কিন্তু হঠাৎ ওই কুকুরটার কথা মনে পড়ে যেতেই পথ পালটে কালকের রাস্তা ধরল।

বাইপাসের কাছে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধের অন্ধকার নেমে গিয়েছিল চারপাশে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। তবে আলো এখনও খোলতাই হয়নি। বাইপাসের দুটো রাস্তা ধরে কালকের মতোই গাড়ি ছুটছিল সাঁ-সাঁ করে। উজ্জ্বল হেডলাইটের আলো চোখে পড়লে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কালকের মতো আজকেও ট্রাফিক সিগন্যালের মাথায় সবুজ তির।

পায়ে পায়ে জেব্রা-ক্রসিংয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। কিন্তু যার জন্য এতটা পথ আসা— সেই কুকুরটাকে দেখতে পেল না কোথাও। নিজের খ্যাপামোতে নিজেই একটু মজা পেয়ে গিয়েছিল তুষার। রোজ রোজ কি একই সময়ে রাস্তা পার হবে কুকুরটা! তবে হ্যাঁ, ওর চোখ দুটো ঠিক মানুষের চোখের মতো। মনে হয়, দেখা হলে দিব্যি কথাবার্তা চালানো যেতে পারে ওর সঙ্গে।

সবুজ আলো নিভতেই লাল আলো জ্বলে উঠেছিল। তুষারের দু'পাশে জনাচারেক পথচারী, তারা দ্রুত পায়ে এদিকের রাস্তা পেরিয়ে ডিভাইডারের আধখানা ফুটপাতের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছিল। ওদিকের রাস্তায় আগের মতোই সবুজ আলো। একটু পরেই আলো লাল হয়েছিল। দু'দিক থেকেই কিছু লোক রাস্তা পার হল, কিন্তু তুষার যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই থেকে গেল।

আসলে যত দূর ওর আসার ইচ্ছে ছিল, তত দূর পর্যন্ত ও পৌঁছে গিয়েছে। এখন বেকার রাস্তা পেরিয়ে কী লাভ! দু'দিকেই সবুজ আলো জ্বলে উঠেছে আবার। আবার সেই দুরন্ত গতিতে গাড়ির ছোটাছুটি। সাঁ-সাঁ করে ছুটে-যাওয়া হেডলাইট আর টেললাইট দেখার মধ্যে এক ধরনের মজা আছে। সন্ধের অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হচ্ছিল। এবার ফিরতে হবে।

কিন্তু ফেরার মুখেই তুষার দেখল ব্রাউন রঙের সেই কুকুরটা কখন যেন ওর গা ঘেঁষে

> 'কিছুদিন আগে একটা বিলিতি জার্নালে পড়ছিলাম— কুকুররা এখন টেলিফোনও ধরতে পারে—।' 'তাই! ওদের কেউ কেউ তা হলে মানুষের মতো কথাও বলতে পারে!'

দাঁড়িয়েছে। ঘুরে তাকাতেই কুকুরটার সঙ্গে চোখাচোখি হল। অবিকল মানুষের চোখের মতো চোখ। চোখের উজ্জ্বল তারায় একটু বুঝি সম্ভাষণও ছিল। তুষার বলল, 'কী রে, রাস্তা পেরোবি?' জবাবে ব্রাউন রঙের কুকুরটা লেজ নাড়াল।

তুষারের দু'দিকে দু'-একজন করে পথচারী জমতে শুরু করেছিল আবার। এদিকে লাল আলো জ্বলতেই তুষার চাপা গলায় 'চল' বলে রাস্তা পেরিয়ে ডিভাইডারের আধখানা ফুটপাতের ওপরে দাঁড়াল। ওর গা ঘেঁষে ব্রাউন রঙের কুকুরটা। ও-দিকের রাস্তার মাথায় সবুজ আলো। বিরতিহীন গাড়ির ছুট।

তুষার একটু বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কুকুরটার ধাক্কায় নজর করল সামনের রাস্তায় লাল আলো জ্বলে উঠেছে। পাশের লোকজন কয়েক মুহূর্ত আগেই নেমে পড়েছিল পথে। তুষার আর কুকুরটা পাশাপাশি। রাস্তা পেরিয়ে ও-দিকের বাস শেডের কাছাকাছি জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। এলাকাটা একটু ফাঁকাই। মৃদু গলায় তুষার বলল, 'তুই কি বরাবরই ট্রাফিক সিগন্যাল দেখে রাস্তা পেরোস?'

উত্তরে লেজ নাড়াল কুকুরটা।

'রোজ কি এই সময়েই আসিস এখানে?'

কুকুরটা ওর খাড়া কান দুটো মাথার দু'পাশে শুইয়ে দিয়ে মাথা নেড়েছিল।

চমৎকৃত হল তুষার। একটু হেসে বলল, 'এদিকে এই সময় প্রায়ই আসি আমি। এলে তোর সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে আবার।'

জবাবে কুকুরের আশ্চর্য চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। আর একবার লেজ নেড়ে ওদিকের ঢালু মাঠে নেমে গিয়েছিল ওটা।

এই জায়গাটা আলো-আঁধারিতে মোড়া। ধারেকাছে আর কেউ নেই। আকাশে ছোট ছোট তারা ফুটে উঠেছে। বাতাসে মৃদু ঠান্ডার আমেজ। তুষারের হঠাৎ মনে হল, পৃথিবীতে আজও কিছু অলৌকিক ঘটনা ঘটে থাকে।

এবার কী করবে ও? এতটা পথ যখন চলেই এসেছে শিবুর বাড়িতে একটা ঢুঁ মারা যাক!

নির্জন বাইপাস থেকে নেমে বেলেঘাটায় নামতেই মায়াময় আচ্ছন্নতায় ফাটল ধরল। এদিকে সন্ধের দিকে ছোটখাটো একটা বাজার বসে। সবজিওয়ালা, মাছওয়ালারা তারস্বরে খদ্দের ডাকছিল। তাদের ডাকে যেসব খদ্দের সাড়া দিয়েছিল তাদের গলার স্বরও বেশ চড়া পর্দায়। প্রাইভেট বাস আর অটোও সংগতে নেমেছিল। যত এগোচ্ছিল তত লোকের ভিড়। এই পরিবেশে আর যাই হোক, অলৌকিক কোনও ঘটনা ঘটবে না। কিন্তু নির্জন, নিরিবিলি পথে ঘটতে বাধা কোথায়!

নড়বড়ে একটা মনোভাব নিয়ে শিবুর বাড়িতে ঢুকতেই ও আপ্যায়নের গলায় বলল, 'আয় আয়, এদিকে কোথাও এসেছিলি বুঝি?'

'হ্যাঁ, বাইপাসের কাছে ছোটখাটো একটা কাজে এসেছিলাম। তা ভাবলাম, এতটা যখন এসেই পড়েছি— তোর সঙ্গে খানিকটা গল্প করে যাই।'

উঁচু গলায় হেসে উঠে শিবরঞ্জন বলল, 'খুব ভালো করেছিস। যত আড্ডা মারবি তত রিফ্রেশড হবি।'

কাজের মেয়েটা ঘরে একবার উঁকি মারতেই শিবু বলল, 'টুনি, একটু চা খাওয়াবি আমাদের?'

'দিচ্ছি' বলেই রান্নাঘরের দিকে ছুট লাগিয়েছিল টুনি।

তুষার হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তুই কখনও কুকুর পুষেছিস শিবু?'

'কুকুর! না-না, ও লাইনে কখনও যাইনি। তবে আমার ছোটমামা কুকুরের খুব ভক্ত ছিল। ওর বাড়িতে তিন-চারটে পেডিগ্রিড ডগ ছিল। ওদের বংশমর্যাদার কথা মামা খুব গর্ব করে শোনাত আমাকে। একটা কুকুরের বাবা ছিল ইংরেজ, মা জার্মান, ঠাকুরদা অস্ট্রিয়ান আর ঠাকুমা আমেরিকান। সে অনেক ইতিহাস।

কুকুরদের বিষয়ে অনেক কিছু জানত ছোটমামা। ওর কাছে গেলে প্রতিদিনই কুকুরদের সম্পর্কে নতুন কিছু তথ্য জানা যেত। ওর বইয়ের আলমারির দুটো তাক ছিল কুকুরদের নিয়ে লেখা বইপত্তরে ঠাসা। তা, তুই হঠাৎ কুকুরদের নিয়ে ইন্টারেস্টেড হলি! পুষবি নাকি?'

প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে না গিয়ে তুষার বলল, 'কাল আর আজ বাইপাস পেরোবার সময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলাম—।'

'কী?'

'একটা কুকুর ট্রাফিক সিগন্যালের লাল-সবুজ আলো দেখে রাস্তা পার হচ্ছে।'

তুষারের বিস্ময়কে পাত্তা না দিয়ে শিবু হেসে উঠে বলল, 'এতে অবাক হওয়ার কী আছে? কুকুররা তো যথেষ্ট বুদ্ধি ধরে। প্রতিবন্ধী, অন্ধদের গাইড-ডগ হিসেবে চলার জন্য, কুকুরদের আলাদাভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়। একটা ট্রেন্ড ডগ ওদের যে সার্ভিস দেয়, মানুষও বোধহয় অতখানি নিখুঁত হতে পারে না সব সময়। ওই যে বলে না— ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়—ওটা কুকুরদের খুব প্রবল।'

একটু বুঝি আপত্তির গলায় তুষার বলল, 'তুই তো ট্রেন্ড-ডগের কথা বলছিস, কিন্তু এটা তো রাস্তার কুকুর—।'

তর্কের গন্ধ পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছিল প্রাক্তন অধ্যাপক শিবরঞ্জন। 'স্পেশালাইজড ট্রেনিং কারা নিতে পারে? যারা খুব বুদ্ধিমান তারাই তো! অসম্ভব বুদ্ধি না ধরলে ট্রেনিং একজনকে কদ্দুর আর নিয়ে যেতে পারে? ট্রেন্ড কুকুররা আলো জ্বালাতে-নেভাতে পারে, পুশ এলিভেটরের বোতাম টিপে যাতায়াত করতে পারে, লন্ড্রিতে জামাকাপড় দিয়ে-আসা নিয়ে-আসা করতে পারে। অন্ধদের গাইড-ডগ হিসেবে কুকুররা তো দারুণ নাম করেছে, পাহাড়ে-পর্বতে কেউ হারিয়ে গেলে তাকে খুঁজে আনার কাজটাও সারতে পারে চমৎকার। কিছুদিন আগে একটা বিলিতি জার্নালে পড়ছিলাম— কুকুররা এখন টেলিফোনও ধরতে পারে—।'

'তাই! ওদের কেউ কেউ তা হলে মানুষের মতো কথাও বলতে পারে!'

'তা কেন? টেলিফোনের বোতাম টিপে ঘেউ ঘেউ করে। টেলিফোনের ওপারে যে আছে সে-ও নিশ্চয়ই ওইসব ডাকের অর্থ শিখে নিয়েছে। এক-এক ডাকের এক-এক রকম অর্থ। কোনও ডাকের অর্থ কর্তা এখন বাথরুমে, কোনও ডাকের অর্থ গিন্নি এখন রান্নাঘরে— এইরকম কিছু একটা হবে নিশ্চয়।'

> মানুষের মনের কোনও তল খুঁজে পাওয়া যায় না। অতি তুচ্ছ ঘটনাতে কখনও সে চমকে ওঠে ভীষণভাবে, আবার কখনও চূড়ান্ত অস্বাভাবিক ঘটনাকে সহজভাবে মেনে নেয়।

'কুকুর কি মানুষের ভাষা বোঝে?'

'নিশ্চয়ই বোঝে।'

'মানুষ কি ওদের ভাষা বুঝতে পারে?'

'অবশ্যই পারে। না হলে কমিউনিকেশন কী ভাবে হবে। ট্রেনিংয়ের বাইরে গিয়েও মাথা খাটাতে পারে কুকুর। যাকে বলে সহজাত বুদ্ধি, সেটা তো ওদের যথেষ্ট পরিমাণে আছে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে তুষার একটা অদ্ভুত কথা বলল, 'আচ্ছা, এই যে পঞ্চতন্ত্রের গল্প, ফেবলসের গল্প— এর মধ্যে কি কোনও সত্যি আছে?'

'মানে?'

'না, বলছিলাম কী— ওই সব গল্পে তো মানুষ আর জন্তুজানোয়ারের মধ্যে মানুষের ভাষায় কথা হত। এর মধ্যে কি কোনও সত্যি ছিল! কী মনে হয় তোর?'

একটু উঁচু গলায় হেসে উঠে শিবু বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'হান্ড্রেড পার সেন্ট সত্যি। শোন, এ-ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা থিয়োরি আছে। আদিম মানুষের বন্ধু ছিল কুকুর। পাহাড়ের গুহায় ওই ধরনের কিছু ছবিটবি পাওয়া গিয়েছে। আদিম মানুষ তো গোড়ার দিকে সাইন ল্যাঙ্গোয়েজে কথা বলত, সেই ইঙ্গিতের ভাষা পোষা কুকুররা আলবত ধরতে পারত। তারপর মানুষ যখন একটু-একটু করে মুখের ভাষা শিখতে শুরু করেছিল, তখন পোষা কুকুররাও সেগুলো নিশ্চয়ই শিখে নিয়েছিল। গোড়ার দিকে ভাষা বলতে ছিল অল্প কয়েকটা শব্দ। হয়তো কিছু কিছু শব্দ কুকুরদের ডাক শুনেই মানুষ বানিয়েছিল। সভ্যতার একেবারে গোড়ার দিকে নির্ঘাত কুকুরের সঙ্গে মুখের ভাষায় সবরকম কথাবার্তা বলত মানুষ। পঞ্চতন্ত্র বল, ফেবল বল, রূপকথা বল— এ সবের মধ্যে নির্ঘাত তার ছাপ পড়েছে।'

একটা ট্রে-তে করে চা আর কুচো নিমকি নিয়ে এসেছিল টুনি। চা খেতে খেতে গল্প এবার অন্যদিকে গড়িয়েছিল। শিবুর গল্পের স্টক বিরাট, আর যখন-তখন সে গল্প-ও জমিয়েও দিতে পারে।

গল্প তরতর করে আরও কিছুক্ষণ গড়াবার পরে উঠে পড়েছিল তুষার। ফিরতে হবে এবার।

বাড়ির সামনে গলি। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় পা দিতেই তুষারের চোখের সামনে ওই কুকুরের মুখটা ভেসে উঠেছিল আর পাঁচটা কুকুরের মতো মুখ, কিন্তু চোখ দুটো ঠিক যেন মানুষের। এখন কি ওকে বাইপাসের কাছে দেখা যেতে পারে।

বড় রাস্তার ভিড় পড়তির দিকে। বাইপাসের দিকে যত এগোচ্ছিল লোকজনের সংখ্যা তত কমছিল। ফুটপাতে চট-বিছিয়ে-বসা বাজারটাও উঠে গিয়েছে প্রায়।

একটু জোরেই পা চালাচ্ছিল তুষার। দমকা হাওয়ায় ঠান্ডা ভাব। ধারেকাছে কোথাও হয়তো বৃষ্টি নেমেছে। আকাশের দিকে তাকাল ও। সন্ধের সেই ছোট ছোট তারাগুলোর একটাও নেই। আকাশে লালচে মেঘ।

বাইপাসের জেব্রা-ক্রসিংয়ের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল তুষার। এদিকটা একদম ফাঁকা। কিন্তু বাইপাসে গাড়ির সংখ্যা একটুও কমেনি। গতি বোধহয় সন্ধের চাইতেও জোরালো।

এইমাত্র এদিকের সবুজ আলোটা জ্বলতেই সাদা দাগের ওদিকে থমকে-থাকা গাড়িগুলো ছুটতে শুরু করেছিল। ওদিকের রাস্তায় লাল আলো। তুষার হঠাৎ অবাক হয়ে লক্ষ করল— তিনটে ছোট বাচ্চা নিয়ে একটা বউ ওপাশের রাস্তা পেরোচ্ছে। বাচ্চাদের পাশে ব্রাউন রঙের সেই কুকুরটা।

ওকে দেখেই শরীরে কেমন যেন একটা উত্তেজনা খেলে গিয়েছিল তুষারের। এদিকে সবুজ সংকেত না থাকলে ও নির্ঘাত ছুটে গিয়ে ওর সঙ্গ ধরত। রাস্তা পেরিয়ে ওরা বাঁদিকের রাস্তা ধরে চোখের আড়ালে চলে

গেল।

রাস্তা পেরোতে তুষারের আরও এক-দেড় মিনিট লেগে গিয়েছিল। সল্টলেকের বাঁকটা ঘুরতেই তুষার দেখতে পেল, দূরে দাঁড়ানো একটা অটোরিকশায় তিনটে বাচ্চা নিয়ে বউটা উঠছে। পাশে দাঁড়িয়ে ব্রাউন রঙের সেই কুকুরটা। লম্বা পায়ে ওদিকে আরও কিছুটা যাওয়ার পরে অটোটা ছেড়ে দিয়েছিল। রাস্তা একদম শুনশান, ওই কুকুরটা ছাড়া আর কেউ কোথাও ছিল না।

জোর পায়ে কুকুরটার কাছে এসে তুষার বলল, 'তুই এখনও এখানে!'

জবাবে লেজ নেড়েছিল কুকুরটা।

মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল তুষারের। 'ভালোই হয়েছে। চল আমার সঙ্গে একটু হাঁটবি। আমার বাড়ি এখান থেকে মিনিট-পনেরোর পথ। এই পথটা হাঁটতে খুব ভালো লাগে আমার। চল।'

নির্জন পথের এক ধার দিয়ে হাঁটছিল তুষার। ওর পাশে ব্রাউন রঙের চতুষ্পদ সঙ্গী। তুষার বলল, 'তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে জানলে তোর জন্য কিছু বিস্কুট কিনে নিয়ে আসতাম। যাক, পরে আবার দেখা তো হবেই— তখন দেওয়া যাবে।'

তুষার ভেবেছিল, কথা শুনে লেজ নাড়বে কুকুরটা। কিন্তু ও নাড়ল না। শুধু তাই নয়, ওর মুখটাও কেমন যেন গম্ভীর-গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তুষারের মনে হল, কথাটা বোধহয় এভাবে বলা ঠিক হয়নি ওর। কুকুরটা অন্য প্রকৃতির। আর পাঁচটা কুকুরের সঙ্গে ওকে মেলানো যায় না।

দমকা হাওয়ায় ঠান্ডার মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি বোধহয় ধারেকাছে এগিয়ে এসেছে। একটু বাদে হয়তো এখানেও নামবে। সল্টলেক এমনিতে ভারি সুন্দর জায়গা। পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গোছানো শহর। চওড়া রাস্তা, পথের ধারে গাছের সারি। কিন্তু পথচারীদের প্রতি অকরুণ। আচমকা বৃষ্টি নামলে ভিজতে হয়, মাথা বাঁচাবার জায়গা নেই কোথাও। হাতে ছাতা নেই তুষারের। যাক, একটু না হয় ভেজাই যাবে।

সঙ্গী ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল। রাস্তায় এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় কোনও লোক দেখা যায়নি। গাছের ডালপালায় হাওয়া বোধহয় জট পাকিয়ে গিয়েছিল বেয়াড়াভাবে। গাছের মাথাগুলো দুলে যাচ্ছিল সমানে। তুষার বলল, 'ঝেঁপে বৃষ্টি আসছে। আমি তো বাড়ির কাছাকাছি এসে গিয়েছি। তুই থাকিস কোথায়?'

> চা খাওয়া আর খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কিছু কথাবার্তা চালাচালি হয় ওদের মধ্যে। আজ হঠাৎই খুব সতর্ক হয়ে উঠেছিল তুষার। কাগজ পড়ার নামে মুখ ঢেকে ফেলেছিল প্রায়।

কথা শুনে কুকুরটা ওর দিকে তাকাল একবার। মুখচোখে একটু বুঝি মজার হাসি। কিন্তু ওই হাসিটুকু দেখেই সন্তুষ্ট হতে পারল না তুষার। একই প্রশ্ন আবার করল, এবার আরও সরাসরি। 'কোথায়? সল্টলেকে না বেলেঘাটায়?'

মানুষের মনের কোনও তল খুঁজে পাওয়া যায় না। অতি তুচ্ছ ঘটনাতে কখনও সে চমকে ওঠে ভীষণভাবে, আবার কখনও চূড়ান্ত অস্বাভাবিক ঘটনাকে সহজভাবে মেনে নেয়। এখন যেমন। তুষারের প্রশ্নের উত্তরে মানুষের ভাষায় উত্তর দিল কুকুরটা। 'বেলেঘাটায়।'

উত্তর শুনে তুষারের বুকের মধ্যে বিন্দুমাত্র কাঁপুনি উঠল না। কণ্ঠস্বরে একটু ব্যাকুলতা ফুটিয়ে ও বলল, 'তোমাকে তা হলে ফিরতে হবে অনেকটাই। জোর বৃষ্টি আসছে। বাড়ি ফিরে যাও এবার।'

কুকুরের চোখে রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠেছিল। একটু চাপা গলায় বলল, 'এখনই তো আমার আসল কাজ শুরু হবে।'

'আসল কাজ! কী সেটা?'

'বাইপাসের ট্রাফিক সিগনালের লাল-সবুজ আলো একটু বাদেই নিভে যাবে। তার বদলে একটা হলদেটে আলো জ্বলবে। তার মানে চার রাস্তার চারদিক থেকে যে-কোনও গাড়ি যে-কোনও দিকে ছুটতে পারে। রাতের দিকে গাড়ির গতি আরও বাড়ে। বেশ কিছু রেকলেস ড্রাইভিংও হয়। ওই সময় পথচারীদের রাস্তা পেরোবার ব্যাপারে আমি সাহায্য করে থাকি।'

'বাহ! কিন্তু যতদূর মনে পড়ছে ওই সময় তো একজন ট্রাফিক পুলিশ থাকে।'

'থাকে, তবে তা না থাকারই মতো। গাড়িগুলো নিজেদের খেয়ালখুশি মতো ছোটে। পথচারীদেরও দোষ থাকে কখনও কখনও। রাস্তা পেরোতে তো মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড লাগে। কিন্তু ওই সামান্য সময়টুকু বাঁচাবার জন্যে কিছু লোক এমন ছোটাছুটি শুরু করে যে দুর্ঘটনা ঘটে যায়। সন্ধে থেকেই আমি অনেককে বাইপাস পেরোতে সাহায্য করে থাকি।'

কিছুক্ষণ আগে দেখা দৃশ্যটা তুষারের চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। 'ওহ! ওই যে একটু আগে একটা বউ তিনটে বাচ্চা নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল— তুমি কি ওদের পার হতে সাহায্য করেছিলে?'

বিনীতভাবে উত্তর দিল কুকুরটা, 'এই রাস্তাটাও রাতের দিকে ভালো নয়, আমি ওদের একেবারে অটো পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি।'

মহান এই চতুষ্পদ প্রাণীটির প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নিচু হয়ে গিয়েছিল তুষারের। একটু ধরা গলায় বলল, 'বাড়ি ফিরতে ফিরতে তা হলে তো তোমার অনেক রাত!'

'রাত একটু বাড়লে ওই হাসপাতালের কাছে চলে আসি।'

'হাসপাতালের কাছে। কেন?'

'দু'-দল চ্যাংড়া কুকুর ওখানে এসে ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি করে, ওদের থামাতে হয়—।' তুষার হেসে ফেলেছিল 'কেন?'

ওর হাসি দেখে একটু বুঝি গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল কুকুরটা। গম্ভীর গলায় বলল, 'হাসপাতালের নীচেই ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড। ওপরে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট। নিশুতি রাতে কুকুরের ওই বেড়ধক চিৎকার-চেঁচামেচিতে ওই সব রুগিরা নির্ঘাত খুব কষ্ট পায়। ওখানে ওদের ঝগড়া থামানো তাই আমার কাজের মধ্যে পড়ে। রাগ করে ওদের বলি— খুব যদি ঝগড়াঝাঁটি, মারামারি করতে ইচ্ছে করে, এখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে গিয়ে কর।'

আচমকা হেসে ফেলার জন্য লজ্জা পেয়েছিল তুষার। একটু বাধো-বাধো গলায় বলল, 'বাড়ি ফিরতে ফিরতে তা হলে তো ভোর!'

শুকনো হাসি হাসল কুকুরটা। 'আমার আর এখন পাড়ায় ফেরার উপায় নেই। পাড়ার কুকুররা আমাকে পাড়াছাড়া করেছে।'

'সে কী! কেন?'

প্রশ্নের উত্তর দিল না কুকুরটা। থেমে গিয়ে বলল, 'আপনি বোধহয় আপনার বাড়ির কাছাকাছি এসে গিয়েছেন। চলি এবার।' বলার পরেই ও উলটো দিকের পথে ছুট লাগিয়েছিল।

।। দুই ।।

সকাল সাতটা নাগাদ ঘুম ভেঙে যায় তুষারের। ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছাড়ে না ও। শুয়ে শুয়ে চা খায়, দুটো খবরের কাগজ পড়ে। ঘণ্টাদেড়েকের এই আলসেমিটা ওর কাছে খুব উপভোগ্য।

আজ ঘুম ভাঙতেই মনে হল— কাল রাতে ও একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে। একটা কুকুর পরিষ্কার মানুষের ভাষায় কথা বলেছে ওর সঙ্গে। ওর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।

উঠে বসল তুষার। স্বপ্ন না সত্যি? সত্যিই তো। কাল রাতে বাড়ি ফেরার সময় অনেক গল্প হয়েছে কুকুরটার সঙ্গে।

জানলা দিয়ে একফালি ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছিল ঘরের মেঝেয়, বিছানায়। তুষার মাথায় চুলের মধ্যে আঙুল চালাল, এক হাত দিয়ে আর এক হাত ধরল, জোরে জোরে নিশ্বাস টানল, ছাড়ল। না, শরীরের কোথাও বিন্দুমাত্র অস্বস্তি নেই। তা হলে এই ধরনের একটা বিদঘুটে ব্যাপারকে ও সত্যি বলে ভাবছে কেন?

একটা ট্রে-তে দু'কাপ চা আর বগলে দুটো খবরের কাগজ নিয়ে রিনি এল। এটা প্রতিদিনের দৃশ্য। চা খাওয়া আর খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কিছু কথাবার্তা চালাচালি হয় ওদের মধ্যে। আজ হঠাৎই খুব সতর্ক হয়ে উঠেছিল তুষার। কাগজ পড়ার নামে মুখ ঢেকে ফেলেছিল প্রায়। কিছুতেই যেন কাল সন্ধের আজগুবি ওই গল্পটা ওর মুখ থেকে বেরিয়ে না আসে এখন।

সারাদিনই কম-বেশি সতর্ক ছিল তুষার, কিন্তু বিকেল হতেই টের পেল, বেলেঘাটা কানেক্টরের ওই বাইপাস ওকে কেমন যেন টানছে। সূর্য ডোবার একটু আগেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল ও।

সন্ধের মুখে সল্টলেকের ওই রাস্তায় হাঁটতে বেশ লাগে। দু'পাশের গাছগুলোর মাথা নাড়ানোর দৃশ্য চমৎকার। পাখিরা ঝাঁক বেঁধে ফিরে আসে গাছে। নতুন

'তোমার হিট-লিস্টের চতুর্থ জন কে?' উত্তর এল বেশ স্পষ্ট গলায়। 'কালু। ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত—। আপনি বোধহয় বাড়ির কাছাকাছি এসে গিয়েছেন।'

ধরনের কিছু পাখিও দেখা যায় মাঝেমধ্যে। কিন্তু আজ পথের কোনও দৃশ্যের দিকে চোখ ছিল না তুষারের।

বেশ জোরে পা চালিয়েছিল ও। দিনের আলো এখনও ফুরোয়নি। বাইপাসের ক্রসিংয়ের মুখে পথচারীরা সংখ্যা কালকের তুলনায় একটু বেশি বোধহয়। কিন্তু যার জন্য এখানে আসা— সে কোথায়? রাস্তার এদিক ওদিক কোথাও ব্রাউন রঙের সেই কুকুরটাকে দেখা গেল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পরে রাস্তা পেরোল তুষার। ওদিকের ওই ছোট্ট ঢালু মাঠ ধরে কাল নীচের দিকে নেমে গিয়েছিল কুকুরটা। না, ওদিকেও কেউ নেই। আচ্ছা, কালকের মতো কাউকে অটোয় তুলে দিতে যায়নি তো?

রাস্তা পেরিয়ে আবার আগের জায়গায় এল তুষার। তারপর বাঁদিকের রাস্তা ধরে খানিকটা হাঁটল। ওদিকে গোটাতিনেক অটো, অল্পস্বল্প যাত্রীও দাঁড়িয়ে আছে; কিন্তু ব্রাউন রঙের কিচ্ছু নেই কোথাও।

আবার রাস্তা পেরোল তুষার। বাসস্টপের কাছে দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ। চারদিকে ওর চোখ ঘুরছিল সমানে। কিন্তু যার খোঁজে আসা, তার আর দেখা মিলল না।

আস্তে আস্তে দিনের সব আলো ফুরিয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার নামছে আকাশ থেকে। ধীরে ধীরে সেই অন্ধকারও গাঢ় হয়ে এল। একটা-দুটো করে বেশ কিছু তারা ফুটে যাওয়ার পরে শিবুর বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল তুষার।

শিবু ওকে দেখেই হইহই করে উঠে বলল, 'তুই এসেছিস, বেঁচে গেলাম। একটা জায়গায় যাওয়ার কথা, কিন্তু কিছুতেই যেতে ইচ্ছে করছিল না—। এখন আর ইচ্ছে-অনিচ্ছের প্রশ্ন উঠছে না, বাড়িতে অতিথিকে ফেলে রেখে কোথাও যাওয়া যায় না।'

বেতের চেয়ারে গুছিয়ে বসতে বসতে তুষার বলল, 'তোর ওই থিয়োরিটা আমি কিন্তু মানি।'

'কোনটা?'

'ওই যে আদিম যুগে মানুষ আর কুকুর মানুষের ভাষাতেই কথা বলত।'

শিবুর ঠোঁটের কোণে একচিলতে মজার হাসি ফুটে উঠেছিল। 'কোথাও কোনও প্রমাণ পেলি নাকি?'

'পেয়েছি।'

'কীরকম?'

'কাল রাতে এখান থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটা কুকুরের সঙ্গে আমার কথাবার্তা হয়েছে। আমার প্রতিটি কথার উত্তর ও পরিষ্কার বাংলা ভাষায় দিয়েছিল।'

শুনে গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিল শিবরঞ্জন। হাসার পরে বাড়ির ভিতর দিকে তাকিয়ে গলা তুলে বলেছিল, 'টুনি, চা বানা দু'কাপ। মুড়ি-চানাচুরও দিবি।' তুষার গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি কিন্তু মজা করার জন্যে বলিনি, ঘটনাটা সত্যি।'

শিবুর চোখেমুখে হাসি ছড়িয়ে ছিল এখনও। 'আমি কি তোকে বলেছি তুই মজা করার জন্য বলেছিস। শোনার মতো কান থাকলে কুকুরের কথা ঠিক শোনা যায়। বুঝতে পারছি তুই কুকুর পোষার ব্যাপারটা নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবছিস। ভালো ভালো। কুকুর শুধু যে ভালো সঙ্গী— তাই নয়, রোগ সারাতেও সাহায্য করে থাকে।'

অবাক হল তুষার! 'রোগ সারায়। কীভাবে?'

বহু বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী শিবরঞ্জন নিজের চেয়ারে গুছিয়ে বসার পরে বলল, 'কালকেই একটা স্টাডি-রিপোর্টে দেখছিলাম— একটা মেডিক্যাল টিম দুটো দলের ওপর পরীক্ষা চালিয়েছে। একদল কুকুর পোষে, আর একদল পোষে না। পরীক্ষার ফল চমকে যাওয়ার মতো। যারা কুকুর পোষে তাদের শরীর-স্বাস্থ্য— যারা পোষে না তাদের চাইতে অনেক ভালো।'

শুনে অবাক হয়েছিল তুষার। 'কারণ কিছু জানায়নি?'

'জানিয়েছে। পোষা কুকুর হাসিখুশি

রাখে প্রভুকে। নিঃসঙ্গতা, হতাশা কাছে ঘেঁষতে দেয় না। কুকুরের সঙ্গ পাওয়ার ফলে ডগ-ওনারের ব্লাডপ্রেশার, কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল কমে যায়। হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমে। তার ফলে ডাক্তার, ওষুধপত্তরের খরচা কমে যায় অনেকখানি। কী ধরনের কুকুর পুষবি বলে ঠিক করেছিস তুই? আমি বলি কী, পেডিগ্রিডের দিকে যাস না। দো-আঁশলাই ভালো। দেশি-বিদেশি দুটো ঘরানাই একসঙ্গে পাবি।'

প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে একটু হেসেছিল তুষার।

শিবরঞ্জনের কথার কখনও অভাব হয় না। সামনে একজনমাত্র শ্রোতা থাকলেই হল— বহুক্ষণ ও কথা চালিয়ে যেতে পারে একটানা।

শিবু বকবক করে যাচ্ছিল সমানে। তুষার হুঁ-হ্যাঁ করছিল, কিন্তু মাঝেমধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। শরীরের মধ্যে বিচিত্র এক অস্থিরতা। চা-মুড়ি খাওয়ার আধঘণ্টা পরে হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, 'আজ চলি রে। একটা কাজ সারতে হবে।'

গলি থেকে বেরিয়ে বাঁদিকের বদলে ডানদিকে ঘুরে গিয়েছিল তুষার। জোরে হাঁটলে বোধহয় অস্থিরতা কমে। উদ্দেশ্যহীনভাবে বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পরে ফেরার পথ ধরেছিল। বাইপাসের কাছাকাছি আসার পরে বুঝতে পারল যে, রাত ইতিমধ্যে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।

জেব্রা-ক্রসিংয়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল তুষার। বাইপাসের দুটো রাস্তা দিয়েই গাড়ি ছুটছে ঝড়ের গতিতে। রাস্তা পেরোবার কোনও লোক নেই। চারদিকে চোখ ঘুরছিল ওর। না, কোথাও নেই সেই কুকুরটা!

এক জায়গায় চুপ করে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল তুষার। ইতিমধ্যে ট্রাফিক সিগন্যালের লাল সবুজ আলো বেশ কয়েকবার জ্বলেছে, নিভেছে। ধারেকাছে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

কাঁহাতক আর অপেক্ষা করা যায়। সল্টলেকের রাস্তায় ঢুকে পড়েছিল ও। সোজা রাস্তা, বাঁদিকে ঘুরতেই দেখতে পেল কুকুরটাকে। এদিকেই আসছিল। তুষার উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, 'তোমার জন্য অপেক্ষা করছি কখন থেকে! কোথায় গিয়েছিলে?'

কথার কোনও উত্তর না দিয়ে কুকুরটা সামনে এসে লেজ নাড়াতে লাগল।

তুষার আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থমকে গেল। কুকুরের একটা কান ভাঙা, শুকনো রক্তের একটা মোটা দাগ কান থেকে চোখ পর্যন্ত নেমে এসেছে। আঁতকে উঠে ও বলল, 'কী হয়েছে তোমার! মারামারি করেছিলে?'

বিচিত্র একটা হাসি ফুটে উঠেছিল কুকুরটার মুখে। 'অনেক দিন পরে আজ আমাদের পাড়ায় ফিরেছিলাম। কিন্তু ওরা আমাকে আর ওখানে থাকতে দেবে না। মেরেধরে তাড়াল। আর একটু হলে মেরেই ফেলত!'

গভীর সহানুভূতির ছাপ ফুটে উঠেছিল তুষারের চোখেমুখে। 'কিন্তু ওই পাড়াটা তো তোমারই পাড়া।'

'হ্যাঁ, ওখানেই আমার জন্ম আমার আত্মীয়বন্ধুরা সব ওখানেই থাকে।'

'তারা তোমার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করল!'

'করতে হয়তো বাধ্য হয়েছে।'

'বাধ্য! কেন?'

'বাইরের কিছু গুন্ডা-কুকুর এসে ওই পাড়াটার দখল নিয়েছে। ওদের পাণ্ডা হল কালু, কালো রঙের তাগড়া চেহারার একটা কুকুর। কালুর তড়পানিটা এখনও কানে ভাসছে। বলছিল— ফের যদি এ মহল্লায় ঢুকিস, তোকে আর জান নিয়ে ফিরতে হবে না লালু।'

'লালু কে?'

'আমার নাম। আমার গায়ের রং একটু লালচের দিকে বলে ওই পাড়ার লোকরাই নামটা রেখেছিল।'

রাস্তায় একজনও লোক নেই। এদিকের স্ট্রিট লাইটটা জ্বলছে না। বেশ একটা আলো-আঁধারি চারপাশে। লালু বলল, 'আপনার কিন্তু বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাচ্ছে। চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিই। যেতে যেতে কথা হবে।'

দু'পা এগোবার পরেই তুষার জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ওপর ওই কালুর এত রাগ কেন?'

'রাগের একটাই কারণ, আমি ওখানে কায়েম হলে ওর নেতৃত্ব চলে যাবে। পাড়ার কুকুররা এখনও আমাকে মানে, ভালোবাসে।'

'তা হলে ওরা কালুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কেন?'

'ভয়ে। আমি নানান কাজে বাইরে ছিলাম বেশ কিছুদিন, ও সেই সুযোগে গুন্ডা-গোছের কয়েকটা কুকুর সঙ্গে এনে পাড়ার দখল নিয়েছে। আমি আমার পাড়ার জন্য সত্যিকারের কিছু ভালো কাজ করতে চেয়েছিলাম। কাজকর্ম দিব্যি এগোচ্ছিল। কিন্তু এখন আবার যে-কে সেই—।'

'কীরকম কাজ?'

'আপনি ওই পাড়ায় একটা গাড়ি বা ট্যাক্সি নিয়ে ঢুকুন। দেখবেন, রাস্তার মাঝখানে পাট পাট হয়ে শুয়ে আছে কয়েকটা কুকুর। হর্ন বাজালে একটা চোখ খুলল, কিংবা একটু মাথা তুলল— আবার যে কে সেই। বহুবার হর্ন বাজার পরে কোনওমতে রাস্তার একধারে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। ওরা খুব ভালোভাবেই জানে— রাস্তাটা সরু, বহু লোক চলাচল করে, সুতরাং কোনও গাড়ি ওদের চাপা দিয়ে যেতে পারবে না। এটাকে এক ধরনের সুযোগ নেওয়া বলে। আমি পাড়ায় থাকার সময় এটা বন্ধ করিয়েছিলাম। বলেছিলাম— তোমরা সত্যিকারের কুকুরের মতো মাথা উঁচু করে বাঁচো। পরিশ্রম করো। নিজের সমাজের এবং মানুষের উপকার করো। ভালো কাজে এগিয়ে এসো। বীরত্ব যদি দেখাতেই হয়, নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি না করে চোর-ডাকাত-ছিনতাইবাজদের ধরো। অযথা হ্যাংলামো কোরো না। আত্মমর্যাদা নিয়ে চলো। তোমাদের অশেষ পুণ্য যে তোমরা কুকুর হয়ে জন্মেছ। সারা পৃথিবীতে কুকুরের কত সুনাম। সেই সুনাম রক্ষার দায়িত্ব তোমাদের ওপরেও বর্তায়!'

তারিফ করার গলায় তুষার বলল, 'বাহ! তুমি তো বেশ মোটিভেট করতে পারো। তোমার কথা শুনে আমিই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছি। তা, তোমার কথায় খুব কাজ হত নিশ্চয়ই।'

'হয়েছিল। পাড়ার লোকরা আমাদের ভালোবাসত। খাতির করত। আমাদের নিয়ে ওদের একটা গর্বের জায়গাও তৈরি হচ্ছিল একটু একটু করে। মাত্র কয়েকটা দিন পাড়ায় ছিলাম না, তার মধ্যেই সব উলটোপালটা হয়ে গেল। কিছু মনে করবেন না— আপনাদের দলাদলি, খেয়োখেয়ি, যে-কোনও ভালো মন্দের মধ্যে রাজনীতিকে টেনে আনার প্রভাব আমাদের ওপরেও পড়েছে।'

তুষার বুঝতে পারল নিজের মতকে

স্পষ্ট ভাষায় জানাবার হক আছে লালুর। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল, 'তুমি পরোপকারী, সমাজসেবী। শুধু কুকুরের নয়, মানুষেরও ভালো করার চেষ্টা করে যাচ্ছ সমানে। খুব ভালো কথা— কিন্তু যারা অত্যন্ত বাজে লোক, হাজার উপদেশেও যাদের টনক নড়ে না— তাদের তুমি শায়েস্তা করবে কীভাবে?'

অদ্ভুত একটা হাসি ফুটে উঠেছিল লালুর মুখে। 'তাদের জন্য মোক্ষম দাওয়াই একটাই— কামড়। আমার হিট-লিস্টে উপস্থিত চারজন আছে। প্রথম জন ওই দায়িত্বজ্ঞানহীন ট্রাফিক পুলিশ। দ্বিতীয় জন এখানকার একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক।'

'সে কী! কেন?'

'হাসপাতাল-নার্সিংহোমের সঙ্গে গোলমেলে ব্যবস্থা আছে ওর। তার ফলে ওই ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যে সব রুগি আসে, তাদের একটামাত্র রোগ থাকলেও টেস্ট করাতে হয় পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত— সব। চিকিৎসা করাতে গিয়ে গরিব মানুষরা সর্বস্বান্ত হয়। আমার হিট-লিস্টের তৃতীয় জন এক ডাক্তার।'

'ডাক্তার! কী যা-তা বলছ, এদের ওপর ভরসা না করে আমরা বাঁচব কী করে?'

'আমি তো সব ডাক্তারের কথা বলছি না। আমার হিট-লিস্টের এই ডাক্তারটার স্বভাব জোঁকের মতো। রুগিকে একবার ধরলে আর ছাড়ে না। এর পরে পথেঘাটে হঠাৎ কোনও রুগির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সেটাকে ভিজিট ধরে নিয়ে টাকা চেয়ে বসবে নির্ঘাত।'

তুষারের হঠাৎ মনে হল, লালুর সব ভালো, কিন্তু কিছুটা বোধহয় মানুষবিদ্বেষী। একটু কঠিন গলাতেই জিজ্ঞেস করল, 'তোমার হিট-লিস্টের চতুর্থ জন কে?'

উত্তর এল বেশ স্পষ্ট গলায়। 'কালু। ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্ত—। আপনি বোধহয় বাড়ির কাছাকাছি এসে গিয়েছেন।'

কথাটা বলার পরেই উলটো পথে হাঁটা দিয়েছিল লালু।

।। তিন।।

পরদিন সন্ধে হতে না হতেই বাইপাসের জেব্রা-ক্রসিংয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তুষার, কিন্তু লালুর দেখা পেল না। বেশ কয়েকবার রাস্তা পারাপার করল। সামনের ছোট্ট ঢালু মাঠটা দেখল, আশপাশের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করল— কিন্তু না, ও কোথাও নেই!

ফের নিজের পাড়ায় গিয়ে হাজির হয়নি তো! চিন্তাটা মাথায় খেলে যেতেই অস্থির হয়ে পড়েছিল তুষার।

বেলেঘাটা মেন রোডের ডানদিকে বাঁদিকে অনেকগুলো সরু রাস্তা আছে— এগুলোর মধ্যে কোনটা লালুদের পাড়া আন্দাজ করা অসম্ভব। কিন্তু শরীরের অস্থিরতা কাটাবার জন্য ও বড় রাস্তা ধরে জোর পায়ে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিল ওই দিকে।

দু'দিকের সরু পথ, গলির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল। ধরতে গেলে সর্বত্রই কুকুরের ছোটখাটো একটা দঙ্গল ছিল। কিন্তু ওদের কাউকেই তো লড়াকু বলে মনে হয় না। পথের ঠিক মধ্যিখানে টানটান হয়ে শুয়েছিল কয়েকটা কুকুর।

কালো রঙের কয়েকটা কুকুর ওর চোখে পড়েছে, কিন্তু লালু তাগড়া চেহারার যে কালুর বর্ণনা দিয়েছে, তেমন কাউকে দেখতে পায়নি।

বেশ কিছুটা পথ হেঁটে যাওয়ার ফলে তুষার একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ক্লান্তিতে বুঝি অস্থিরতা কমে। এবার অন্য একটা চিন্তা খেলে গেল মাথায়। লালু একেবারেই রগচটা গোছের নয়। ও বদলা নেওয়ার জন্য বাইরের দলবল জুটিয়ে কালুর ওপর এখনই চড়াও হবে না।

লালু সমাজসেবী। অনেক ভালো ভালো কাজের দায়িত্বও স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। যারা বদ তাদের ও শায়েস্তা করবে ঠিকই, তবে নিশ্চয়ই তাড়াহুড়ো করে নয়। ও এখন হয়তো বাচ্চা, বুড়ো আর প্রতিবন্ধীদের বাইপাস পারাপারের ব্যাপারে সাহায্য করছে।

বাইপাসের দিকে আবার জোর কদমে হাঁটা শুরু করে দিয়েছিল তুষার। একসময় পৌঁছেও গেল সেই জেব্রা-ক্রসিংয়ের সামনে। কিন্তু না, কোথাও লালু নেই।

চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল ওখানে বেশ কিছুক্ষণ। রাত একটু করে অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। আর অপেক্ষা করা যায় না। নির্জন পথ ধরে বাড়ি ফেরার সময় তুষার বারবারই পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, যে-কোনও মুহূর্তে লালু ছুটে এসে ওর সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে গল্প জুড়ে দেবে আবার। কিন্তু তা হল না, বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এসেছিল ও।

পরদিন সন্ধে হওয়ার আগেই বাইপাসের সেই জেব্রা-ক্রসিংয়ের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল তুষার। না, লালু নেই। সন্ধের আগে বোধহয় ও আসে না।

এক জায়গায় কতক্ষণ আর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায়। কয়েকবার রাস্তার পারাপার করল তুষার। আশপাশের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করল। বেলেঘাটার রাস্তার ধারে প্রতি সন্ধেয় বাজার বসে। আজও বসেছিল। কেনাবেচার পরে সে বাজার উঠেও গেল একসময়।

তুষারের চোখের সামনে রাত বেড়ে যাচ্ছিল একটু একটু করে। ওদিকের জমজমাট রাস্তা নির্জন হয়ে গিয়েছে। এদিকে নির্জনতা আরও বেশি। কালকের মতোই একটু বেশি রাতে বিষণ্ণ মনে বাড়ি ফিরে এসেছিল তুষার।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি। তবে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল প্রতিদিনের নিয়মে সকাল সাতটাতেই। প্রতিদিনের নিয়মে খবরের কাগজ আর চা নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল রিনি। কাগজ পড়তে পড়তে ও কিছু কথাবার্তা চালায়। আধোঘুমে আচ্ছন্ন তুষার সেই সব কথার কিছু কিছু উত্তর হুঁ-হ্যাঁ করেই সেরে দিয়েছিল।

রিনি ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে উঠে বসল তুষার। চোখ সামান্য জ্বালা-জ্বালা করছে, শরীরে অস্বস্তি। চা একটু ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। ওটা শেষ করার পরে বাংলা খবরের কাগজটা টেনে নিয়েছিল।

প্রথমে ও হেডিংগুলোয় চোখ বুলোয়। ভিতরের পাতার ছোট্ট একটা খবরে চোখ পড়তেই ও চমকে উঠেছিল ভীষণভাবে। ছোট টাইপে শিরোনাম: কুকুরের কামড়ে ৩ জখম। নিজস্ব সংবাদদাতার খবর জানাচ্ছে— বেলেঘাটা কানেক্টারের কাছে পাগলা কুকুরের কামড়ে গতকাল একজন ট্রাফিক পুলিশ, এক চিকিৎসক এবং একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কর্ণধার গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। মিউনিসিপ্যালিটির কর্মীরা রাস্তার কয়েকটা কুকুর ধরে নিয়ে গিয়েছে। স্থানীয় জনগণের অভিযোগ— ইদানীং ওই এলাকায় রাস্তার কুকুরের উৎপাত খুব বেড়ে গিয়েছে।

একই খবর বারকয়েক পড়ার পর বেশ কিছুক্ষণ থম মেরে বসে ছিল তুষার। তারপর 'রাত্তিরে ঘুম হয়নি, শরীর

ম্যাজম্যাজ করছে' বলে ধরতে গেলে গোটা দিনটাই শুয়েবসে কাটিয়ে দিয়েছিল।

সন্ধের মুখে আবার সেই বেলেঘাটা কানেক্টর। কিছুক্ষণ ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পরে শিবুর বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিল। শিবরঞ্জনের বসার ঘর আজ জমজমাট। বন্ধুদের বেশ কয়েকজন এসেছে।

শিবু ওকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'এই যে ডগ-লাভার এসে গিয়েছে। এতক্ষণ ধরে কুকুরের কথাই হচ্ছিল। কাল একটা অদ্ভুত রিপোর্ট পড়লাম। কয়েকজন পণ্ডিতের অবজার্ভেশন। এটা নাকি অল্টারনেটিভ ডারউইনিয়ান থিয়োরি। হাজার-হাজার বছর ধরে মানুষের সঙ্গে থাকার ফলে কুকুরেরা মানুষের প্যাটার্নস অব সোশ্যাল বিহেভিয়ারটা খুব ভালোভাবে বুঝে গিয়েছে। তার ফলে মানুষ কী চায় না-চায়, কী ভালোবাসে, ওদের মতো আর কোনও প্রাণী বুঝতে পারে না। মানুষের মন জুগিয়ে চলতে ওরা ওস্তাদ। একদিক থেকে ওরা আমাদের বোকা বানায়, এক্সপ্লয়েট করে। আমরা ভেবে নিই— ওরা আমাদের সব কথা বুঝতে পারছে—।'

হঠাৎই শিবুকে থামিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল তুষার। 'পারেই তো। মানুষের সব কথা ওরা বুঝতে পারে, এমনকী কেউ-কেউ মানুষের ভাষায় কথাও বলতে পারে। ওদের মধ্যে পরোপকারী আছে, সমাজসেবী আছে। মানুষের নিন্দে করা স্বভাব, মানুষ এর বাইরে যেতে পারে না, — পণ্ডিতরাও নয়।'

তুষার হঠাৎই উত্তেজিত হয়ে ওইভাবে কথাগুলো বলার পরে ঘরের আড্ডা একেবারেই মিইয়ে গিয়েছিল। কুকুর তো নয়ই, অন্য প্রসঙ্গেও গল্প আর তেমন জমল না।

মিনিট-চল্লিশেক বাদে 'একটু কাজ আছে' বলে উঠে পড়েছিল তুষার। বাইপাসের ওই জেব্রা-ক্রসিংয়ের সামনে এসে ও চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল বহুক্ষণ। চারদিকে ওর চোখ ঘুরেই যাচ্ছিল সমানে। বারবার মনে হচ্ছিল, খবরের কাগজের খবর তো আর সব সময় সত্যি হয় না।

কাল-পরশুর মতো একটু বেশি রাতের দিকে বিষণ্ণ মনে বাড়ির পথ ধরেছিল তুষার। নির্জন রাস্তা ধরে ফেরার সময় অনেকবারই ও কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে পেছনের দিকে তাকিয়েছিল।

স্পনসররাজ

প্রায় আঁতকে উঠে অমর বলল, 'আপনি এ কী বলছেন সেন্টুদা। আমার বাবার শ্রাদ্ধ, তার জন্যও স্পনসর পাওয়া যাবে!'

সেন্টুদার ভালো নাম প্রসাদচন্দ্র পাল, কিন্তু উনি বিখ্যাত প্রসাদ সি পল নামে। ওঁর কনসালটেনসি ফার্ম ফুলে-ফেঁপে উঠেছে খুব

অল্পদিনের মধ্যে। স্নেহভাজন অমরের বিস্ময় উপভোগ করার পরে মৃদু হেসে বললেন, 'কেন পাওয়া যাবে না? এটা হল স্পনসররাজ। কোম্পানিগুলো টাকার বান্ডিল নিয়ে বসে আছে, তোমাকে গিয়ে শুধু আইডিয়াগুলো খাওয়াতে হবে। এই যে ধরো এত ফুটবল, ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হচ্ছে— টাকা ঢালছে কারা? টাকা ঢালছে কোল্ডড্রিঙ্কস্‌ওয়ালারা, সিগারেটওয়ালারা। গোটা মাঠে ওদের কোম্পানি আর প্রোডাক্টের হোর্ডিং আর ফেস্টুন। মাঠের ওপর, প্লেয়ারদের জার্সিতেও ওদের বিজ্ঞাপন। খেলা স্পনসর করতে গিয়ে কোটি-কোটি টাকা খরচা করছে, কিন্তু ফায়দা তুলছে দ্বিগুণ। করছে কি না বলো?'

অমরের গলা এখন মিনমিনে। 'তা করছে, কিন্তু তার সঙ্গে এর—।'

'কোনও তফাত নেই। কোম্পানিগুলো এখন স্পনসর করার জন্য উপলক্ষ খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাজারে কত পোশাক আর প্রসাধনের কোম্পানি আছে, তাদের অনেকে বিউটি কনটেস্ট স্পনসর করে। দেশের পাকা প্রতিভা, কাঁচা প্রতিভাকে সম্মান জানাবার জন্য স্পনসররা মুখিয়ে আছে। এই যে পুজোর সময় সেরা প্রতিমা, সেরা ডেকরেটারদের পুরস্কার দেওয়া হয়—তার পিছনেও তো স্পনসর।'

এবার চেষ্টা করে গলায় সামান্য জোর এনে অমর বলল, 'ওগুলো তো অন্য ধরনের ব্যাপার। আমারটা তো একেবারেই ব্যক্তিগত—।

'ব্যক্তিগতকে পাবলিক করতে কতক্ষণ?'

'মানে!'

কনসালট্যান্ট প্রসাদ সি পলের মুখে রহস্য ঘনিয়ে তোলার হাসি। 'বিয়েটাকে কী বলবে তুমি? ব্যক্তিগত ব্যাপার তো। কিন্তু আমি দুটো বিয়েতে স্পনসর জুটিয়ে দিয়েছি। একটা রিসেপশনে পাত্রপক্ষের আর একটা রিসেপশনে পাত্রীপক্ষের একটা পয়সাও খরচ হয়নি। অথচ খাওয়াদাওয়ার এলাহি ব্যবস্থা ছিল। খেয়েছেও অসংখ্য লোক।'

অমরের চোখেমুখে এবার কৌতূহলের চিহ্ন ফুটে উঠল। 'কীরকম?'

'স্পনসরকে আইডিয়া খাওয়ালাম। বললাম, নেমন্তন্নবাড়িতে প্রচুর বিখ্যাত লোক আসবে। এদের একটু তোয়াজ করতে পারলে, আখেরে আপনার লাভ। তাছাড়া বিজ্ঞাপনও হবে ভালোরকম।'

রহস্য অমরের কাছে রহস্যই থেকে গেল। 'বিয়েবাড়ির লোকজনকে অত খরচাপত্তর করে খাইয়ে স্পনসরের কী লাভ? তাছাড়া নিমন্ত্রিতরা জানবে কী করে যে, খাওয়ানো-দাওয়ানোর পিছনে স্পনসর আছে।'

অমরের সেন্টুদা এবার সুতোর জট খোলার ভঙ্গিতে বললেন, 'সেই আইডিয়াটাই তো আমার। তবে হেঁজিপেঁজি জায়গায় রিসেপশন পার্টি দিলে চলবে না। আমার রিসেপশন ছিল ক্যাথিড্রাল চার্চের

পাশে প্যারিশ হলে, অন্যটা ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনস-এর একটা বিখ্যাত হাউসে। দুটো জায়গাতেই চমৎকার দুটো লন আছে। ওই লনে অনেকগুলো পেল্লায় ছাতা পড়েছিল, ছাতার নীচে বসার জায়গা। গোটা দুয়েক কফি আর কোল্ডড্রিঙ্কসের কাউন্টার। বুফে ডিনারের—ভেজ আর নন-ভেজ— সাজানো দুটো জায়গা। ওদিকে আবার পার্টিতে ঢোকার মুখে ফুল দিয়ে সাজানো চমৎকার গেট। গেটের ওপরে লেখা অমুক ওয়েডস অমুক। কী, কিছু মাথায় ঢুকল?'

দু'দিকে মাথা নাড়ল অমর।

সেন্টুদা এবার সুতোর শেষ জট খোলার ভঙ্গিতে বললেন, 'ফুলে সাজানো গেটের একটা থামে লেখা রয়েছে— গেট ডিজাইনড বাই— স্পনসরের নাম। স্পনসরের নাম লনের প্রতিটি ছাতার গায়ে, হট ড্রিঙ্কস ও কোল্ড ড্রিঙ্কস কাউন্টারে, আর বুফে ডিনারের জন্য সাজানো জায়গা দুটোর মাথায়। স্পনসরের কী সাংঘাতিক বিজ্ঞাপন ভেবে দেখো। বিয়ের ওই রিসেপশনের পরে একই কায়দায় দুটো জন্মদিনের পার্টিতেও আমি স্পনসর ধরেছিলাম।'

আবার মিহি হয়ে গিয়েছিল অমরের গলার স্বর। 'কিন্তু সেন্টুদা, এটা তো শ্রাদ্ধের ব্যাপার—।'

'তা হোক না। কথায় বলে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে। তিনটে শব্দই তো চমৎকার, পাশাপাশি বসে। তা আমি যদি বিয়ে আর জন্মদিনে স্পনসর ধরতে পারি, মৃত্যুতেই বা পারব না কেন? তোমার কেসটাকে আমি আমার এলেমের একটা পরীক্ষা হিসেবে নিচ্ছি। একটা জুতো কোম্পানির মালিকের সঙ্গে আমার অল্পস্বল্প যোগাযোগ হয়েছে হালে, দেখি তোমার ব্যাপারটায় ওকে স্পনসর হিসেবে পাওয়া যায় কি না।'

একটু বুঝি সিঁটিয়ে গিয়েছিল অমর। 'জুতো কোম্পানির স্পনসরশিপ নিয়ে বাবার শ্রাদ্ধ। মানে ব্যাপারটা কি ঠিক—।'

সেন্টুদার ভিতর থেকে এবার একজন পাক্কা প্রোফেশনাল কনসালট্যান্ট বেরিয়ে এল। 'ব্যবসা ইজ ব্যবসা। কীসের ব্যবসা সেটা বড় কথা নয়, দেখতে হবে সেই ব্যবসা করে কোম্পানি দাঁড়িয়েছে কি না। যদি দাঁড়ায়, তা হলে যে-কোনও বিষয়েরই স্পনসর হওয়া তাকে মানিয়ে যায় দিব্যি। ব্যবসার কোনও জাত নেই।'

অমর টের পেল ওর কথায় আঘাত

কথায় বলে জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে। তিনটে শব্দই তো চমৎকার, পাশাপাশি বসে। তা আমি যদি বিয়ে আর জন্মদিনে স্পনসর ধরতে পারি, মৃত্যুতেই বা পারব না কেন?

পেয়েছে হিতৈষী মানুষটি। একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বলল, 'আমি যদি উল্টোপাল্টা কিছু বলে থাকি, আমার কথায় কিছু মনে করবেন না প্লিজ। আসলে আমার মাথার ঠিক নেই। বাবা পরিণত বয়সে মারা গিয়েছেন, রোগে ভুগছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে; সেদিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায়—চলে গিয়ে উনি হয়তো শান্তিই পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের গুষ্টিটা জানেন তো— বিশাল। পূর্বপুরুষরা একসময় পয়সাওয়ালা বনেদি পরিবার ছিল। সেই তালপুকুরে এখন আর ঘটি ডোবে না। — কিন্তু শ্রাদ্ধের কাজ নমো-নমো করে সারতে গেলেও যে টাকাপয়সার দরকার— আপনি আমাদের বাড়ির সব খবরই জানেন— সে সংগতি আমার নেই। আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে কাছাকাছি যাঁরা আছেন, তাঁদের বলতে গেলেই তো সংখ্যাটা বিরাট হয়ে যাবে। মা বেঁচে না থাকলে, এই নিয়ে এত দুশ্চিন্তা আমি করতাম না—।'

সেন্টুদা অমরকে সত্যিই খুব ভালোবাসেন, হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এসব জানি বলেই তো তোমার ব্যাপারটা নিয়ে আমি এত ভাবছি। অল্পস্বল্প টাকার ব্যাপার হলে আমি নিজেই তোমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারতাম, কিন্তু তোমাদের পরিবারের যা বহর— অল্প মানেও তো অনেকখানি। সেইজন্যই আমি একজন স্পনসরের কথা ভাবছি। ঠিক আছে, তুমি পরশুদিন সকাল আটটা নাগাদ একবার এসো তো আমাদের বাড়িতে।'

সেন্টুদা একটু ব্যস্ত হয়ে টেলিফোন টেনে নিতেই অমর 'এখন তা হলে আসি' বলে বেরিয়ে পড়েছিল ওঁর চেম্বার থেকে।

।। দুই।।

পরশুদিন সকাল আটটার একটু আগেই সেন্টুদার বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল অমর। শীতের সকাল, কিন্তু ওই সাতসকালেই সেন্টুদার স্নান হয়ে গিয়েছে। নিখুঁতভাবে কামানো গালে আফটারশেভ লোশনের সুগন্ধ। ওই গন্ধ ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। সেন্টার টেবিলের ওপর আজকের সকালের তিন-চারটে ইংরেজি, বাংলা খবরের কাগজ। চা খাচ্ছিলেন সেন্টুদা। আপ্যায়ন করে বললেন, 'এসো অমর, বোসো।'

অমরের পরনে কোরা কাপড়, খালি গায়ের ওপর চাদর জড়ানো। কম্বল-কাটা আসন সোফার ওপরে বিছিয়ে বসল। মাথায় রুক্ষ চুল, গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। বেশ ম্লান দেখাচ্ছিল ওকে। ওর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে সেন্টুদা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, ঠিকই আছে।'

'ঠিক রাখো। এই সময় একটু বেশি সাবধানে থাকা দরকার। ভালো কথা, তোমার বাবার শ্রাদ্ধের আর ক'দিন বাকি?'

'পাঁচ দিন।'

এই পাঁচটা দিনকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সেই হিসেবই বোধহয় সেন্টুদার মাথায় ঘুরছিল।

অল্প কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে নিচু গলায় অমর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি গিয়েছিলেন ওই স্পনসরের কাছে?'

'হ্যাঁ-অ্যাঁ। আসলে মালিকরা দুই ভাই। বড় ভাই একটু প্রাচীনপন্থী। আমি ছোটজনকে ধরব বলে গিয়েছিলাম, কিন্তু পড়ে গেলাম একেবারে বড়র মুখোমুখি। জিজ্ঞেস করল— কী ব্যাপার? আমি চেপে যেতে পারতাম। কিন্তু চাপলাম না এই কারণে যে, পরে জানতে পারলে ভাববে— দেখো, আমাকে এড়িয়ে ছোটর সঙ্গে কথা বলছে। আসলে মালিকদের মধ্যে নানা ধরনের ইগো কাজ করে তো—। তা আমি বললাম তোমার কথাটা—।'

'বললেন?'

'হ্যাঁ, তবে যা আশঙ্কা করেছিলাম, তাই হল। গোঁড়া লোক তো! বলল, না-না, কারও বাপের ছেরাদ্দ আমাদের পক্ষে স্পনসর করা সম্ভব নয়।'

রীতিমতো আহত দেখাচ্ছিল অমরকে। 'আমি আপনাকে সেদিনই বলেছিলাম—।'

হাই-ডিগ্রি প্রোফেশনাল প্রসাদ সি পলের দুই চোয়ালে মৃদু কাঁপুনি ধরেছিল। একটু কেটে কেটে উনি বললেন, 'কথাটা যে ছেরাদ্দ নয়— শ্রাদ্ধ। শুধু তাই নয়, এই শ্রাদ্ধ শব্দটার আবার বেশ কয়েকটা ভালো-ভালো প্রতিশব্দ আছে। কিন্তু তখন আমার একটাও মনে পড়েনি। পড়লে হয়তো বলতাম। একটু হেঁ-হেঁ করে বললাম, আপনি এখন ব্যস্ত আছেন, পরে আসব একদিন—।'

অমরকে একটু অভিমানী দেখাচ্ছিল। 'আপনি আর কিছুই বললেন না?'

প্রসন্ন হাসি হেসে সেন্টুদা বললেন, 'না। আমাদের লাইনের নীতিই হল— মালিকদের কখনও তর্কে না হারানো। তর্কে হারালে কী হবে? মালিক মনে মনে তোমার ওপর খচে যাবে। তার মানে কোম্পানির কোনও কাজ তুমি আর পাচ্ছ না। এখন বলো— তোমার কাছে কোনটা বড়? তর্কে জেতা, না কাজ পাওয়া? কালকেই একটা ককটেল-পার্টিতে ছোট মালিককে পাব আমি, ওখানেই ওকে আইডিয়াটা খাওয়াব।'

'কী আইডিয়া? মানে, ঠিক কী বলবেন?'

'আউটলাইনটা তৈরি হয়ে গিয়েছে, তবে মেটিরিয়াল পাওয়া দরকার। এক পণ্ডিতকে ফিট করে দিয়েছি এই ব্যাপারে। বলেছি, শ্রাদ্ধের কিছু ভালো ইতিহাস দিন। আর শ্রাদ্ধকে গ্লোরিফাই করা হয়েছে— এমন দু'একটা মোক্ষম উদাহরণ জোগাড় করুন। তারপর আমি ব্যাপারটাকে আমার মতো করে সাজিয়ে নেব। অমর, তুমি পরশুদিন আর একবার এসো তো—। বাড়িতেই, ঠিক এই সময়। এই সময় আমি একটু ফ্রি থাকি।'

সেন্টুদার কথাটা শেষ হতেই শুকনো মুখে উঠে দাঁড়িয়েছিল অমর।

।। তিন ।।

অমরের সময়জ্ঞান নিখুঁত। পরশুদিন ঠিক সময়েই এসে হাজির হয়েছিল ওর সেন্টুদার বাড়িতে। ওকে দেখেই উচ্ছ্বসিত হয়ে সেন্টুদা ডান হাতের বুড়ো আঙুল শূন্যে তুলে বললেন, 'ডান্। জুতো কোম্পানির ছোট মালিককে ধরে তোমার বাবার শ্রাদ্ধের স্পনসর বানিয়ে নিয়েছি। এবার তুমি দু'হাতে খরচ করতে পারো, কিন্তু একটা পয়সাও তোমার পকেট থেকে যাবে না।'

এক পণ্ডিতকে ফিট করে দিয়েছি এই ব্যাপারে। বলেছি, শ্রাদ্ধের কিছু ভালো ইতিহাস দিন। আর শ্রাদ্ধকে গ্লোরিফাই করা হয়েছে— এমন দু'একটা মোক্ষম উদাহরণ জোগাড় করুন।

অমরের ম্লান চোখমুখ চকচকে হয়ে উঠেছিল, 'অ্যাঁ! কী করে করলেন এটা!'

মুচকি হেসে সেন্টুদা বললেন, 'সে অনেক ব্যাপার, পরে জানতে পারবে। আসলে নানা জনকে নানা ব্যাপারে স্পনসর ধরে দেওয়াটাই আমার পেশা। তোমাকে এখন যা করতে হবে বলে দিচ্ছি—। অবশ্য তোমার পাশাপাশি প্রতিটি ব্যাপারেই আমি থাকব। চৌরাস্তার পাশে নতুন যে মন্দিরটা হয়েছে, তার পাশেই বাংলোধাঁচের মস্ত বাগানওয়ালা যে বাড়িটা আছে, তোমার বাবার শ্রাদ্ধের কাজে ওই বাড়িটাই আমরা ভাড়া নেব।'

চমকে উঠে অমর বলল, 'কী বলছেন আপনি! ওই বাড়িটার তো অনেক ভাড়া!'

সেন্টুদা হেসে উঠে বললেন, 'বলেছি না প্রাণভরে খরচা করো, কিন্তু একটা পয়সাও গ্যাঁট থেকে দিতে হবে না তোমাকে। সব খরচ স্পনসরের। খরচপত্তর বরং কম হলে স্পনসর চটে যায়। যাক গে, ও নিয়ে তোমাকে দুর্ভাবনা করতে হবে না। বিল বাড়াবার ব্যাপারে তোমার পাশে তো আমি আছিই। আচ্ছা, তোমার বাবা একটা সংস্কৃত শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ ছিলেন না?'

'না তো, অল্প বয়সে একটা টোলে পড়িয়েছিলেন, তাও খুব অল্পদিন। তারপর তো উনি পাটের দালালিতে চলে এসেছিলেন।'

'যাক গে, শেষের পরিচয়টা কাউকে আর বলার দরকার নেই। তোমার বাবার এক্সপোজারটা আমি একটু অন্যভাবে দেব। উনি ছিলেন সংস্কৃত ভাষার মহাপণ্ডিত, ন্যায়শাস্ত্রবেত্তা, নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। আমাদের প্রাচীন যাগযজ্ঞ, ধর্মকর্ম, ঐতিহ্য, পরম্পরা ইত্যাদি এই সমাজে নতুন করে নিয়ে আসার ব্যাপারে ওঁর ভূমিকা ছিল ভগীরথের মতো।'

অমর অবাক হয়ে বলল, 'আপনি তো অনেক কঠিন কঠিন শব্দ জানেন সেন্টুদা।'

'স্পনসর ধরার জন্য সব দু'দিন আগে শিখেছি। বলছিলাম না— এক পণ্ডিতকে ফিট করেছি রেফারেন্স জোগান দেওয়ার জন্য। শ্রাদ্ধ মানে যা-তা শ্রাদ্ধ নয়। রীতিমতো দানসাগর। প্রচুর দানধ্যান করা হবে। শ্রাদ্ধের কাজ করার জন্য নামকরা পুরোহিতদের ডাকা হচ্ছে। সংস্কৃত স্তোত্র পড়া হবে পুরো একবেলা। এই শ্রাদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হ্যান্ডমেড পেপারে ছেপে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিলি করা হবে। মোদ্দা কথা, এটা জেনে রাখো— কারও বাপের শ্রাদ্ধে আমি ছাড়া আর কেউ স্পনসর ধরতে পারেনি আজ পর্যন্ত। এটা কিন্তু ইতিহাস হয়ে রইল।'

।। চার ।।

শ্রাদ্ধের দিন মুণ্ডিত মস্তক অমরের অবাক ভাব কিছুতেই আর কাটছিল না। সেন্টুদা যা বলেছিল, এ তো তার চেয়েও বহুগুণ বেশি। একেবারে রাজবাড়ির শ্রাদ্ধ। যজ্ঞের ধোঁয়া, সংস্কৃত মন্ত্র আর ফুলের গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। কারুকার্য করা সাদা কাপড়ের প্যান্ডেলে সাদা ফুলের মালা আর স্তবকের ছড়াছড়ি। দানসাগরের বিশাল আয়োজন। কিছু ব্রাহ্মণ দানসামগ্রীর পাশে ঝাঁক বেঁধে ঘুরঘুর করছিল।

মহাপণ্ডিতের শ্রাদ্ধবাসরে শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন পুলিশের কয়েকজন বড়কর্তা, সরকারি আমলা আর একজন মন্ত্রী। এঁরা এলেই যে-কোনও অনুষ্ঠানের গুরুত্ব একলাফে অনেকখানি বেড়ে যায়। এসব দেখে কেমন যেন ঘোর লেগে যাচ্ছিল অমরের। ফুলের মালা দিয়ে ঢাকা বাবার ছবির দিকে তাকিয়ে ভাবছিল— ইশ্! মানুষটা যদি একবারের জন্যও এসব দেখার সুযোগ পেত!

নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা ছিল বিরাট।

ধরতে গেলে সবাই এসেছিলেন।

সেন্টুদা দুটি ফুটফুটে মেয়েকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন গেটে। ওদের কাজ ছিল প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের হাতে সুদৃশ্য হ্যান্ডমেড

পেপারে ছাপানো 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' আর একটি সাদা গোলাপ তুলে দেওয়া।

শ্রদ্ধাঞ্জলির ওপর দিকে গীতার একটি শ্লোক। মধ্যিখানে অমরের বাবা অঘোরনাথ সান্যালের মুখের স্কেচ। নীচে জন্মসাল আর মৃত্যুসাল। তার নীচে গুটিকয়েক লাইন। বড় বড় হরফে লেখা আছে:

মহাকবি বলেছেন, আমাদের দেশে পিতৃশ্রাদ্ধ প্রকাশ্য সভায় অনুষ্ঠিত হয়, তেমনি লোকহিতৈষী কোনও মহান ব্যক্তির মৃত্যুতে প্রকাশ্য সভায় শোকজ্ঞাপন করা একটি সামাজিক কর্তব্য। আমরা পিতৃপ্রতিম পণ্ডিত অঘোরনাথের শ্রাদ্ধবাসরের আয়োজন করে এবং এই সভায় আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে শোকজ্ঞাপন করে একটি পবিত্র সামাজিক কর্তব্য পালন করেছি মাত্র। ইতি বিনীত, নিউ এজ পাদুকালয় প্রাঃ লিঃ।

।। পাঁচ ।।

পরদিন রোববার। সেন্টুদার ছুটি। কোথাও বেরবার তাড়া নেই। ওঁর চোখমুখের সব জায়গায় সাফল্যের আভা। চায়ের কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিয়ে সামনে বসে থাকা অমরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা হলে অমর, তোমার বাবার শ্রাদ্ধশান্তির কাজ খুব ভালোভাবেই মিটল, কী বলো?'

অমর কৃতজ্ঞ মানুষের গলায় বলল, 'শ্রাদ্ধের কাজ এইরকম বিরাটভাবে হবে— এ আমরা কল্পনাও করতে পারিনি। সকাল হতে না হতেই তাই ছুটে এসেছি আপনার কাছে, আপনাকে কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাব—।'

'কৃতজ্ঞতা জানাবার কোনও দরকার নেই। পার্টিকে স্পনসর ধরে দেওয়া আমার পেশা, এই করে দুটো পয়সা আসে আমার পকেটে। কিন্তু শ্রাদ্ধের স্পনসর ধরতে পারব কি না তা নিয়ে আমার নিজেরই সংশয় ছিল। যাক, উতরে গিয়েছি ভালোয় ভালোয়।'

'খবরটা কাগজেও বেরিয়েছে, দেখেছেন?'

'কেন দেখব না? খবর ছাপানোর পিছনে তো আমিই। জুতো কোম্পানির ছোট মালিক রাজি হব হব করেও হচ্ছিল না। তখন এই চালটাই দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, বিচিত্র আর উদ্ভট খবরের দিকে মিডিয়ার খুব ঝোঁক থাকে। খবরটা যাতে টিভি আর

পৃথিবীর কোনও খবরের কাগজই এই ছাপার ভুল এড়াতে পারে না। একে বলে ছাপাখানার ভূত। এই লাইনে যদি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকি, একদিন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা করব আমি।

খবরের কাগজ কভার করে— সেটা আমি দেখব। ব্যস, টোপ গিলল ছোট মালিক। টিভি ছবি তুলে নিয়ে গিয়েছে, তবে হার্ড নিউজ তো নয়, পরে দেখাবে একদিন।'

অমর এবার আমতা-আমতা করে বলল, 'দৈনিক প্রভাতসূর্য রিপোর্টের শেষের দিকে লিখেছে— শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে নিউ এজ পাদুকালয়ের পক্ষ থেকে পণ্ডিত অঘোরনাথের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের ব্যবহারের জন্য দশ জোড়া এক্সপোর্ট-কোয়ালিটি জুতো উপহার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি তো আপনার কাছ থেকে মাত্র একজোড়া পেয়েছি।'

অমরের কথা শেষ হতে না হতেই গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিলেন সেন্টুদা। তারপর কোনওমতে সেই হাসি থামিয়ে বললেন, 'এই না হলে খবরের কাগজ! আসল ব্যাপারটা ধরতে পারনি বুঝি?'

বিব্রত হয়ে দু'দিকে মাথা নাড়িয়েছিল অমর।

ওর অজ্ঞতাকে সস্নেহে মেনে নিয়ে গলা একটু নামিয়ে সেন্টুদা বললেন, 'ছাপা হওয়ার কথা 'এক', হয়েছে 'দশ'। ছাপার ভুল। পৃথিবীর কোনও খবরের কাগজই এই ছাপার ভুল এড়াতে পারে না। একে বলে ছাপাখানার ভূত। তবে তোমাকে একটা কথা বলে রাখছি অমর। এই লাইনে যদি শেষ পর্যন্ত টিকে থাকি, একদিন ভূতের বাপের শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা করব আমি।'

সেন্টুদার কথায় ম্লানমুখে হেসেছিল অমর।

স্বর্ণাক্ষরে পত্রিকা

কর্মক্ষেত্র
ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত
সব সাপ্তাহিক পত্রিকার মধ্যে
সারা ভারতে পাঠকসংখ্যায় ১ নম্বর*

ভ্রমণ
ভারতে সবচেয়ে বেশি পড়া ভ্রমণ পত্রিকা*

কালের কষ্টিপাথর
নতুন মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

ছেলেবেলা
ছোটদের পরমাশ্চর্য মাসিক পত্রিকা

****

কিংবদন্তি পত্রিকার
সংরক্ষণযোগ্য সংকলন
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

****

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
গল্প ও কবিতা সংকলন
নিমফুলের মধু ₹৬০
মৃত্যুর অধিক এই মেরে ফেলা ₹৫০
নদী জানে, কচি নিমপাতারাও জানে ₹৩০

আমাদের সব বই ও পত্রিকা
অনলাইনেও পাওয়া যায়:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kol-19
Phone: 2283-2320 Fax: 2287-6448
Website: www.swarnakshar.in
E-Mail: info@swarnakshar.in
*তথ্যসূত্র: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4

“তখন সুখে থাকি। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায়, দিনের কাজ সেরে শিপ্রা ও আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে বসতাম। রাস্তা থেকে একচিলতে জমি, বেশিরভাগ মানুষই ওখানে গাছপালা লাগান। সেখান থেকে উঠে আসে তিনধাপ সিঁড়ি। তারপর ঘরের দরজা। আমরা প্রায় বসতাম সেই সিঁড়িতে। কারও কোনও কৌতূহল নেই। শহরের এত কাছে এরকম খোলা আকাশ, বিক্ষিপ্ত গাছগাছালি, পথচারীহীন রাস্তা। মাঝে মাঝে অজানা কোনও এক দিক থেকে উঠে আসা হাওয়া দোল দিয়ে যেত আমাদের শরীরে। সুখের অনুভূতি উপলব্ধি করতাম। মনে হত কত যুগের সম্পর্ক থেকে কুড়িয়ে পাওয়া আমার এই নারী। এখন যে চিরকালের জীবনসঙ্গিনী। আমার যৌবনতরঙ্গ যেন অবিরত খেলে চলেছে, আর রামধনুর সাত রং যেন অসংখ্য ফেনায়িত বুদবুদের মতো চারদিক আলোকিত করেছে, আমরা তখন যেন, সমাজ-সভ্যতা থেকে বহু দূরে, হয়তো কোনও অন্য গ্রহে। একদিন সকালে শিপ্রার বাবা এলেন। আমাকে ভালোবাসতেন। খুব ত্রাস্ত হয়ে উদ্বেগ নিয়ে আমাকে জানালেন শুভা, তুমি কি খবর পেয়েছ? আজই চেষ্টা করো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ‘সঞ্চয়িতা’ বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। আজই টাকাপয়সা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করো।”

১২

কলেজ স্ট্রিটের পাড়া। ফলে একদিন সেই ক্লাসে ঢুকে পড়লেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। তাঁকে অন্ধকারের আলোয় গোল করে ঘিরে আছে ছাত্রছাত্রীরা। মাঝখানে টুলে বসে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। একের পর এক গল্প বলে সময় হরণ করে নিলেন। সবাই হাসিতে লুটোপুটি। গরম নেই, দুঃখ নেই, অন্যভাবে পাওয়া সঞ্জীবদাকে। এও এক অন্ধকারে আলো।

সব শুরুরই তো একটা সূত্র থাকে। শিপ্রাই তো সূত্র— সেটা অনুচ্চারিত ছিল। সেই ১৯৭৬ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান চালিয়েছিলাম। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষের কত না জায়গায় গিয়েছি ছবিচর্চার জন্য। নেপাল থেকে পাঁচমারি, খাজুরাহ, জয়পুর, কৌশানি কত বিচিত্র জায়গায়, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, কত বিচিত্র কাহিনির জন্ম দিয়েছে। এক-একটা ভ্রমণ কত ঘটনার জন্ম দিয়েছে। মানুষকে চেনা-জানা-দেখার সুযোগ করে দিয়েছে। কখনও কোনও ঘটনায় আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

উৎসাহিত হয়েছি, আবার উল্টো। কিন্তু বরাবরই আমি প্রাণ ঢেলে সব কাজ করেছি। যতটুকু পুঁজি আমার, তার সবটুকু ঢেলে শেখাতাম ছাত্রদের। তারাও অত্যন্ত আপন করে গ্রহণ করেছে তা। এভাবে নিজেও কত শিখেছি! ভোর থেকে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী যাতে কোনও অসুবিধায় না পড়ে সেজন্য তাদের দেখাশোনা করার সমস্ত দায়িত্ব যেমন একহাতে নিয়েছি, তেমনই যে সবচেয়ে অভাবী তার কথা মাথায় রেখে কত অল্পে আমরা যাত্রাপথ, খাওয়াদাওয়া ইত্যাদির মাথাপিছু খরচ ধার্য করা যায় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতাম। হয়তো কারও কারও একটু অভিযোগ থাকত কিন্তু মোটামুটি সবাই মেনে নিত। এখন ভাবলে হাসি পায়, বারো দিনের নেপাল সফর করেছি মাথাপিছু ২০০ টাকার বিনিময়ে। পুরো বাসভর্তি আমরা, যাত্রাপথে মাঝে মাঝে নোঙর ফেলে রান্নাবান্না, খাওয়াদাওয়া। আবার এগিয়ে যাওয়া। পথ যে কত সুন্দর! কখনও কখনও মনে হত গন্তব্যে পৌঁছনোর দরকার কী! সম্পূর্ণ সাদা বরফে ঢাকা হিমালয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছি, সে বিস্ময় কি কখনও মুছে যায়? তখন যৌবন। আমি কাণ্ডারির ভূমিকায়। আমাকে অনুসরণ করছে, ভরসা করছে অনেক তরুণ-তরুণী, ছাত্রছাত্রী। একদিকে দায়িত্বের ভার গুরুভার, অন্যদিকে এক গোপন অহংকার কিংবা সুখ। এই বিশাল পৃথিবীতে চারদিকে অসংখ্য খাদ, বরফ আর তারই মাঝখান দিয়ে আমরা চলেছি। বাসের ভিতরে তারুণ্য আর ভরা যৌবন। তবু, আমরা কত ক্ষুদ্র! ভয়, রোমাঞ্চ, বাইরের বিশালত্ব মিলিয়ে এক অস্ফুট অনুভূতিতে আমরা নিথর হয়ে চলেছি হিমালয়ের বুক চিরে—নেপালের উদ্দেশে।

এরকমই অজস্র অভিজ্ঞতা, কাহিনি, কথা আমার বরাবরই খুব প্রকাশ করতে ইচ্ছে করে। জীবনের সমস্ত সুখ, দুঃখ, ভালোবাসা, আনন্দ, ঈর্ষা, রাগ ধরে রাখতে পারিনি। প্রকাশ করতে চাই। ছবি তার একটা মাধ্যম। তাও কিন্তু কত কষ্টে ফুটে ওঠে। এক বিমূর্ততায় পৌঁছে যাই। সেটা ভালো। তাতে আত্মজগতের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে হয়। আবার অন্যদিকে বন্দিদশার জীবন কাটালে জগৎ, সমাজ দেখব কী করে, জানব কী করে! বন-বনান্তর, মন-মনান্তর— এমনই তো জীবনপরিক্রমা। তাই সারা জীবন ধরেই এক দ্বন্দ্ব কাজ করে। অনেক আত্মগত মানুষকে দেখে আকাঙ্ক্ষা হয়, মনে হয় কেন ওরকম হতে পারি না। কিন্তু কী করি। কোলাহল আমায় টানে। মানুষের সঙ্গে মিশতে ইচ্ছা করে, ভালোবাসা বড় হাতছানি দেয়। মনে করি, সবাই আমার ভালোবাসার জন। পিপীলিকারা ডানা মেলে আলোর বলয়ে ধাবিত হয়। কিন্তু তার তাপে দগ্ধ হয়ে ঝরে যায় অতি অল্প সময়ে। তবু যায়।

আমি অন্য জগৎ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজের জগৎ তৈরি করে নিয়েছিলাম। আমার তৈরি কলেজ অসংখ্য ছাত্রছাত্রী আর শিপ্রাকে নিয়ে। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যে ডাক পেতাম, তাতেই অন্য জগতের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ থাকত। পরিচিতি ছিল আমার বরাবরই বিভিন্ন স্তরে, বিভিন্ন মহলে। কিন্তু কি পরিবারে, কি কলকাতার শিল্পীমহলে আমার বড় অপরাধ এই যে কারও সঙ্গে যুক্তিহীনভাবে তাল দিয়ে চলা আমার চরিত্রে ছিল না। মানুষ তাদের পছন্দ করে, নিরাপদ মনে করে, যারা তার সঙ্গতের কাজ করে। আমি তা হতে পারিনি। মাঝে মাঝে বিদেশ পাড়ি দিই। ভালোমন্দ অভিজ্ঞতা হয়। কখনও সফল। কখনও একটু কম সফল। কিন্তু ছবি-জীবনে ছেদ পড়ে না। নিয়মিত একক প্রদর্শনী করি। নতুন নতুন ভাবনার ছবি আঁকা। খুব অল্পই অর্থের সফলতা আসে। ভারতবর্ষে তো ছবির বাজার তখনও গড়ে ওঠেনি। আর আমি তো কোনও গোষ্ঠীতে নেই। যা কিছু হয় একক প্রচেষ্টায়। বিরোধিতা ছাড়া কোনও উৎসাহ আসে না অগ্রজ শিল্পীদের কাছ থেকে। দুঃখ হত, তা বোঝাবার কোনও সঙ্গী ছিল না। ছাত্রছাত্রীরা ঘিরে থাকত। তাদের কানে নানান মন্ত্রণা দিত ঈর্ষাকাতর অগ্রজ দাদারা। ছাত্রছাত্রীরা ঠিক মেলাতে পারত না।

এরকমই সময়ে ঠিক করে ফেলি সংসার পাতব। আর স্কুলের সঙ্গে সম্পর্ক রাখব না। এত অল্প টাকা কোনও কাজে লাগত না। হয়তো নিষ্ঠাবান কেরানি, শিক্ষক হলে ঠিকঠাক অঙ্ক হাতে আসত। কিন্তু তা তো হতে পারিনি। একটা কী দুটো ক্লাস নেওয়ার জন্য সেই নিয়মিত ঘণ্টায় পৌঁছনো আর দিনের সবচেয়ে মূল্যবান সময় শেষ করে প্রাক-সন্ধ্যায় কর্মস্থল ত্যাগ করা অসহনীয় লাগতে শুরু করল। সেসময় শিপ্রাদের বাড়ি আমার জীবন-যৌবন-অহংকারের ঘাঁটি ছিল। শিপ্রার বাবা সেই পূর্ববঙ্গ থেকে চলে-আসা, যুবক বয়সে মফস্সলে শিক্ষকতা করা মানুষ যিনি বিবাহসূত্রে এক কর্মোদ্যোগী পিতাশ্বশুরের সংস্পর্শে এসে ব্যবসায়ী হয়ে যান। কিন্তু সরলতা আর সততা ছিল তাঁর বড় মূলধন। তাঁর পুত্রসন্তান ছিল না। পাঁচ কন্যার জনক তিনি। ধর্মমতী তাঁর সহধর্মিণী। এই মধ্যবিত্ত ধর্মবিশ্বাসী বাঙালি পরিবারে আমি একটু বেসুরো হাওয়া। যেহেতু আমাদের পারিবারিক সংস্কৃতি থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ পৃথক, সেহেতু আমার এক আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল গোটা পরিবারটাকে নিয়েই। একটা সময় সম্পূর্ণভাবে আমার জীবন শিপ্রা আর তার পরিবারকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। একদিকে ছাত্রছাত্রী, আমার ছবি-জীবন আর দেহমনের রসদ সেই পরিবার। আমি পুষ্ট হতে থাকি এইভাবে। তখন আমার স্বপ্ন হলুদ ফুলে ঘুরে

কি পরিবারে, কি কলকাতার শিল্পীমহলে আমার বড় অপরাধ এই যে কারও সঙ্গে যুক্তিহীনভাবে তাল দিয়ে চলা আমার চরিত্রে ছিল না। মানুষ তাদের পছন্দ করে, নিরাপদ মনে করে, যারা তার সঙ্গতের কাজ করে। আমি তা হতে পারিনি।

১৯৮০ সালে কলেজ অব ভিশ্যুয়াল আর্টসে অধ্যাপক অম্লান দত্তের সঙ্গে লেখক

বেড়ানো অসংখ্য প্রজাপতির মতো। এক অমোঘ মায়ার আকর্ষণে ডানা মেলে ধাই আমি। সন্তোষকুমার ঘোষ, গৌরকিশোর ঘোষ, অহিভূষণ মালিক এঁরা তখন আমার অভিভাবক। আচরণে ইয়ার-দোস্ত। আমার সব গোপন কথা জানতেন, এগিয়ে দিতেন, প্রশ্রয় দিতেন। এই বিয়েতে বাবার সম্মতি ছিল না। বাড়িতে থাকি। বাবা-মাকে আমার মতো করে দেখভাল করি। দাদা তখন কর্মসূত্রে দেশের বাইরে। আমি বাড়িতে আশ্রয়ে থাকি, প্রশ্রয়ে নয়। প্রশ্রয়ের রসদ খুঁজে পাই এইসব মনবাউন্ডুলে সংসারীদের কাছ থেকে। সন্তোষকুমার ঘোষ আমার বিয়ের নিমন্ত্রণপত্র সুন্দর গদ্যে লিখে দিয়েছিলেন। আমন্ত্রণপত্রের বিশিষ্টতা এই যে, ভাবী শ্বশুরমশাইকে জানিয়েছিলাম সামাজিক অনুষ্ঠানটা যৌথভাবে করার। উনি রাজি হয়ে যান। নিমন্ত্রণপত্রের বয়ান সেমতো হয়। আমন্ত্রণকারী হিসেবে আমার দুই পিতার নাম লিখিত হয়। অথচ এ অনুষ্ঠানে বাবার প্রশ্রয়, অনুমতি কিছুই ছিল না। বেশ সমারোহে বহু মানুষের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছিল বিবাহ-অনুষ্ঠান। বহু কৃতী মানুষ, স্বজন, আত্মীয়, বিদেশি বন্ধুরা এসেছিলেন ক্যাথিড্রাল সংলগ্ন প্যারিস হলে। মঞ্চে সময়মতো অন্যতম আমন্ত্রণকর্তা হিসেবে আমার পিতা উপস্থিত ছিলেন। সেটাই ছিল আমার কাছে এক ঠান্ডাযুদ্ধে জয়ী হওয়ার গোপন আনন্দ। মনে আছে, লেডি রানু কী সুন্দর একটি উপহার দিয়েছিলেন শিপ্রাকে। শিপ্রাদের বাড়ি, লেকটাউনে, যথাযথভাবে বিবাহের ধার্মিক অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল। আমি তখন গাঢ় কালো শ্মশ্রুযুক্ত মুখে কেশযুক্ত মাথায় টগবগে এক যুবক। সে এক সুখের সময়। কিন্তু বিবাহের পর কোথাই যাই। বাবা তো নির্দেশ দিয়েছিলেন, তাঁর অমতে, তাঁর বিশ্বাস ও পারিবারিক রীতি অনুযায়ী স্বগোষ্ঠীতে বিবাহ না-করার জন্য আমাকে গৃহে স্থান দেবেন না। আমি সল্টলেকে একটি ভাড়াবাড়ি পাই। সেখানেই সংসার পাতি। অন্যরকম জীবন শুরু হয়। উপভোগ করি অন্য পরিবেশ, অন্য জীবন, অন্য স্বপ্নচারী হয়ে।

অনেকের মধ্যে মিলেমিশে থাকলেও আমার নিজস্ব জগৎটা খুব ছোট। আর যৌবনের তেজ এতটাই জোরালো, পৃথিবীর কোনওকিছুই তখন আমার ইন্দ্রিয়ে নাড়া দিত না। শিল্পীগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, নগরজীবনের নানা কোলাহল, পেশাজীবনের সংগ্রাম, মূলত যেসব কাণ্ডকারখানায় জড়িয়ে থাকতাম, তার কোনও কোলাহলই যেন আসত না এই নতুন বাসায় গোড়ার দিকে। শিপ্রাকে পেয়ে তখন ভালোবাসার লুকোচুরি খেলা, জীবনসংগ্রামে জড়িয়ে থেকেও মূল আকর্ষণের খেলা ছিল সেটাই। কিছু গোপন রাখি, কিছু মিথ্যা বলি, কিছু বাড়িয়ে বলি, কিছু ডিঙিয়ে চলি, সন্তর্পণে কিছু টপকে যাই। হৃদয়হরণ শব্দটার কিছু গুরুত্ব বুঝি। কিছু কিছু সমসাময়িক আধুনিক গান কর্ণপটহ থেকে হৃদয়ে ঢুকে পড়ে। উদাস করে দেয়। যৌবনতরঙ্গ যে কী আজ দূরে বসে ভাবি, গোপনে হাসি পায়। তবে এটাও ঠিক, অনেক দূর পাড়ি দিয়ে আজও সেই স্মৃতি অনুরণিত করে। মাঝে মাঝে সেই সময়টাকে উপভোগ করি শিপ্রার সঙ্গে কল্পনায়, বাস্তবের মতো। সল্টলেকে একতলার একটি নতুন ফ্ল্যাটে আমরা বাসা বেঁধেছি। তখনও কলকাতার পাশে গড়ে ওঠা এ ভূ-খণ্ড আমার অজানা। মরুভূমিতে যেমন দিকনির্ণয় করা কঠিন, তেমনই আমার

কাছে এখানে। তবু আমার বাসার চারদিকের কাঠামোগুলো ঠিকঠাক গড়ে উঠেছে। কিছুটা হেঁটে গেলে বাজার। কলেজস্ট্রিটে বয়স্ক হয়েছি। বাজার বলতে ট্রামরাস্তা ডিঙিয়ে শিশুকাল থেকে যার সঙ্গে পরিচয়, তা হল কলেজস্ট্রিট মার্কেট। অসংখ্য মণিহারি বেকারি, ছিটমহল পেরিয়ে আর এক বিশাল বাজার। সেখানে শুধুই আনাজ, তরিতরকারি, মুদি— বিশাল এলাকা। আবার ওটা পেরিয়ে মাছ-মাংসের বাজার। সবই এক ছাদের তলায়। শাকবিক্রেতা থেকে আড়তদার, দোকানদার থেকে কষাই সবাই আমাকে চিনতেন। বেশ ভালোও বাসতেন। তাড়াহুড়োহীন জীবনে বাজার করতে বেশ ভালো লাগত। কেনাকাটা বলতে সবজি, ফলমূল, মুদি সবকিছু ছাপিয়ে মাকে খুশি করার কোনও-না-কোনও লিপ্সা কাজ করত। তখন তো (বাবা ফ্যুরর আর মা দুর্গতিনাশিনী) সেই আমি আর বাজারে ঢোকার ফুরসত পাই না। সেই আমি সল্টলেকে নিয়ম করে শিপ্রার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতে করতে বাজার করতুম। এখানে কেউ চেনে না। আমার রাগ, দুঃখ, অহংকার— সবই আমার মধ্যে আর শিপ্রার মধ্যে। বিবাহের উপহার পাওয়া জিনিসগুলি আমাদের ছোট্ট দুটি কামরায় সাজিয়েগুছিয়ে রেখেছি। ঘর সাজাতে শিপ্রার জুড়ি নেই। মাথায় পরিকল্পনা এলেই ও ফটাফট রূপ দিয়ে দেয়। বাড়ির মালিক আমাদের পরিচিত। স্টেটসম্যানের নিউজ এডিটর ছিলেন। সেই সূত্রে আমাকে বিশেষ খাতির করতেন। তাতে আর্থিক লেনদেনে ছাপ পড়েনি। কিন্তু একটা নিশ্চিন্ততা থাকত। কাছাকাছি আরও কিছু পরিচিত মানুষজন ছিলেন। তাঁদের সঙ্গেও জানাজানি হয়। আমি এখানে বাসা বেঁধেছি। মাঝে-মধ্যেই মানুষজনদের ডাকতাম। শিপ্রা নতুন হাতে রান্না করত। ছয়-সাতজন অনায়াসেই আমাদের ছোটঘরের টেবিল ঘিরে আমন্ত্রণ রক্ষা করত। বেশি লোক হলে বাড়ির সামনের রাস্তায় চেয়ার পেতে আপ্যায়িত করতাম বন্ধুদের। অনেকটা বিদেশের মতো। এই বাসার স্মৃতিচারণ করতে বসলে আরও অনেক মজার ঘটনা মনে আসে। শিপ্রাকে রেখে দুপুরে চলে যেতাম এখানে-ওখানে রোজগারের তাগিদে। জীবনের রসদ সংগ্রহে। বেশ কিছু বছরের জমানো টাকা আমার দুশ্চিন্তা থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছে। বিদেশে মনে করলেই যেতে পারি। একটু চেষ্টা করলেই প্রদর্শনীর আয়োজন হয়ে যায়। কিছু বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করা যায়। এখন আর আমি একা নই। শিপ্রার সঙ্গে যুক্তি করে যা কিছু পরিকল্পনা।

একদিন ভোরবেলা এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। শীতকাল। সল্টলেকের তাপমাত্রা অনেকটা নীচে। ভোররাতে কড়া নাড়ার শব্দ পেলাম। একতলায় থাকি। দরজার শব্দ সঙ্গে সঙ্গেই পাই। ঘুমন্ত আমরা আলো জ্বেলে দেখি ঘড়িতে পৌনে চারটে। এখন কে ডাকছে। সাহস নিয়ে দরজা খুলি। কাঠের দরজার বাইরে কোলাপসিবল। কাজে-কাজেই বিপদের আশঙ্কা কিছুটা কম। তালা ছিটকিনি খুলে ভাঁজ করা দরজার ফাঁক থেকে দেখি আপাদমস্তক মোড়া অল্প আবছা মুখ। কিন্তু চেনা গলা। আমাকে বলছেন, তাড়াতাড়ি খোলো। আমি ভাগ্নের কাছে উঠেছি। ভাগ্নে আমার সল্টলেকের ইলেকট্রিক বিভাগের বড় কর্তা ও নামকরা ইঞ্জিনিয়ার। ওর অফিস এখানে। আমি গর্ভযন্ত্রণায় ছটফট করছি। ঘুমোতে পারিনি। তোমার কাছে চলে এসেছি পরামর্শ করতে। তুমি তাড়াতাড়ি খোলো। ব্যাপারটাকে জরুরিভিত্তিক বিবেচনা করো। এই কথোপকথন থেকে স্পষ্ট হল উনি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। আমি দরজা খুলে দিলাম। সোজা নিঃসঙ্কোচে ঘরে ঢুকে পড়লেন আর সামনের চেয়ার-টেবিলে বসে পড়লেন। কম্বলটা খুলে উনি অভিপ্রায় জানালেন। বললেন, শুভা হাতে আর সময় নেই। একটা আইডিয়া এসেছে, বইমেলা শিগগির। ঠিক করেছি তিরিশ বাই চল্লিশ ইঞ্চি সাইজের পোস্টার বানাব। সুনীল, অভীককে বলে দিয়েছে। অভীক ছেপে দেবে অফসেটে। এই পোস্টারগুলো আঁকা হবে তোমাদের মতো বিখ্যাত শিল্পীদের দিয়ে। দেদার রং ভরে ছবি আঁকবে। পোস্টারের বিষয় হবে, কবি-লেখকের কিছু শব্দ-বাক্যে। যেগুলো হীরের মতো ঠিকরে এসেছে তাঁদের লেখা থেকে। ধরো, 'আ! পৃথিবীটা কী সুন্দর'—

আমি গর্ভযন্ত্রণায় ছটফট করছি। ঘুমোতে পারিনি। তোমার কাছে চলে এসেছি পরামর্শ করতে। তুমি তাড়াতাড়ি খোলো। ব্যাপারটাকে জরুরিভিত্তিক বিবেচনা করো। এই কথোপকথন থেকে স্পষ্ট হল উনি সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়।

কমলদার লাইন ভাবতে পারো! প্রকাশকে নেব, যোগেনকে নেব আর তুমি। ফাটাফাটি! কলকাতা দেখবে। বিশ্বের ইতিহাসে এরকম কাণ্ড কখনও ঘটেনি। আমি আর কী বলি! একজন গর্ভকাতর লেখকের পিতৃগর্ভ থেকে শিশুটিকে বার করার জন্য না-হয় আয়ার কাজ করলাম। কিন্তু সবটাই তো অবাস্তব। ১৯৮০-তে অফসেটে তিরিশ বাই চল্লিশ ইঞ্চি পোস্টারের খরচ সহজ ব্যাপার ছিল না। আর অফসেটে কমপক্ষে ১,০০০ না ছাপলে খরচ ওঠানো তো অসম্ভব। আর আমি জানি অভীক সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—এসবই তাঁর মনগড়া কল্পনা। মদ্যপান না করেও এঁরা চব্বিশ ঘণ্টার মাতাল।

আমি যত সম্ভব জল ঢেলে দিই এই অবাস্তব ধারণায়। পরিবর্তে বলি, ভাবনা খুব ভালো। একমাত্র সম্ভব হতে পারে যদি সিল্ক স্ক্রিনে সীমিত রঙে, সীমিত আকারে ছাপা যায়। তাহলে মানুষের কাছে যেমন গ্রহণযোগ্য হবে, তেমনই এর খরচ বা জোগাড়যন্ত্রে অসুবিধাটা হবে না। তিরিশ বাই চল্লিশ ইঞ্চি পোস্টার সাধারণ মানুষ কেউ কিনবেন না। আর কমপক্ষে একটি পোস্টারের জন্য প্রভূত পয়সা খরচ হবে। তা কেউ বহন করতে চাইবে না। সন্দীপনদা নিথর হয়ে গেলেন। পরে বললেন তবে তাই হবে, তুই মদত দে।

মনে মনে একটা স্বপ্ন লালন করেছিলাম, আমার সোপার্জিত টাকায় আমি বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব, শিল্পীগ্রামের মতো। সেটা আবছা হয়ে গেল। আমি আবার বাস্তবে হাঁটতে থাকি। এরইমধ্যে কখনও কোনওদিন শিপ্রা বাবার প্রিয়পাত্রী হয়ে গেল। আমরা সল্টলেকের স্বপ্ননীড় ছেড়ে কলেজ স্ট্রিটে চলে এলাম।

আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। তখন সুখে থাকি। মাঝে মাঝে সন্ধ্যায়, দিনের কাজ সেরে শিপ্রা ও আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে বসতাম। রাস্তা থেকে একচিলতে জমি, বেশিরভাগ মানুষই ওখানে গাছপালা লাগান। সেখান থেকে উঠে আসে তিনধাপ সিঁড়ি। তারপর ঘরের দরজা। আমরা প্রায় বসতাম সেই সিঁড়িতে। কারও কোনও কৌতূহল নেই। শহরের এত কাছে এরকম খোলা আকাশ, বিক্ষিপ্ত গাছগাছালি, পথচারীহীন রাস্তা। মাঝে মাঝে অজানা কোনও এক দিক থেকে উঠে আসা হাওয়া দোল দিয়ে যেত আমাদের শরীরে। সুখের অনুভূতি উপলব্ধি করতাম। মনে হত কত যুগের সম্পর্ক থেকে কুড়িয়ে পাওয়া আমার এই নারী। এখন যে চিরকালের জীবনসঙ্গিনী। আমার যৌবনতরঙ্গ যেন অবিরত খেলে চলেছে, আর রামধনুর সাত রং যেন অসংখ্য ফেনায়িত বুদবুদের মতো চারদিক আলোকিত করেছে, আমরা তখন যেন, সমাজ-সভ্যতা থেকে বহু দূরে, হয়তো কোনও অন্য গ্রহে।

একদিন সকালে শিপ্রার বাবা এলেন। আমাকে ভালোবাসতেন। খুব ত্রাস্ত হয়ে উদ্বেগ নিয়ে আমাকে জানালেন শুভা, তুমি কি খবর পেয়েছ? আজই চেষ্টা করো বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে। 'সঞ্চয়িতা' বন্ধ করে দিয়েছে সরকার। আজই টাকাপয়সা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করো। উদ্বেগ তাঁর যতটা ছিল, আমার ছিল না ততটা। এরকমই আমি বরাবরই। কিছু বন্ধুত্বে, কিছু সম্পর্কে বিশ্বাস করে আশ্বস্ত থাকি। ঠকেছি, হয়তো ঠকে চলেছি। কিন্তু আবেগ পাল্টাতে পারিনি। প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে ছবিজীবন শুরু করেছিলাম। কাজেই অর্থসঙ্কটের সবরকম অসহায়তা সত্ত্বেও নিজেকে ঠিক রাখতে আমি অভ্যস্ত হয়েছিলাম। আমার বাবা সেই যখন আমি পনেরো-ষোলো বছরের বালক, তখন ইউ বি আইয়ের কলেজ স্ট্রিট মার্কেট শাখায় আমার নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন, তখন থেকে হাতে কিছু অতিরিক্ত অর্থ পেলে জমিয়ে রাখতাম। তারপর থেকে তারুণ্য পার করে যৌবনে, অনিশ্চয়তা থেকে খানিকটা হয়তো নিশ্চিত জীবনের পথ অনুভব করেছি। স্কুলজীবন, আর্ট কলেজের জীবন থেকে পেশাজীবনে ঢুকে বিদেশপাড়ির সুযোগ, পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রদর্শিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। মনে হয়েছে ছবি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারব। বিদেশের সফল প্রদর্শনী, এখানকার ওজুরা পাওয়া ছবি, কখনও ম্যুরাল, কখনও পোর্ট্রেট, কখনও বাণিজ্যিক ছবি। একক কিংবা যৌথভাবে কাজ দেখিয়ে চলেছি, অর্থ রোজগার হচ্ছে, যতটা সম্ভব মিতব্যয়ী হয়ে টাকা গচ্ছিত রাখি ব্যাঙ্কে। তখন থেকে মনে মনে স্বপ্ন দেখি একটা কিছু গড়ব। বড় কিছু। ইচ্ছায় মাঝে মাঝে তা আকার নেয়। স্বপ্নে মাঝে মাঝে দেখি তা। অন্তরের গভীরে সেটাই আসে। নিজের বাড়িঘর, গাড়ি ততটা না। একদিন এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু জানায়, কেন তুই বোকার মতো ব্যাঙ্কে টাকা রাখিস। আমাদের এক বন্ধু আছে, যে এমন একটা সঞ্চয়ের ব্যবসা করেছে যেখানে টাকা গচ্ছিত রাখলে সে টাকা খুব তাড়াতাড়ি অনেক টাকা হয়ে যায়। আমাদের জীবনে টাকার খুব প্রয়োজন। হয়তো আমাদের সমস্ত কাণ্ডকারখানা অর্থনির্ভর। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে টাকার চিন্তা কোনওদিন আমার ভালো লাগেনি। হয়তো এই ধারণাটা আমার জিনবাহিত। অথচ লোভ-প্রলোভন থেকে তো আমি বিচ্ছিন্ন নই। বন্ধুর প্রস্তাবে অন্য বন্ধুকে জানা-পরিচয়ের জন্য আমি সম্মত হই। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তারও বন্ধু। তার প্রতিষ্ঠান। সেই প্রতিষ্ঠানটি হল 'সঞ্চয়িতা'। টাকা বাড়ে। বন্ধু খোঁজখবর নেয়। আর টাকা জমা দিতে বলে। ব্যাঙ্ক শূন্য করে গচ্ছিত রেখে চলি। বন্ধু আসে আর নিয়ে যায়। আর আমাকে প্রমাণপত্র দেখায়। কিছুদিন অন্তর নতুন নতুন প্রমাণপত্র দেখায়। আমার গচ্ছিত টাকার অঙ্কে অদ্ভুতভাবে শূন্যের পর শূন্য যুক্ত হয়। ক্রমশ বন্ধু হয়ে ওঠে আমার অর্থনৈতিক অভিভাবক। আমার বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্য যখন টাকার দরকার হয়, আমি বন্ধুকে জানিয়েছিলাম, কিছু টাকা আমি তুলতে চাই। তখনও বন্ধু জানিয়েছিল, এখন টাকা ভাঙাস না, তুই ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারবি। সত্যিই আমার বিবাহের সব আনুষ্ঠানিক খরচ আমি জোগাড় করতে পেরেছিলাম। বাবা কোনও সাহায্য করেননি। সঞ্চয়িতার টাকা ভাঙতে হয়নি। উতরে গিয়েছিল। কিন্তু সকালে শ্বশুরমশাইয়ের উদ্বেগপূর্ণ মুখ দেখে কীরকম যেন একটা অশুভ সঙ্কেত মনে হল। আমি সেদিন প্রথম ডালহৌসি চত্বরে 'ফার্ন লেন' নামের একটি গলি খুঁজে সঞ্চয়িতার অফিসে গিয়েছিলাম। সেই বন্ধুর বন্ধু, তার খোঁজ করতে। আমার সঙ্গে তার খাতির ছিল। বাদুড়বাগান অঞ্চলে সে থাকত। একাধিকবার সস্ত্রীক কোনও-না-কোনও অনুষ্ঠানে দেখা হত। এসবই তখন বন্ধুত্বের অছিলায় জনসংযোগ। তার দেখা পেয়েছিলাম। সে তার যুক্তিতে অনড়। কাগজে ছাপা ব্যারিস্টার স্নেহাংশুকান্ত আচার্যচৌধুরির কোনও মন্তব্য আমাকে দেখিয়ে বলেছিল, শুভা তুই নিশ্চিন্ত থাক। আমি তোর টাকার দায়িত্ব যখন নিয়েছি, তা কখনও মার যাবে না। আমি তো আছি। এ অভয়ে সন্তুষ্ট হয়ে আমি ফিরে আসি। টাকা লুপ্ত হয়ে যায়। বেশ কিছুকাল নানারকম অছিলায় ঘোরাঘুরি করি। আমার সম্বল একটি প্রমাণপত্র। যেটিতে লেখা ছিল, সঞ্চয়িতা নামক সংস্থার কাছে আমার ১,৮২,০০০ টাকা গচ্ছিত আছে। তলায়

স্বাক্ষর 'শম্ভুনাথ' কী যেন। আস্তে আস্তে আশা, স্বপ্ন আবছা হল। কিন্তু মরল না।

এটা আমার কথা। আমি সে সময়ে আমার স্বাভাবিক তাল, লয়ে, ছন্দে জীবনের দিনলিপি চালিয়ে গিয়েছি। ওই টাকাটা ১৯৭০-এর দশকে কম টাকা না। কাগজে জেনেছি, এমনকী কিছু পরিচিত বন্ধু হারিয়ে গিয়েছে, এমনকী আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন কিছু মানুষ এই বিপর্যয়ে। সে সময়ের অর্থমন্ত্রী, তাঁরই উদ্যোগে এ বিপর্যয় হয়েছিল। এ ভাবনায় আদর্শ আছে কিন্তু যে-কোনও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কিছু পরিশ্রম করতে হয়, যাতে সঠিক মানুষ শিকার না হন। টাকা তো টাকাই। অসংখ্য মানুষ যে টাকা দিয়েছেন, সে টাকা তো ভস্ম হতে পারে না। তিনি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী। কোনও দায়িত্ব নিলেন না। যাতে অন্তত সাধারণ মানুষের প্রাপ্য টাকা চলে আসে, তার কি কোনও চেষ্টা সরকারের করা উচিত ছিল না? যত দিন যাচ্ছে দেখছি, বড় বড় ভাষণ দেন। মানুষের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ না রেখে, মানুষের আসল পরিস্থিতি না জেনে, তত্ত্ব আউড়িয়ে সর্বনাশ করেন। মানুষ চিরকালই ভেড়ার মতো। কারণ, ভেড়ারাই সেভাবে প্রতিবাদ করতে জানে না। সময়মতো বলি হয়। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী সত্যিই মানুষকে বাঁচাবার কাজ করতেন যদি, সেই সঞ্চয়-ব্যবস্থায় টাকাগুলি বাজেয়াপ্ত করে, তাদের অসংখ্য ছড়িয়ে থাকা সম্পত্তি জড়ো করে, লগ্নিকারী মানুষজনদের অন্তত মূল টাকাটা ফেরত দেওয়ার প্রশাসনিক দায়িত্ব নিতেন। সেটা এমন কিছু অসাধ্যের কাজ ছিল না, ওইসব তাত্ত্বিক পন্ডিতেরা এসবের ধারেকাছে যান না।

মনে মনে একটা স্বপ্ন লালন করেছিলাম, আমার সোপার্জিত টাকায় আমি বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব, শিল্পীগ্রামের মতো। সেটা আবছা হয়ে গেল। আমি আবার বাস্তবে হাঁটতে থাকি। এরইমধ্যে কখনও কোনওদিন শিপ্রা বাবার প্রিয়পাত্রী হয়ে গেল। আমরা সল্টলেকের স্বপ্ননীড় ছেড়ে কলেজ স্ট্রিটে চলে এলাম। তখন বাবা-মাও একা। দাদা-বৌদি বাইরে। আমাদের গেরস্থালির নতুন আসবাব গুটিয়ে নিয়ে কিছু রেখে দিই

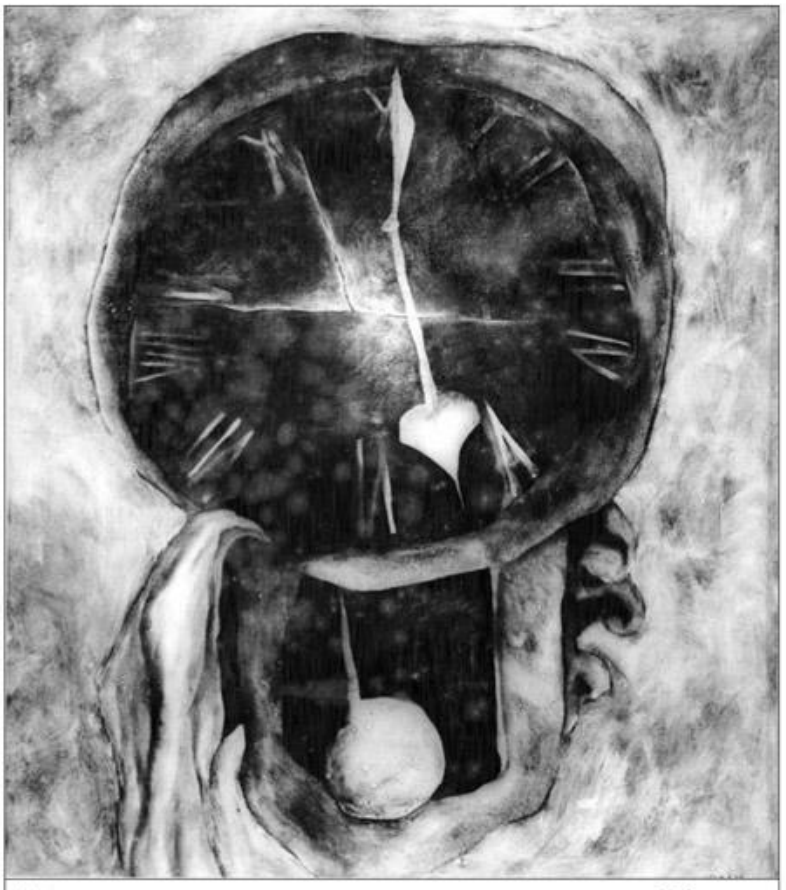

টাইম ৪০ × ৩৬ *শিল্পী: শুভাপ্রসন্ন*

লেকটাউনে শ্বশুরবাড়িতে, আর কিছু কলেজ স্ট্রিটে। বাবার আশ্রয়ে ভিন্ন সংসারী আমি। নিজের পছন্দমতো পেশা, সংসার করেছি। তাই পূর্বজীবন থেকে এ জীবন খানিকটা খাপছাড়া লাগত বাবার বাড়িতে। তবুও সেটুকু সময় শিপ্রা বাবা-মার ভরসার পাত্রী হয়ে কাটিয়েছিল সে আবাসে। আমি বরাবরই বাইরের জগৎকে যত সহজ, স্বাচ্ছন্দ্যের মনে করি, ততটা ঘরে নয়। আবেগ, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা কখনও দেখিয়ে করতে পারতাম না। ভিতরে, অন্তরে থাকত, দেখাতে পারতাম না। এরকম সময়ে আমাদের নিজস্ব কিছু নেই অথচ ছবি আঁকার জন্য দুজনেরই জায়গার প্রয়োজন। আমাদের পরিচিত মানুষজনদের আনাগোনা, ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনার উপযোগী পরিকাঠামো এ বাড়িতে কিছু ছিল না। এটা ছিল ডাক্তারের বাড়ি।

গ্যারেজের ওপরে যে জায়গাটি আমি ছবি আঁকার ঘর হিসেবে ব্যবহার করতাম, তার সামনে বাড়ির ভিতর থেকে এক ছোট চাতাল ছিল। সেই চাতালের ওপরটা আমি ছাউনি দিয়ে ঘর বানিয়ে নিয়েছিলাম। সে ঘর আমাদের বাড়ির সীমানার উঁচু যে দেওয়াল তার থেকে উঁচু ছিল না। সেই জায়গাটি সাকুল্যে চব্বিশ কী পঁচিশ ফুট হবে। ওটাই আমার বই রাখার, রং রাখার একটি ঘর, আর বন্ধু বা অতিথিরা এলে বসানোর জায়গা। পাইনকাঠ, চটের কাপড় দিয়ে সাজিয়ে ছিলাম ভিতর। বিদেশের বন্ধুরা তখন আনাগোনা করত। তারই মধ্যে আমার সেই ছোট্ট ছ'ফুট উঁচু সিলিংয়ের ঘরে একটু নান্দনিকতা ছিল। তখন আমি জার্মানিতে, হয়তো ড্যুসলড্রফ কিংবা এসেনে। বাবার কাছ থেকে একটি চিঠি পাই। খুব উদ্বিগ্ন হয়ে লিখেছেন। কর্পোরেশন থেকে নোটিশ এসেছে আগামী মাসের গোড়ায় শুনানি। তোমার

মজুর হয়ে গেলাম আমি। দিনরাত পড়ে থাকতাম ওর সঙ্গে। কখনও ইঁট বওয়া, কখনও এটা-ওটা কোদাল দিয়ে ঠিকঠাক করা, আর তাছাড়া ছেলেবয়েস থেকে কোনও কিছু গড়ে-ওঠা দেখতে এত ভালো লাগত!

ঘরটি বেআইনি। ওরা ওটা ভেঙে দেবে। যদি তুমি স্বেচ্ছায় না ভাঙো, তাহলে ওদের লোক ভাঙতে আসবে। আমাদের সেজন্য টাকা দিতে হবে। তাড়াতাড়ি চলে এসো, এর সুরাহা করো। এসবে আমার কিছু করণীয় নেই। আমি নির্ধারিত সময়েই ফিরে আসি, তখনও হাতে কিছু সময় ছিল। সাহস নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ভদ্রলোকের সামনাসামনি হই। তাঁকে জানাই, আমি ছবি আঁকি, আমার ছবি আঁকার জন্য কোনও নিজস্ব জায়গা নেই। এ অংশটি বাড়ির ভিতরে। কোনও প্রতিবেশীর অসুবিধা না করে আমাদের সীমানা-পাঁচিলের মধ্যে এই ছোট্ট অংশটি ঢেকে নিয়েছি। এটা যদি আমায় মার্জনা করেন, তাহলে আমার ছবি আঁকতে সুবিধে হয়। ভদ্রলোক গম্ভীর আবেগবর্জিত চেহারায় আমার কথা শুনলেন, কিন্তু কোনও মন্তব্য করলেন না। ফিরে আসি মনখারাপ নিয়ে। সাজানো বই, ছোটখাটো সরঞ্জাম আর খাঁজখোপর অনুযায়ী পাইনকাঠের যেসব আসবাব করেছিলাম, সেগুলো সরাতে থাকি। মন চায় না। চোখে জল আসে। সেসময় শিপ্রার সঙ্গে আইনানুগ সম্পর্ক স্থাপন হয়নি। নানা কারণে, নানান কার্যক্রমে জড়িয়ে থাকার জন্য আমার সামাজিক পরিচিতি ছিল প্রায় তারুণ্য থেকে। কিন্তু সে পরিচিতি তো ক্ষমতার অধীশ্বর করে না। আমি জানি, আমি কী নিঃসহায়। ১৫-১৬ দিন পরে একটা চিঠি আসে। কর্পোরেশনের সিলমোহর দেওয়া। খুলে পড়তে থাকি। আইনের চিঠির শব্দ চট করে বুঝতে পারি না। এছাড়াও অমঙ্গলের আশঙ্কা এতটাই আমায় হতাশাগ্রস্ত করে রেখেছে যে, সব অক্ষর যেন অশুভ সঙ্কেত মনে হচ্ছে। একজায়গায় লেখা ছিল কিছু টাকার অঙ্ক। ২২৭ কী ৩২৭ ভুলে গিয়েছি। আমার মনে হল, তারা ভেঙে দেবে তার জন্য এই টাকা আমাকে জমা দিতে হবে। আমি কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে আবার পড়ি। আসলে তা নয়। ওই জায়গাটি তারা বাড়ির মূল নকশার মধ্যে সংযোজিত করেছে, সেজন্য নকশার খরচ হিসেবে এই টাকা জমা দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। জায়গাটি তারা আইনসম্মত করে দিয়েছে। বাবা খানিকটা তৃপ্ত হয়েছিলেন।

এরপরে আর একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেটা আমাদের বিবাহের পর। বাবার সঙ্গে শিপ্রার সমঝোতা হয়ে গিয়েছে। আমরা তখন পিতৃগৃহে ফিরে এসেছি, কিন্তু আমাদের নির্দিষ্ট কোনও ঘর নেই। অথচ, আমাদের বাড়ির পিছনে একটা ছোট একতলা বাড়ি ছিল। বাবা প্রথমে ওটাই তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীকালে সামনের বাড়ি তৈরি হয়। সেই জায়গায় তিনি থাকতে দিয়েছিলেন কাউকে। যেমন হয়, সেটা প্রায় বেহাত হয়ে গিয়েছিল। অথচ যাঁরা ছিলেন, তাঁরা বৈধভাবে ছিলেন না, দখল করে রেখেছিলেন। সে নিয়ে কখনও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এদিকে বাড়িতে দাদা চলে এলে আমাদের জায়গা হত গ্যারেজঘরে। আমি সাজিয়েগুছিয়ে সেখানে ছাপাই ছবির মেশিন, ছবি আঁকা আর দাম্পত্য জীবন কাটাতাম। বাবার ভিতরে ভিতরে একটা ইচ্ছে ছিল, আমরা যদি পিছনের পড়ে থাকা অংশটির আইনানুগ অধিকার নিয়ে ওখানে বসবাস করতে পারি! আমার এক ছাত্রীর বাবা উকিলবাবু, তাঁকে এই সমস্ত বলি। তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে যা-যা করণীয় করেন। আশ্চর্য, খুব অল্প দিনের মধ্যে কোর্ট থেকে সে জায়গা দখলকারী ভদ্রলোককে ফাঁকা করে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ওঁর সংসার এখানে ছিল না। কলকাতার অদূরে বাড়ি তৈরি করেছিলেন। উনি মাঝেমধ্যে থাকতেন। যাই-হোক এই ভাবে সেই পিছনের অংশটি বাবার অধীনে চলে আসে। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ভাবতেও পারিনি সেটিকে রদবদল করে নানা সংযোজনায় একেবারে ভিন্নরূপে তৈরি করতে পারব। তখন হাতে প্রায় কিছুই ছিল না। কিন্তু ডুব দিলে কিছু না কিছু পাওয়া যায়। কিছু পাওনা টাকা পেয়েও গেলাম, একইসঙ্গে অনেকগুলি ছবি বিক্রি হল। এভাবে বেশ কিছু টাকার সুরাহা হল। এইসব মিলেমিশে পৌনে এককাঠা জমিতে ক্ষুদ্র প্রাসাদ তৈরি হল। সে প্রাসাদ তৈরির পিছনে আমাদের বাড়ির পুরনো এক মজুর, প্রায় আমারই সমবয়সি সরফুদ্দিন, সে পাকা মিস্ত্রি হয়ে উঠেছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পরিশ্রমী, পয়ঃপ্রণালী থেকে পাথর বসানো সবেতেই অদ্ভুত দক্ষ। মজুর হয়ে গেলাম আমি। দিনরাত পড়ে থাকতাম ওর সঙ্গে। কখনও ইঁট বওয়া, কখনও এটা-ওটা কোদাল দিয়ে ঠিকঠাক করা, আর তাছাড়া ছেলেবয়েস থেকে কোনও কিছু গড়ে-ওঠা দেখতে এত ভালো লাগত! নেশার মতো তা ছিল আমার কাছে। কোথায় কম দামে কী পাওয়া যাবে, এসব ছুটে ছুটে সংগ্রহ করতে লাগলাম। যেমন হয়, সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী যাঁরা আমাকে জন্মাতে দেখেছেন, যাঁদের আমরা আত্মীয় জ্ঞান করতাম, তাঁরা এই বেড়ে ওঠা মানতে পারলেন না। সামনে প্রশংসার মধু ছড়াতেন। অন্যদিকে কর্পোরেশনে জানিয়ে দিলেন, আমি বোধহয় বেআইনি কিছু করেছি। বেআইনিটা এই ছিল যে, বাবার পরিকল্পনায় বাড়ির নকশা তিন তলার জন্য অনুমোদিত ছিল তৎকালীন সময়ে। কিন্তু পুনর্বার অনুমোদন আমি নিইনি। এজন্য কর্পোরেশন আইনানুগ ব্যবস্থা নিলেন। আগের অভিজ্ঞতা ছিল। ওই সাহসে ভর দিয়ে আমি ছোটখাটো ফাইন মেনে নিয়ে কাজ চালিয়ে গিয়েছিলাম। বাগান, ম্যুরাল, ঠিকঠাক আসবাব, পুরনো ফার্নিচার, পুরনো কাস্ট আয়রনের জাফরি তায় লাল-নীল কাচ যুক্ত করে নিলাম। ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পুরনো বার্মা সেগুনের জানলা সংগ্রহ করে পৌনে এককাঠায় গড়ে তুলেছিলাম প্রাসাদ।

ক্রমশ

পুরনো অ্যালবাম

কালান্তর

সম্পাদকীয়

সার্বজনীন পূজা:

সম্বৎসরে 'বছরকার দিন' একবার মাত্র আসে। বাংলা এবং বাংলার বাইরে সমস্ত বাঙালী এই কটা দিনের জন্য সারা বৎসর দিন গোণে। ছুটী, উৎসব, শরতের সোনালী দিন— বাঙালীর মনে আনন্দের লহর তোলে। এ বৎসরের সেই রঙীন, আনন্দোদ্বেল দিনগুলি আসন্ন। পাড়ায় পাড়ায় চাঁদা আদায়কারীদের বিল বই, ছোট বড় রাস্তার মোড়ে লাল শালুর ওপর সাদা হরফে সার্বজনীন পূজার ঘোষণা অবশ্য অনেক পূর্বেই দৃষ্টি-গোচর হয়েছে। দল-গঠন, কমিটি নির্বাচন, নির্বাচন উপলক্ষে দলাদলি, অর্থ-গৌরবে সভাপতি মনোনয়ন, প্রধান-অতিথি নিমন্ত্রণ, ইত্যাদি পর্বগুলিও যথাকালে সম্পন্ন হয়েছে। এখন প্রধান কার্যটিই বাকী; অর্থাৎ পূজা— এবং তদুপলক্ষে আনন্দ উপভোগও বিতরণ।

পুরাতন বিচার-পদ্ধতির নিরীখে যদি আজকের সার্বজনীন পূজার বিচার করি, তাহলে প্রধান বিষয়টিই অত্যন্ত অপ্রধান এবং গৌণ বলে প্রতিভাত হবে। এতে আমরা ক্রুদ্ধ হয়েছি মনে করলে ভুল হবে; দুঃখিত হয়েছি শুধু। কারণ, প্রচলিত রীতি অনুসারে সামর্থ্যের অধিক চাঁদা, স্মরণ করে রাখার বেশি স্থানে দিয়ে, উপরোধ অনুরোধের মর্যাদা আমরাও রক্ষা করেছি।

পূর্বে দুর্গাপূজা সাধারণত গ্রামের জমিদার, শহরে বনেদী পরিবার এবং নগরে ধনীদের গৃহে অনুষ্ঠিত হ'ত; হিন্দুধর্মের অনুসৃত আচার অনুযায়ী, জাতিনির্বিশেষে সর্বসাধারণের যে পূজায় অধিকার ছিল না। গৃহ-কর্তা এবং উচ্চবর্ণের প্রতিবেশী পদাধিকার বলে সেখানে স্থান পেতেন। দীয়তাং ভুজ্যতামের ব্যবস্থা অবশ্য ছিল বহু ক্ষেত্রে। তবু, যতদূর জানি পূর্বোক্ত বৈষম্য দূর করবার জন্য প্রথম সার্বজনীন পূজার প্রবর্তন হয়েছিল। এই প্রবর্তন কালক্রমে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়ে ছোট শহরেও এর ঢেউ এসে পৌঁছল। অনেক ক্ষেত্রে পঙক্তি ভোজনেরও সূত্রপাত করা হয়েছিল জাতি-নির্বিচারে। এই পটভূমিকায় যদি বিচার করা যায়, তাহলে স্বীকার করতেই হয় যে, সার্বজনীন পূজার উদ্ভবের সময়েও পূজার ব্যাপারটা প্রধান ছিল।

প্রথম যুগে সার্বজনীন পূজার বিরুদ্ধে নানা আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল সনাতন-পন্থীদের তরফ থেকে। সনাতনপন্থীরা আজ যদি বিশ্লেষণ করে দেখেন, তাহলে আশ্বস্ত হবেন এই দেখে যে 'সার্বজনীন পূজা' সম্পূর্ণ misnomer-এ দাঁড়িয়েছে! এ পূজা তাঁদের অর্থে পূজা তো নয়ই এবং কোনও অর্থেই সার্বজনীনও নয়।

চাঁদা সংগ্রহকারীদের অত্যাচার বীমার দালালের বিভীষিকাকেও হার মানিয়েছে। প্রতিমাকে বৃহৎ করার প্রতিযোগিতায় অর্থের অপচয় কারও অগোচর নয়। সুদৃশ্য মণ্ডপ নির্মাণ করে, প্রধান-অতিথিরূপে লাট বা মন্ত্রীদের বরণ করে, পুস্তিকা প্রকাশ দ্বারা পূজাকমিটির সভ্যদের ফিরিস্তি প্রচার করে এবং সর্বশেষে আঞ্চলিক ব্যাণ্ডপার্টি সহযোগে (দেশী সানাইওলাদের যুগ আর নেই) মহাসমারোহে 'বন্দেমাতরম্' 'জয় হিন্দ' চীৎকারে আকাশ ফাটিয়ে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন ক'রে যে কর্তব্য সমাধা করা হয়, — সেখানে শত আয়োজনের ব্যস্ততায় দেবী দুর্গা গৌণ হয়ে পড়েন। দেবীর দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই! বৎসরান্তে কৈলাস শিখর থেকে পিত্রালয়ে আতিথ্য গ্রহণ করতে এসে তিনি যখন দেখেন শ্রীকৈলাসনাথ কাটজু (অথবা আর কেউ) প্রধান অতিথিরূপে বিরাজিত, তখনও যে তিনি দ্রুত পলায়ন করেন না— সে বোধ করি, আমাদের সঙ্গে বহু দিনের আত্মীয়তাজনিত স্নেহের জন্যই। মৃৎ-প্রতিমা নেহাৎ-ই স্থাণু, ইচ্ছা থাকলেও মণ্ডপ ত্যাগ করবার উপায়ও নেই।

সুতরাং এই পূজা নিয়ে আমরা যতই কলরব করি না কেন, একে পূজা আখ্যা দেওয়া যায় না। এবং আত্ম-পূজার আড়ালে যে কমিটি সদস্যগণ দেবী-পূজা সারেন, তাঁদের মন্ত্রগুপ্তি এতই অসাধারণ যে তার সঙ্গে সর্বসাধারণের কোনও যোগ থাকে না।

পূজার সঙ্গে সকলের যোগ না থাকা ততটা আক্ষেপের কথা হত না যদি এই উপলক্ষে সর্বসাধারণ আনন্দের কোন অংশ পেতেন। আনন্দের সময়ই বটে! পূজায় নব-বস্ত্র পরিধানের রীতি আছে। শুধু পরিধানের আনন্দ যাঁরা পাবেন, ক্রয় করবার দায়িত্ব যাঁদের নেই সেই নিষ্পাপ শিশু ও অলঙ্কার-প্রিয় স্ত্রীলোকের ভাগ্যের ঈর্ষ্যা করি। কিন্তু কনট্রোলের নানা কায়দায় পর, যে রোধ করবার জন্য কনট্রোল, তাকে স্বীকার করে ব্ল্যাকমার্কেট দরে বাজারে কাপড় কিনতে হয় যাদের, তারা এই পর্বে সুখ পাবেন কোন দিকে জানি না। খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যের কথা না তোলাই ভালো। এবম্বিধ নানা দুখ-দুর্গতির মধ্যেও যাঁরা পূজায় দরাজ হাতে খরচ করে একদিনের পলান্ন ভোজনের পর দু মাস অর্ধাশনে থাকার ব্যবস্থা করবেন,— তাঁদের আমরা সাধুবাদ দিই। বহু দুঃখের মাঝে উচ্চমূল্যে আনন্দ ক্রয় করার এমন সুন্দর উদাহরণকে হেয় করবার কোনও অভিলাষ আমাদের নেই। সনাতন পদ্ধতি অনুযায়ী যাঁরা দুঃখের মূল্যে আনন্দ কিনছেন, তাঁরা নিঃসংশয়ে অসাধারণ ব্যক্তি।

তবু, কী যেন মায়া আছে শরতের সোনালী আলোতে, কী মোহ আছে মেঘাস্তরিত নীল আকাশে। কলকাতার ইঁট-কাঠ-লোহা-লক্কড়ে ভরা শহর জন-বাহুল্যে উপচীয়মান,— এখানে ঘরে তোলা আউশের নির্ভরতা নেই, নেই আমনের আশু প্রত্যাশা, অথচ শরতের মধুর দিনে কেমন লঘু প্রসন্নতা সঞ্চারিত করে মনের মধ্যে। কেমন হালকা বোধ করে মানুষ। প্রবাসী ঘরে ফিরতে চায়, গৃহবাসী ছুটীতে বিদেশ দেখবার জন্য চঞ্চল হয়। ক্ষীণ সঞ্চয়ের বিনিময়ে অনেক কিছু কেনবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা হয়। তাই দোকানে দোকানে নীয়ন সাইন, ফ্লুয়োরেসেন্ট ল্যাম্পের আলোয় অদ্ভুত মায়ায় পড়ে সকলে সওদা করতে ব্যস্ত হন। পূজার আনন্দ তাই দোকানদারের, এবং তার শো-রুমটিই সার্বজনীন— সেখানে সর্বজনের অবাধ গতায়াত।

প্রতাপকুমার রায় সম্পাদিত, প্রকাশিত ও মুদ্রিত 'কালান্তর' ভাদ্র, আশ্বিন ১৩৫৫ থেকে পুনর্মুদ্রিত।
বানান অপরিবর্তিত। সৌজন্য: রুবি রায়।

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রাজ্যপাট

সুব্রত মুখোপাধ্যায়

পূর্বানুবৃত্তি

আদালতে ব্যক্তিগত হাজিরা দেওয়া থেকে ছাড় পেয়ে অসময়ে বাড়ি ফিরে এলেন আলিপুর সদর মহকুমার এস ডি ও বিমল। স্ত্রী সীমা ঘুমোচ্ছিল। বিমলকে দেখে কিছুটা অবাক হয়। মায়ের ঘরে ট্রানজিস্টারে কিশোরকুমারের গান চলছে। মেয়ে মুনি কলেজে। একটু বিশ্রামের তোড়জোড় করতে না করতেই জেলাশাসকের ফোন। বিষ্ণুপুর-১ নম্বর ব্লকে অকাল-কালীপুজোকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গাড়িতে উঠে বসলেন বিমল। ড্রাইভার যোগেশের পাশের সিটে বসল বিমলের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বুদ্ধদেব। অকুস্থলে পৌঁছে বিমল বুঝলেন, এ তল্লাটে ধর্মের নামে অসম্প্রীতির উসকানিতে মদত রয়েছে রাজনৈতিক দলেরও।

২

পথচলতি ছেলের পকেটে ট্রানজিস্টারে শচীনকর্তার ভাঙা ঢোলের গান আস্তে আস্তে দূরে সরে যায়। এদিকে যুবক চাঁদ মহম্মদ ফুটবল খেলার সম্প্রীতির কথা বলেই চুপ করে যায়। তার বলি দেওয়া গরুর হাড়, কালীর বেদি, কথাগুলো সামান্য পরেই কোন অলীকতার পথ দেখে। কেন না সামনে বিতর্কমান মানুষের দল এইসব বাজে আর অকাট তত্ত্বে মন দিতে নারাজ। মসজিদের ইমামসাহেব আবার কথা বলেন গম্ভীর গুরুতর স্বরে, তাহলে বিষয়টা কী হবে স্যার? মানে, আপনি কী সাব্যস্ত করলেন?

বিমল শান্ত গলায় বলে, দু'পক্ষকে বলছি— কাজটা দু'তরফই ভালো করছেন না। ধর্মকর্ম করবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু এইসব হাড়-গোড়, তারপর এই নিয়ে ঝগড়া কি সভ্য দেশে হয়!

পিছন থেকে কে একজন মন্তব্য ছোড়ে, মানুষের চেয়ে তার হাড়-গোড় দামি।

বিমল ইচ্ছে করেই বক্তার দিকে ঘাড় ঘোরায় না। তাহলে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে যাবে। পঞ্চায়েত মেম্বার রাখাল সরকার কথা বলে এবার: আমি এক কথাই আবার বলছি স্যার। এ ঘটনার পিছনে লোক আছে। পলিটিক্স আছে।

ইমামসাহেব গলা তোলেন, আমারও তো ওই কথাই হুজুর।

বিমল দু'জনার দিকেই চোখ বোলায়, তাহলে তো মিটেই গেল। আপনারা দু'পক্ষই যখন জানেন— তখন ওই তৃতীয় পক্ষ— মানে, আপনাদের কথায় পলিটিক্সকে সরিয়ে আলাদা করে দিন। তাহলেই সব ঝামেলা মিটে যাবে।

সংক্ষিপ্ত জমায়েতে অমনি স্তব্ধতার আঁচড় পড়ে। কে যেন অলখে মায়াকাঠির টান বুলিয়ে দেয়। শুকনো পাতা ওড়ার নির্জনতা এক মুহূর্তে এখানে মূর্ত হয়ে ওঠে। এতগুলো মানুষ গাঁতি দিয়ে রইলেও বুঝি সকলেই নিজের নিজের একান্ত খোঁড়লে সেঁধিয়ে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে আর নিজের অজান্তে। একে কি অচেনা বোঝাপড়া বলে, না আর কিছু!

মসজিদের মাথায় একজোড়া দাঁড়কাক এসে বসে কোথা থেকে। তারা ওখান থেকে ঘাড় ঘুরিয়ে নীচের দিকে দেখে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে। তাদের চোখেও কুতূহলী আলো। তাদের মন বলে— এরা তো মানুষ। চার হাত-পাধারী মানুষ। দেহে চোখ, নাক ইত্যাদি সবই আছে। তাহলে কথায় কথায় এত দ্বন্দ্ব কেন? দাঁড়কাক একজন আর একজনকে ডেকে কয়, ওরে আমরা তো ঝিরকুটে কালো। কই, আমাদের মধ্যে তো ঝামেলা হয় না।

— কে বললে হয় না। আমরা যদি সাদা-কালো কাকের দলে যাই, তাহলে তো ওরা আমাদের ধাওয়া দেয়।

— একেই কি বর্ণবিদ্বেষ বলে?

— তাই তো বলা উচিত।

— মানুষে-মানুষে, প্রাণীতে-প্রাণীতে এই আক্‌চা-আক্‌চি যাবে কদ্দিনে শুনি?

— কোনওদিনই যাবে না। সৃষ্টির কাল থেকে এ জিনিসও সৃষ্টি হয়ে বসে আছে। ঠিক আমাদের পিঠের দুটো ডানার মতো। একটি ডানা না থাকলে আমরা মাটিতে পড়ে যাব। মানে, ওই ভারসাম্যটি থাকবে না।

— খুব কঠিন কারবার রে ভাই। তোর মাথায় এত প্যাঁচ খেলে কেমন করে?

— প্যাঁচ তোর মাথাতেও আছে, কিন্তু খেলাস না।

— জানি না তো।

— আরে বাপু, খেলাতে জানলেই খেলে। তোর হল আলসের মরণ আর কী।

ইতিমধ্যে বিমল লক্ষ করেছে, তারা কেউ রাজনীতি বলেনি। তার বদলে 'পলিটিক্স' উচ্চারণ করেছে। আসলে বিষয়টা হয়তো এরকমই সত্যি যে, রাজনীতির স্বদেশিয়ানা বহুকাল সরে গিয়েছে। পুরো ব্যাপারটাই এখন ধার করা অচেনা এক ধোঁয়াশাগ্রস্ত বিশ্বাসের ধাপ্পা। যারা নিজেরা ধাপ্পা বা ঠগের বলি হয় একসময়, তারাই অপরকে ধাপ্পা দেওয়ার ব্যাপারে পাকাপোক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এরকমটাই চলে আসছে বহুকাল ধরে।

পঞ্চায়েত মেম্বার রাখাল এবার বলে ওঠে, স্যার, আমি যেহেতু রাজনীতির সঙ্গে সোজাসুজি জুড়ে আছি, তাই ব্যাপারটা ধরতে পারি। আসলে হিন্দু-মুসলমান বলে এখানে কিছু নেই। পিছন থেকে কলকাঠি নাড়া হলে যা হয় আর কী।

বিমল বলে, আমি তো সেই কথাটাই বলছি আপনাদের।

ইমাম কথা বলেন, উনি তো পলিটিক্স করেন বলেই এমন সব ঘুরপ্যাঁচ কথা কইছেন স্যার। আপনি আপনার মতো বিচার করুন।

বিমল শুধু বলে, ঠিক কথা।

রাস্তায় উঠে বিমল সেল ফোনে ডি এম ম্যাডামকে ধরল। তাঁর উদ্বিগ্ন স্বর, কী হল এস ডি ও-সাহেব?

বিমল গলা চেপে বলে, আপাতত তো ঠিক আছে। তবে আমরা এখান থেকে ফিরে গেলে আবার ব্যাপারটা রিভাইভ করতে পারে। আসলে পিছনে পলিটিক্স থাকলে যা হয় ম্যাম।

— তাহলে কী ভাবছেন?

— ভেরি সিম্পল ম্যাম। এখানে ১৪৪ করে দিচ্ছি। কোনও অ্যাসেম্বল মানে ভিড়-জমায়েত হবে না। অ্যান্ড পিস টু বি মেনটেন্ড। আর এখানে পুলিস পিকেট থাকবে।

ডি এম শুধু বলেন, লোকাল থানায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট রেখে দিন। উনি ল অ্যান্ড অর্ডার দেখবেন।

বিমল এবার ফোনে ধরে কালেক্টরেটের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চঞ্চল পালকে। তাকে জানিয়ে দেয় অর্ডারের কথা। চঞ্চল কিঞ্চিৎ গাঁইগুই করতে বিমল তাকে বুঝিয়ে দেয় এটা ডি এম-এর অর্ডার। আরও বলে, সে যেন এখুনি এখানে চলে আসে। বিমল অফিসে গিয়ে অর্ডার ইস্যু করে থানায় তার কাছে পাঠিয়ে দেবে।

যাওয়ার আগে বিমল এস ডি পি ও এবং থানার ও সিকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে যায়।

একটা জায়গা হঠাৎ অন্য জায়গা হয়ে যায় বিনি নোটিসে। বাংলোয় যাওয়ার রাস্তায় ডি এম— বাংলোর পাঁচিলের মুখোমুখি কতিপয় নড়বড়ে ঘর। ইট-বালির গাঁথনি আর মাথায় টালি চড়ানো। ওটা জবরদখল এলাকা। আর দখলকারীরা সবাই ডি এম অফিসের পিয়ন কিংবা মজদুর। কত বছর ধরে এই পরিবারগুলি যে পুরুষপরম্পরায় এই সরকারি জমিতে দখলিস্বত্ব গেড়ে বসে রয়েছে, তার হিসেব কেউ রাখে না। এমনকী ডি এমের নাজিরখানায় সমস্ত নামধাম-সহ বিবরণ লেখা থাকলেও বছরের পর বছর এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। একরকম অলিখিত আইনেই এরা জেলাশাসকের পুষ্যি আর বোঝা হয়ে এখানে রয়ে গিয়েছে। জেলার কর্তা বদলান। এরা কিন্তু স্থান বদলায় না। সকলেই যে গরিব মানুষ তা নিয়ে কোনও তর্ক নেই। তবে বিষয়টা কিছুতেই আইনে ফেলে কেন যে যুক্তিযুক্ত করা যাচ্ছে না, সেটাই রহস্যের।

এই এলাকার ঠিক সামনে একটি বহু পুরনো আর গম্বুজ ধাঁচের একতলা আর বেশ উঁচু ঘর আছে। ওটি বুনো জংলায় ঘেরা। ফলে কারও বাস করার উপায় নেই। এই পরিত্যক্ত ঘরে পাড়ার গোরু-ছাগল ঠাঁই নেয়। এর সামনে দিয়ে যেতে যেতে বিমল হঠাৎ দেখতে পায় হালিশহর বারেন্দ্রগলির এক খণ্ড-ছবি। সেই কবেকার প্রাচীন শিবমন্দির চার-চারটি। তারা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ভেতরে ভগ্ন শিবলিঙ্গ ভুঁয়ে গড়াগড়ি। চৌদিকে ছাগলনাদি। কিছু পোড়া সিগারেট-বিড়ি। কন্ডোম-প্যাকেট।

ছবিটা একবার ঝলসে উঠেই সরে যায়। বিমলের মনে হয় কতদিন যে ও-বাড়ি যাওয়া হয় না। বাবা মারা যাওয়ার পর কয়েকবার গেলেও সেরকম নিয়ম করে যাওয়া আর হয় না।

বাংলোর দিকে গাড়ি ঢোকার আগেই বিমল যোগেশকে বলে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে। সে অফিস যাবে। যোগেশ তার চঞ্চল মতিগতি জানে বলেই ব্রেক কষে এবং সামনের মোড় থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নেয়।

একতলার লিফটের সামনে অফিসের পিয়ন আজাহার দাঁড়িয়ে। হাতে কী যেন মোড়া ঠোঙায়। গায়ে তেল লেগে। অন্যমনস্ক বিমল লিফটে ঢুকে পড়ে। আজাহারও। বুদ্ধদেবের হাতে ধরা বিমলের অ্যাটাচি। সে দেওয়াল ঘেঁসে। পাশ থেকে আজাহার তার স্বাভাবিক বিনয়ী গলায় বলে, স্যার একটা কথা বলব?

বিমল ভ্রু নাচায়।

— স্যার ওখানকার ব্যাপার কি মিটল?

বিমল গম্ভীর গলায় বলে, সহজে মেটবার নয় আজাহারবাবু।

আজাহার বলে, স্যার উড়িয়ার দোকানের খাস্তা কচুরি ছিল। দুটো খাবেন?

বিমল হেসে ফেলে, আপনি খান। আমার এখনও খিদে পায়নি।

আজাহার নিচু গলায় বলে, সেই কখন বেরিয়েছেন—

করিডোর পার হতে হতে হঠাৎ ইলেকশনের প্রকাণ্ড ঘরে ঢুকে পড়ল বিমল। বাছাবাছা অফিসার আর ক্লার্ক এখানে গুরুগম্ভীর কাজে মজুত। বিশেষ করে এ ঘরে আছে জেলার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র যাদবপুর। এটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্র।

ঘরের একেবারে এক কোনে বড় টেবিলে ইলেকশন বড়বাবু কেষ্টবাবু। কৃষ্ণচন্দ্র হালদার মানুষটি বামপন্থী ইউনিয়নের সদস্য হলেও শার্টের কলারের তলে আড়াল করা কণ্ঠির মালা। অতিমাত্রায় সৎ, সেন্টিমেন্টাল আর সরলসিধে এই মানুষটি। একই সঙ্গে নিরামিষ খান। বাইরের খাবার ছোঁন না। তবে তাঁর প্রধান দুর্বলতা হল দলের লোক তথা সহকর্মীদের কথায় চলা। নিজস্ব কোনও মতামত নেই। কেমন সদাই হাস্যমুখে, কোনও রাগঝাল নেই।

বিমল তাঁর সামনে দাঁড়াতেই তিনি তড়াক উঠে দাঁড়ান। বিমল ওপাশে যথারীতি সরিয়ে রাখা টিফিন-প্যাকেটের দিকে আঙুল তুলে বলে, কী হল, খাননি?

কেষ্টবাবু ঝকঝকে দন্ত বার করে বলে ওঠেন, খেয়েছি স্যার। চিড়াভাজা আর কলা। আমি তো বাড়ি থেকে টিফিন আনি স্যার।

— তাহলে ওই প্যাকেটটা? ফেলে দেবেন বুঝি!

কথায় কথায় আবেগপ্রবণ হওয়া মানুষটির চক্ষু অমনি ছলছলায়। গলা কাঁপে।

— স্যার আপনি তো সব জানেন। আমার ভাইপোটা জেগে বসে থাকে যে। এটা ওর জন্য। ও তো হাঁটতে পারে না স্যার।

বিমল আর কথা বাড়ায় না। বিকলাঙ্গ ভাইপোটির জন্য কেষ্টবাবুর কী যে দুর্বলতা! ওঁর কাছেই থাকে। হুইল চেয়ারে স্কুলে যায়। কেষ্টবাবুই ওকে নিয়ে যান। বিকেলে ওঁর ভাইয়ের স্ত্রী নিয়ে আসে।

ওদিক থেকে প্রীতিময়বাবু গলা তুলে ডাকেন, স্যার, কাইন্ডলি একবার এদিকে আসবেন?

বিমল এগিয়ে যায়, কী ব্যাপার প্রীতিবাবু, রোল-এর কাজ কি চলছে?

ইলেক্টোরাল রোল-এর কাজ এখন তুঙ্গে। আর দু'-তিনদিনের মধ্যেই কম্পিউটারে যাবে। কোম্পানির লোক তাগাদা দিচ্ছে।

প্রীতিবাবু রোল-এর একটা বান্ডিল খুলে ধরেন, স্যার, এখানে তিনশো বারো জন ভোটারের নামের পাশে ভোটার কার্ডের নম্বর পড়েনি। এগুলো এখানে বসিয়ে তারপর প্রেসে দিতে হবে।

বিমল মন্তব্য করে, মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্রে এমন ভুল! অবজার্ভাররা তো এলেন বলে। জানতে পারলে একেবারে মুণ্ডচ্ছেদ।

অফিস-চেম্বারের দিকে যেতে যেতে

পকেটে রাখা সেল ফোন বেজে ওঠে। বিমল দেখে একটি অচেনা নম্বর।

— হ্যালো।

— স্যার, একটু ট্রাবল দিলাম।

— কে বলছেন?

— আমি বেহালা ওয়েস্ট কেন্দ্রের একজন ভোটার বলছি। নাম আদিত্য মুখার্জি।

— হুঁ।

বিমল চেম্বারে ঢুকে টেবিলে পেতে রাখা ডাক-ফাইলে চোখ রাখে। ওদিকে সেল ফোন কথা বলে, স্যার, আপনাকে এভাবে বলা উচিত নয়। তবু বাধ্য হয়েই—

— তাড়াতাড়ি বলুন।

— আসলে, আপনার কোর্টে আমার একটা ভাড়াটে উচ্ছেদের মামলা আছে।

— এ ব্যাপারে কোনও কথা আমি বলব না। সাবজুডিস ব্যাপারে কি এভাবে কথা বলা উচিত?

— স্যার, আমি আপনার জুরিসডিকশনের চাইল্ড ডেভলপমেন্ট প্রোজেক্টের একজন রিটায়ার্ড ক্লার্ক।

— তাহলে তো আপনি আইনকানুন সব জানেন।

— স্যার, ক্ষমা করবেন। একান্ত দায়ে পড়েই—

ফোন বন্ধ করে বিমল ডাক দেখায় মন দেয়।

দরজা ঠেলে ঢোকে আজাহার। তার হাতে একটি তৈলাক্ত ঠোঙা। টেবিলে সলজ্জে নামিয়ে রেখে বলে, সার উড়িয়ার দোকানের দুটো কচুরি। আপনি খেলে আমার আনন্দ হবে।

এই আনন্দ কথাটিতে বিমল মনে মনে চমকে ওঠে। লোকটি তো এর বদলে ভিন্ন কোনও শব্দ ব্যবহার করতে পারত! কার মুখে কখন যে কোন কথাটি উঠে পড়ে, তা সে জানতেও পারে না। অথচ যাকে বলা হল, তার মনের প্রতিক্রিয়ার কোনও খবর হয় না, যে কথক তার কাছে।

বিমল হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটি তুলে নেয়, এরকমটা তার স্বভাবের বাইরে হলেও। লোকটির চোখ-মুখের ভাষা আর আনন্দ কথাটি তাকে তুচ্ছতার থেকে দূরে নিয়ে যায়। কারও কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করব না জাতীয় অভিমান তাকে এই সময়টুকুর জন্য ত্যাগ করে। আজাহারের চোখ জোড়া ঝকঝক করে।

ডাক-প্যাডে তার নামে খামবন্ধ একটা চিঠি। ভিজিল্যান্স দপ্তরের। খুলে দেখে বেশ কড়া ভাবে বলা হয়েছে, সে যেন তার অ্যাসেট বা ধনসম্পত্তির বিবরণ এখুনি দাখিল করে।

বিমল জানে, আর সবার মতো সে ফি বছরে রিটার্ন দাখিল করে না। এটা অন্যায় জেনেও জমা দেওয়া হয় না। কারণ, আলস্য। এটা সত্যিই গুরুতর অন্যায়। কিন্তু এতবছর চাকরি করেও, নিয়মিত প্রোমোশন পেয়েও সে আজও নিয়মমাফিক হতে পারল না। সম্প্রতি আরও এক গেরো খুলেছে। ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষায় সে গতবছর মাত্র পাশ করেছে। এতদিন পরীক্ষায় বসাই হয়নি। ফলে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট বন্ধ ছিল। এ নিয়ে তার পরিবার বহুবছর বিস্তর কষ্ট করেছে। সীমা মাঝে মাঝে রাগারাগি করে একসময় চুপ করে গিয়েছে।

বিমল নিজে জানে চাকরি, গান শোনা, বইপড়া— এসব কোনও ক্রিয়েটিভ কাজ তো নয়। একজন গায়ক বা লেখকের হয়তো অজুহাত থাকতে পারে। 'সময় নেই' কথা তাদের মুখে মানায়। কিন্তু বিমল এসবের কিছুই নয়। সংসারে তার পরিচয় একজন এস ডি ও হিসেবে। আত্মীয়স্বজন বিশেষ করে কোনও অনুষ্ঠানবাড়িতে তাকে নিয়ে পাঁচজনের সামনে গৌরব করে যখন, সে এক মহা অস্বস্তির ব্যাপার। এই পদটি যেন মোক্ষলাভের কথা বলে। সমাজে পরিচিতির একটা মোটাসোটা দলিল হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু সংসারে ইনি একজন 'লেখক' বা 'গায়ক' বা অন্যকিছু ছাড়া আর কোনও পরিচয় ধোপে টেঁকে না। ইনি গান শোনেন বা বই পড়েন— এ জাতীয় হাস্যকর পরিচিতি হয় না। তার চেয়ে কমনম্যান কথাটি অনেক পোক্ত। নামের আগে-পিছে কোনও লেজুড় নেই।

এখানে বিমলের মনে কোথা থেকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উড়ে এসে জুড়ে বসেন, মহকুমাশাসকের এই চেম্বার ভেদ করে।

'... নিজেকে সাধারণ মানুষ ভাবা ছাড়া আমার পথ নেই। জনসাধারণ সাধারণ আর আমি অসাধারণ, কারণ আমি লেখক, এ ধারণা নিয়ে ভালোবাসতে গেলে মানুষ কাছে ঘেঁষতে দেবে না, মানবপ্রেমে বুক ফেটে যাওয়া বেদনার সৃষ্টিও গ্রহণ করবে না। ... অগত্যাই আজ সবার আগে লেখক-কবিকে এই চিন্তাটা স্বভাবে পরিণত করতে হবে— আমি দশজনের একজন।'

'... প্রতিভাও তো জনসাধারণের সম্পত্তি। জনসাধারণ না থাকলে কারখানার উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনও তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়। প্রতিভার মালিককে জনসাধারণ কত যে শ্রদ্ধা সম্মান দিয়েছে তার সীমা হয় না, ভবিষ্যতেও চিরকাল দিয়ে যাবে, কিছু শ্রদ্ধা সম্মান ফিরিয়ে দেওয়াই তো উচিত। তবে মুশকিল এই, যাকে নিচু ভাবি তাকে ঠিক ভালোবাসা যায় না, শ্রদ্ধা ও সম্মানও করা যায় না। সে জন্য আগে নিজের মিথ্যা অহঙ্কারটা ছাঁটা দরকার।'

বিমল ইন্টারকমে বিল-ক্লার্ক ভবেশবাবুকে ডাকে। তিনি চিঠি পড়ে মুখ গম্ভীর করে বলেন, এটা তো এখুনি পাঠাতে হবে স্যার।

বিমল চোখ নিচু করে বলে, আপনাকেই তো সব বানিয়ে দিতে হবে। এ বিষয়ে আমার অপদার্থতার সীমা নেই।

ভবেশবাবু মৃদু হাসেন, বেশ তো স্যার, আপনি আপনার কী কী সম্পত্তি আছে পরপর লিখে দেবেন। আমি আপনার স্টেটমেন্ট বানিয়ে দেব।

বিমল সামান্য হাসে, ক্যাশ বলতে আমার স্ত্রীর সঙ্গে একটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট। ওতে বোধহয় হাজার তিনেক পড়ে আছে।

ভবেশবাবু অবাক চোখে তাকান, কিছু মনে নেবেন না স্যার। আপনি তো আপনার ফ্যামিলির প্রতি অন্যায় করছেন। কিছু সঞ্চয় না করলে—

বিমল এবার জোরে হেসে ওঠে, কী বলি বলুন তো। আজ তো চলে গেল। কালকের কথা ভেবে কী হবে। সময় নষ্ট।

ভবেশবাবু মুখ নিচু করে হেসে উঠে দাঁড়ান।

সামনে-দূরে ডি এমের অফিসঘরের ছাদ। প্রাচীন কাঠামোর বিল্ডিং। সেকেলে কড়া লাল রঙা। তার ওপারে টানা একতলা বিল্ডিং, রেকর্ড রুম ইত্যাদি। বিমলের ভারি ইচ্ছে একদিন ওই পুরনো রেকর্ড-রুমে ঢোকে। কবেকার সব নথিপত্র ওখানে রাখা আছে। তবে কী অবস্থায় আছে, তা কে জানে!

জানলার ঠিক বাইরে একটা পুরনো কালো জাম গাছ। থোকা থোকা জাম ঝুলছে। ফলগুলোর গায়ে রাস্তার ধুলো এসে দিব্যি পলেস্তারা দিয়েছে। চারপাশে মাছি ঘুরছে। একটা কাক বসে আছে স্থির হয়ে।

ক্রমশ

কবিতা-পরিচয়

বৃষ্টি: অমিয় চক্রবর্তী
নরেশ গুহ

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি নামে।
শহরের পথে দ্রুত অন্ধকার।
লুটোয় পাথরে জল, হাওয়া তমস্বিনী;
আকাশে বিদ্যুৎজ্বলা বর্শা হানে
ইন্দ্রমেঘ;
কালো দিন গলির রাস্তায়।
কেঁদেও পাবে না তাকে অজস্র বর্ষার জলধারে।

নিবিষ্ট ক্রান্তির স্বর ঝর ঝর বুকে
অবারিত।
চকিত গলির প্রান্তে লাল আভা দুরন্ত সিঁদুরে
পরায় মুহূর্ত টিপ,
নিভে যায় চোখে
কম্পিত নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল বোবা রেখা।
বিরামস্তম্ভিত লগ্ন ভেঙে
আবার ঘনায় জল।
বলে নাম, বলে নাম, অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া
খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।
মত্ত দিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম ঝঙ্কার
অবিরহ,
সেই সৃষ্টিক্ষণ
স্রোতঃস্বনা
মৃত্তিকার সত্তা স্মৃতিহীনা
প্রশস্ত প্রাচীন নামে নিবিড় সন্ধ্যায়,
এক আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে।
ভেসে মুছে ধুয়ে ঢাকা সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টিলোক।
কী বিহ্বল মাটি গাছ, দাঁড়ানো মানুষ দরজায়
গুহার আঁধারে চিত্র, ঝড়ে উতরোল
বারে-বারে পাওয়া, হাওয়া, হারানো নিরন্ত ফিরে ফিরে—
ঘনমেঘলীন
কেঁদেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে ॥

সে-ই যদিও উপলক্ষ তবু স্পষ্টতই কবিতাটি 'তাকে' নিয়ে নয়, বর্ষার অজস্র জলধারে কেঁদেও যাকে পাওয়া যাবে না। কার উদ্দেশে এই ব্যাকুলতা, কেন সে চলে গেছে, তাকে নিয়ে গেছে মৃত্যু না বিচ্ছেদ, এ-সব প্রশ্নের কোনো উত্তর দেবার অভিপ্রায় এ-কবিতায় ব্যক্ত হয়নি। নিতান্তই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তর্গত যে-কাহিনি তার কুণ্ঠিত আভাসমাত্র পাওয়া যাচ্ছে। এবং যদিও এ-কবিতায় কোথাও উত্তমপুরুষের কোনো প্রকাশ্য উল্লেখ নেই তবু উক্তির কর্তায় এবং কর্মে ব্যবধান অকল্পনীয়। তাছাড়া, যার বিচ্ছেদে এই ব্যাকুলতা তার পরিচয় এ-কবিতায় না থাকলেও, আবহমান বাংলা কবিতার ধারা অনুযায়ী, উল্লিখিত বিচ্ছেদকামনা এবং বর্ষার সমাহার অনুসরণ ক'রে অনুমান করতে দেরি হয় না যে উপলক্ষ পুরুষ নয়, নারী। একজন বিশেষ মানুষের বিচ্ছেদসঞ্জাত যে-বেদনা তারই রূপান্তরপ্রসঙ্গ নিয়ে কবিতা।

'কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে'— এই যে-পঙক্তি দিয়ে কবিতাটির শুরু, যাতে ব্যক্তিগত কোনো বিচ্ছেদের বা অবসানের প্রবল বেদনা বিনা ভূমিকায় অকস্মাৎ ব্যক্ত হয়েছে, কবিতার বাকি অংশে এই পঙক্তির ক্রমশ রূপান্তর লক্ষ করা যাক। ঈষৎ অদল-বদল ক'রে চারবার ব্যবহার করা হয়েছে পঙক্তিটিকে। প্রথমবার 'অজস্র' কথাটির ব্যবহার 'জলধারা'-র বিশেষণরূপে। কোনো এক বিশেষ বর্ষার অজস্র জলধারার কথা বুঝতে পারি। হঠাৎ যেন বেদনার উৎসের খুব কাছাকাছি পৌঁছতে পারছি আমরা, অচিরেই যে-বেদনা ছড়িয়ে যাবে 'বর্ষার অজস্র জলধারে'। সময়টা ঠিক চিরাচরিত মাহ ভাদর নয়, ফাল্গুনের বিকেল। স্থান শহর, যথোচিত অনুকূল না-হলেও বসন্তের আগমন যে-পরিবেশে নিষিদ্ধ নয়। ঘটনাচক্রে কিন্তু অন্যরকম হলো। শহরের পাথরে বাঁধানো গলিপথ, ঘনিয়ে আসা অন্ধকার, বৃষ্টিধারা, হাওয়া এবং আকাশের বিদ্যুৎ—এই কয়েকটি খুব চেনা চিত্রকল্পের সাহায্যে আশ্চর্য মিতব্যয়িতার সঙ্গে রচনা করা হয়েছে গলি-থেকে-অন্তরিক্ষব্যাপী একটি নাটকীয় ঘটনার, যে-দারুণ নাটকের পাত্র-পাত্রী নয় কোনো শহরের পথচারীগণ। কেননা, নাটকটি ঘটছে আসলে একটি বিদ্ধ মানুষের চৈতন্যের মধ্যে, এবং তারই চোখ দিয়ে দেখা প্রাকৃতিক ঘটনায় সে-আবেগের প্রতিফলন হচ্ছে মাত্র। শহরের পথে অন্ধকার দ্রুত হ'য়ে আসে, শত্রুসৈন্য যেমন ক'রে শহর ঘিরে ফেলে সেই রকম। পরাভূত নগরীর শোকবিহ্বল নারীদের মতো বৃষ্টির করুণ জলধারা কঠিন পাথরে লুটিয়ে পড়ে। 'তমস্বিনী' হাওয়ার মধ্যেও গাঢ় বিষাদ মিশে আছে। বিদ্যুৎ-ঝল্‌সানো মেঘ মনে পড়িয়ে দেয়

পুরাণবর্ণিত যুদ্ধের কথা, ইন্দ্রের ক্রোধ যখন উদ্যত হয়েছিল। সর্বস্ব হারানোর স্মৃতিতে উদ্বেলিত একটি মানুষ এই বিশ্বময় তাণ্ডবের মধ্যে ধরা পড়ে গিয়েছে যেন।

এ তো গেল ফাল্গুন-বিকেলে একটি বৃষ্টির আয়োজনের কথা। তারপর বৃষ্টি নামলো, ঝরঝর ধারে, —যার একটানা শব্দের মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে বিশেষ একটি অবসানের, সমাপ্তির স্বর যা-নিয়ে এই কবিতা এবং নাটকীয় প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যেও কবি একবারও যা আমাদের ভুলতে দিচ্ছেন না। 'চকিত গলির প্রান্তে লাল আভা'র সংহতি লক্ষণীয়। যেহেতু ফাল্গুন, তাই পাঁশুটে জোলো মেঘ আকাশকে আচ্ছন্ন করেনি। মুহূর্তের জন্য দিনশেষের লাল আভা পশ্চিমে একবার জ্বলে উঠেই মিলিয়ে গেল যার যোগ্য উত্তর জাগলো না কম্পিত নগরশীর্ষে বাড়ির জটিল রেখায়, কেনন বোবা বাড়ি সজীব বৃক্ষ নয়। এই প্রসঙ্গে 'সিঁদুর'-এর আশ্চর্য ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কৌশলে বিরহান্তরিতা কোনো নারীর সীমন্তের কথা মনে করিয়ে দেওয়া—সিঁদুর তার সীমন্তে সত্যি ছিল কিংবা থাকতে পারতো, সে-কথা যদিও বলা নেই। কবিতার এ-অংশ শেষ হচ্ছে প্রথম পঙক্তির এই রূপান্তর দিয়ে:

খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে। 'খুঁজেও'—কেননা চকিত গলির প্রান্তে লাল আভার দুরন্ত সিঁদুরে একবার তাকে হয়তো দেখা গিয়েছিল। বিরামস্তম্ভিত লগ্ন ভেঙে তার পরেই বৃষ্টি নেমেছে। অভিজ্ঞান আর খোঁজা বৃথা। এবং এখন আর 'তাকে' নয়, 'যাকে': যে ছিল প্রত্যক্ষ সে দূরে চলে গিয়েছে। বিশেষের জন্য যে-কাতরতা, হাওয়ার মুখে তা অবিশ্রাম ঘোষিত সামান্য বিচ্ছেদবেদনায় পরিণত হয়েছে। আর এই বেদনা যে চিরকালের, সেই কথা বলেই শুরু হয়েছে কবিতার শেষ অংশ:

আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর।

কিন্তু 'মত্ত দিন, মুগ্ধ ক্ষণ, প্রথম ঝঙ্কার' থেকে শুরু ক'রে পরবর্তী চার-পাঁচ পঙক্তির অভিপ্রায় আমার কাছে এখনো সুস্পষ্ট নয়। 'সেই' মানে কোন 'সৃষ্টিক্ষণ'? মৃত্তিকার সত্তা কেন 'স্মৃতিহীনা'? এবং 'প্রশস্ত-প্রাচীন'-ই বা কীভাবে সংগত হয়েছে এই কবিতায় তার আলোচনা কোনও গুণী পাঠক করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

আমি এ-কবিতা পড়ছি 'পারাপারে'র সিগনেট সংস্করণ থেকে। তাতে দাঁড়ানো মানুষ দরজা'য় এই বাক্যের পরে কোনও যতিচিহ্ন নেই। মনে হয় কমা থাকা উচিত, যেমন হয়তো কমা থাকা উচিত আগেকার দুই ভিন্ন পঙক্তিতে 'স্রোতঃস্বনা' এবং 'স্মৃতিহীনা'র পরে।

কবিতার শেষ অংশ আমাকে যা বলে তা হচ্ছে এই: একদা যা ছিলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অন্তর্গত, আজ তা রূপান্তরিত হয়েছে গুহার আঁচারে রচিত চিত্রকলায়। গুহা অর্থে আমি হৃদয় বুঝেছি। জীবন এই ভাবে শিল্পিত হ'য়ে ওঠে। এবং তবু পৃথিবীর আদিম বর্ষণ জল, হাওয়ার দৌরাত্ম্যে সেই প্রথম বেদনা ফিরে ফিরে হৃদয়ে হানা দেয়, পরিণামে যদিও সৃষ্টির আকাশে দৃষ্টিলোক সেই অভিজ্ঞতার আঘাতে শান্ত হয়, পবিত্র হয়। কান্না দিয়ে ধুয়ে মুছে তুলে রাখার সেই প্রক্রিয়া থেকে কবিতার জন্ম।

কবিতার দেহে ভাবানুষঙ্গের ধ্বনি-সাদৃশ্য রচনা করার প্রথাবিরোধী কৌশল বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। এ-কবিতায় দীর্ঘতম পঙক্তি হচ্ছে ১৮ মাত্রার, বাংলা ছন্দে যে-মাপের বৈশিষ্ট্যই হল নিবিষ্ট, শান্ত, গম্ভীর কোনও আবেগকে পরিপূর্ণ প্রকাশ করবার ক্ষমতা। একদিকে হাওয়া জলের উদ্দামতা, অন্যদিকে সমের মতো ফিরে আসা 'বিরামস্তম্ভিত লগ্ন'—এই দুই অভিজ্ঞতার পারম্পর্য ছন্দের সাহায্যে রচনা করার জন্য ওই ১৮ মাত্রার পঙক্তিকে নানা মাপে ভেঙে কবিতায় ব্যবহার করা হয়েছে, বারবার যাতে ওই পূর্ণমাত্রার সমে ফিরে আসার পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়। এক মাত্র ২ ছাড়া ১৮ মাত্রাকে আর যত ভাবে ভাঙা যায় তার সবই এখানে উপস্থিত:

ইন্দ্রমেঘ, অবারিত, অবিরহ, স্রোতঃস্বনা: ৪ মাত্রা

নিভে যায় চোখে, সেই সন্ধিক্ষণ, ঘনমেঘলীন: ৬ মাত্রা

পরায় মুহূর্ত টিপ, আবার ঘনায় জল: ৮ মাত্রা

ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি নামে...ইত্যাদি: ১০ মাত্রা

তাছাড়া ১২ আছে, ১৪ আছে। ১৬ নেই, এ ছন্দ যোলো মাত্রায় লেখা যায় না ব'লে। অর্ধমিল, পূর্ণমিল দিয়ে আগাগোড়া ছন্দে লিখেও কবিতায় ছন্দজ সুরকে কোথাও অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। ১০, ১৪ বা ১৮ মাত্রায় যে-এতকাল সুর ধ্বনিত হ'য়ে উঠতে চায়, মাঝে-মাঝে বিষম ১২ মাত্রার ধাক্কা দিয়ে তাকে গদ্যভাষার আয়ত্তের মধ্যে রাখার ফলে অপার বিচ্ছেদের এই কান্নাভরা গান অনাবেগ প্রাত্যহিক ভাষার একটি আবহ রচনা করে, আধুনিক কবিস্বভাবের সঙ্গে যে-মেজাজের খুব সংগতি আছে।

পুনশ্চ:

এই আলোচনায় উল্লিখিত অসুবিধেগুলি নিয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। তাঁর মনে হয়, এ-কবিতায় ভাষাগত গদ্যকাঠামোটিতে কোথাও দুর্বোধ্যতা নেই। 'মত্ত দিন, মুগ্ধক্ষণ'-এর পরবর্তী অংশের অভিপ্রায় তাঁর মতে এই : বিশ্ব যখন পুরোপুরি রূপগ্রহণ করেনি, সৃষ্টিপ্রকরণ কেবলই যখন প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হচ্ছে, সেই আদিম উষাকাল থেকেই এক অসীম বিরহবেদনা লিপিবদ্ধ হয়েছে মৃত্তিকার সত্তায়, যদিও পৃথিবীর ভূস্তরে সে-বেদনার স্মৃতি অবলুপ্ত। অসাময়িক প্রকৃতি-দুর্যোগের কালে হঠাৎ কখনও আর্দ্র চৈতন্যের স্তব্ধ তটে সেই প্রশস্ত প্রাচীনের ধূসর স্মৃতি নেমে আসে। ইত্যাদি। এবং 'গুহার আঁধারে চিত্র' প্রভৃতি অংশে ভ্রাম্যমাণ কবির অভিজ্ঞতাপ্রসূত প্রাচীন গুহাচিত্রের উল্লেখ আছে ব'লেও তাঁর অনুমান। হয়তো বিশ্বের সৃষ্টিপ্রকরণের কথাও এ-প্রসঙ্গে গ্রাহ্য। কিন্তু 'মুগ্ধক্ষণ' এবং 'অবিরহ প্রথম ঝঙ্কার' কীভাবে বুঝব?

প্র ত্যা লো চ না

১. মনুজেশ মিত্র

নরেশ গুহ-কৃত অমিয় চক্রবর্তীর 'বৃষ্টি' কবিতার ভাষ্যটি সুন্দর হয়েছে। তবে এ সম্পর্কে আমার সামান্য কিছু বক্তব্য আছে।

কবিতাটি আমি অনেকবার পড়েছি। কিন্তু কোনোবারই প্রথম দুটি পঙক্তিকে মেলাতে পারিনি। 'বর্ষার অজস্র জলধারা' আমার মনে যে ছবি ফুটিয়ে তোলে তার সঙ্গে 'ফাল্গুন বিকেলে বৃষ্টি'র রূপকে আমি কিছুতেই এক করতে পারি না, সে বৃষ্টি যত প্রবলই হোক-না কেন। বর্ষা ও ফাল্গুন, এই দু'য়ের সাময়িক চরিত্রের প্রভেদ সুপ্রকট। রবীন্দ্রনাথের খ্যাপা শ্রাবণের আশ্বিনের আঙিনায় ছুটে-আসার মধ্যে যে সংগতি আছে, অমিয় চক্রবর্তীর এই পঙক্তি দুটিতে তা অনুপস্থিত বলেই মনে হয়। নরেশবাবু ব্যাপারটিকে কীভাবে নিলেন জানতে আগ্রহ হয়।

কবিতাটির অন্য কয়েকটি পঙক্তির ব্যাখ্যা থেকেও নরেশবাবু বিরত থেকেছেন। তিনি বলেছেন, ওই পঙক্তিগুলির অভিপ্রায় তাঁর কাছে সুস্পষ্ট নয়। পরে আবু সয়ীদ আইয়ুব কৃত ব্যাখ্যা তিনি সন্নিবেশিত করেছেন। আবু সয়ীদের ভাষ্যও আমার কাছে যথার্থ মনে হয়েছে। কিন্তু, তিনিও 'মুগ্ধক্ষণ প্রথম ঝঙ্কার/অবিরহ', সম্বন্ধে নীরব। এবং এই শব্দসমষ্টি নিয়ে নরেশবাবুর প্রশ্ন থেকে গিয়েছে। এই শব্দগুলি পড়ে আমার মনে যে অর্থোদয় হয়েছে তা জানাচ্ছি। সৃষ্টির শুরু থেকে প্রবহমান বিরহবেদনার (যে কথা আবু সয়ীদ বলেছেন) স্রষ্টা যে-মিলন, কবি সম্ভবত তার কথাই এখানে বলেছেন। মিলন এখানে 'অবিরহ', 'মুগ্ধক্ষণ' সেই মিলনানন্দের দ্যোতক, 'প্রথম ঝঙ্কার'ও সেই অনুষঙ্গে এসেছে। মিলন আছে বলেই বিরহবেদনার উপলব্ধি, যা মৃত্তিকার সত্তায় লিপিবদ্ধ সৃষ্টির উষাকাল থেকে।

মেঘ, বৃষ্টি, বর্ষণমন্দ্রিত অন্ধকার ইত্যাদির সঙ্গে কালিদাস থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রায় সব ভারতীয় কবিরই বিরহ-মিলনের উপলব্ধির এক সূক্ষ্ম আত্মীয়তা আছে। এই কবিতাটিও তার ব্যতিক্রম নয়।

কবিতাটির শেষের দিকের একটি অংশের (দাঁড়ানো মানুষ দরজায়/গুহার আঁধারে চিত্র') ব্যাখ্যায় নরেশবাবু যে গভীর অর্থের ইঙ্গিত পেয়েছেন তা একটু কষ্টার্জিত মনে হল। আমার মনে হয় পঙক্তিটি একটি সাধারণ উপমা ছাড়া কিছুই নয়। বৃষ্টির সন্ধ্যায় ঘনায়মান অন্ধকারে দরজায় কোনো বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়ানো মানুষকে কবির মনে হয়েছে অন্ধকার গুহাগাত্রে চিত্রিত মূর্তির মতো। আবু সয়ীদের ব্যাখ্যা তাৎপর্যময়। ভ্রাম্যমাণ কবির মানসপটে গুহাচিত্রের স্মৃতির উদ্‌ভাস স্বাভাবিক। কতকটা এই ধরনের বর্ণনাভাস পাওয়া যায় কোলরিজের 'painted ship on a painted ocean'-এর মধ্যে।

২. প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

শ্রীযুক্ত নরেশ গুহ 'বৃষ্টি' কবিতাটির বিষয়ে যে-আলোচনা করেছেন তা আমার কাছে মনোগ্রাহী মনে হয়েছে, কিন্তু কবিতাটির সরলতর একটি ব্যাখ্যা কি সম্ভব নয়? 'ফাল্গুন বিকেলে' যে-দুর্লভ বৃষ্টি নামে, তাকেই 'কেঁদেও পাবে না... বর্ষার অজস্র জলধারে।' এই ফাল্গুনী বৃষ্টি হয়তো প্রেমের প্রতীক, বা শুধুই অপ্রত্যাশিত বারিধারা। এ-বিষয়ে প্রথমে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আমার বন্ধু শ্রীসেবাব্রত চৌধুরী।

৩. সুতপা ভট্টাচার্য

অমিয় চক্রবর্তীর 'বৃষ্টি' কবিতার আলোচনায় নরেশ গুহ জানিয়েছেন, ''মত্ত দিন, মুগ্ধক্ষণ, প্রথম ঝঙ্কার' থেকে শুরু করে পরবর্তী চার-পাঁচ পঙক্তির অভিপ্রায়'' তাঁর কাছে 'এখনো সুস্পষ্ট নয়'। খুব ভালো কবিতা খুব সহজও তো হতে পারে— আমাদের তাই মনে হয়। কিন্তু পণ্ডিত পাঠকবর্গ বোধহয় তাতে সায় দেবেন না। 'বৃষ্টি' কবিতা প্রসঙ্গে নরেশ গুহর দুর্বোধ্যতা এবং আবু সয়ীদ আইয়ুবের বোধ্যতা দুই-ই তার প্রমাণ দেয়।

'মত্ত দিন, মুগ্ধক্ষণ' অংশের কিছু আগে থেকেই নরেশবাবু কবিতার স্বাভাবিক অভিপ্রায়কে বাঁকিয়ে দিয়েছেন। সম্ভবত সেই জন্যেই উল্লিখিত অংশে এসে কবিতা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। 'খুঁজেও পাবে না যাকে বর্ষার অজস্র জলধারে': এখানে 'তাকে'র পরিবর্তে 'যাকে' এসেছে বাংলা বাক্যের স্বাভাবিক প্রকৃতি অনুসারে। তার জন্যে 'বিশেষের জন্য কাতরতা সামান্য বিচ্ছেদবেদনায় পরিণত হয়েছে' কী করে লেখকের মনে হল জানি না। বিশেষত যার আগের পঙক্তি 'বলে নাম, বলে নাম, অবিশ্রাম ঘুরে ঘুরে হাওয়া'। একটি বিশেষ 'নাম'কে ঘিরেই তো এই আকুলতা।

'আদিম বর্ষণ জল, হাওয়া, পৃথিবীর'— এই পঙক্তিতে তারপর লেখক অদ্ভুতভাবে দেখতে পেলেন চিরকালের বেদনা। বৃষ্টি-জল, হাওয়া,— পৃথিবীর এই বস্তুগুলি আদিম (মাধ্যমিক শ্রেণির ব্যাখ্যা লেখার মতো লিখতে বাধ্য হচ্ছি)— এর থেকে বেশি কিছু এ পঙক্তিতে কী করে কুলোয়? এরপরেই উল্লিখিত অংশ 'মত্ত দিন, মুগ্ধক্ষণ...'। কবিতার দ্বিতীয় অংশের শেষ পর্যন্ত ফাল্গুন-বিকেলের অকালবর্ষণ কবির নিজের আবেগ-লাঞ্ছিত। শেষ অংশের শুরুতে প্রজ্ঞাবান কবিকে দেখতে পেলাম, যে-বৃষ্টিকে কবির কান্নার মতো মনে হচ্ছে, যে-হাওয়াকে মনে হচ্ছে 'তমস্বিনী', সেই বৃষ্টি, হাওয়া তো কবির একলার কিছু নয়। অহংমুক্ত হতেই কবি দেখতে পেলেন, প্রবল বর্ষণে মত্ত, মুগ্ধ হয়ে উঠেছে বিশ্বপ্রকৃতি— যেমন হয়েছে চিরকাল, সৃষ্টির প্রথম ক্ষণ থেকে। বিরহ তাকে স্পর্শ করে না। সৃষ্টির আদি মুহূর্ত কোনো স্থির বিন্দু নয়, তা চলমান স্রোতোধারার মতো, 'মৃত্তিকার সত্তা' তাই 'স্মৃতিহীনা' ('বলাকা' স্মরণীয়)।

'বলে নাম, বলে নাম...' অংশে কবির উদ্বেল আবেগ যেন শান্ত হল অহংমুক্ত প্রজ্ঞার প্রভাবে। চৈতন্য তাই 'আর্দ্র' হলেও 'স্তব্ধ'। স্রোতস্বনা সৃষ্টির অনাদি উৎস পর্যন্ত যে-বিস্তৃত কালে কবির দৃষ্টি প্রসারিত তাই 'প্রশস্ত প্রাচীন', বিচ্ছেদরহিত বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিতে কবির ব্যক্তিগত বিচ্ছেদবেদনা স্তিমিত হল বলেই, তখনই, বহির্দৃশ্য তাঁর দৃষ্টিতে গুহাচিত্রের মতো সুন্দর ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে দেখা দিল।

কিন্তু শান্তি বেশিক্ষণ টেকে না। ঝোড়ো হাওয়া শূন্যতার হাহাকার জাগিয়ে তোলে

আবার, প্রজ্ঞাকে পরাভূত করে হৃদয়। বর্ষার জলধারায় যে-পলাতককে পেতে ইচ্ছে হয় অথচ শত কান্নাতেও পাওয়া যায় না, সে ওই ঘনমেঘের গভীরে কোথাও আছে— এমনি একটা ব্যর্থ সান্ত্বনায় কবিতা শেষ হয়। সর্বশেষে প্রথম পঙক্তির প্রত্যাবর্তনে কবিতাটি একটি নিটোল গীতিকবিতা হয়ে ওঠে, আর কান্নার মতো 'বৃষ্টি'র ধারাপতনে ভিজে যায় পাঠকের মন।

ক বি র উ ত্ত র

অমিয় চক্রবর্তী

'বৃষ্টি' কবিতা নিয়ে নরেশ গুহ যে সূক্ষ্ম নিপুণ আলোচনা করেছেন তাতে তাঁর সৌন্দর্য এবং প্রখর অনুশীলনবৃত্তি প্রকাশ পেয়েছে। প্রবন্ধের পাঠকরূপেই বলছি; নিজের কবিতার মূল্যনির্ণয় করা আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার সাধ্যেরও অতীত।

প্রসাদগুণ এবং সতর্ক বিচারবুদ্ধির যুগ্ম পরিচয় সমালোচনা-সাহিত্যে দুর্লভ; ওই সামঞ্জস্যের অভাবে চাক-ভাঙ্গা ভিমরুলের আক্রমণ নয়তো অসতর্ক প্রশংসাবৃত্তি বাংলা পত্রিকায় (এবং অন্যত্র) বারংবার ব্যর্থতা এনেছে। আর একটি উপদ্রব সৃষ্টি হয় অনাবশ্যক জটিল এবং অস্বচ্ছ বাক্‌বিস্তারে। আসলে যা মননশীল নয়, কেবলমাত্র অতিমননশীলতার ব্যক্তিগত বা যৌথ অভ্যাস— তাকে সাহিত্যিক মর্যাদা দেওয়া চলে না। যে-আর্শিতে মূল কাব্যের একটি সমগ্র পরিচয় পাঠকের পক্ষে কাম্য তা যদি শব্দের ওজনে এবং দুর্বোধ্য মনোবিকলনে চাপা পড়ে তাহলে সেটা সাহিত্য দর্পণের নামে অত্যাচার। কবিরা অনেক দোষ করেন সন্দেহ নেই; কিন্তু কে চায় কবিতার বদলে কণ্টকারণ্য?

আপনাদের পত্রিকা বহু সংকট এড়িয়ে সমালোচনার উদার প্রমিত পথে উত্তীর্ণ হয়েছে আমার এই বিশ্বাস।

'বৃষ্টি'র আলোচনায় দু-একটি প্রশ্ন আছে, তার উত্তরে কিছু বলতে চাই। নরেশ গুহ ঠিকই বলেছেন, 'দাঁড়ানো মানুষ দরজায়' এই লাইনের শেষে অন্তত কমা বসলে অর্থ সুস্পষ্ট হত। আমার আর্জি এই যে দুটো ছবি— আদিম যুগের

প্রসাদগুণ এবং সতর্ক বিচারবুদ্ধির যুগ্ম পরিচয় সমালোচনা-সাহিত্যে দুর্লভ; ওই সামঞ্জস্যের অভাবে চাক-ভাঙ্গা ভিমরুলের আক্রমণ নয়তো অসতর্ক প্রশংসাবৃত্তি বাংলা পত্রিকায় (এবং অন্যত্র) বারংবার ব্যর্থতা এনেছে। আর একটি উপদ্রব সৃষ্টি হয় অনাবশ্যক জটিল এবং অস্বচ্ছ বাক্‌বিস্তারে।

একলা মানুষ এবং প্রাক্-ঐতিহাসিক গুহাচিত্র একই সুদূর সংশ্লিষ্ট আবহাওয়ায় জাগাতে চেয়েছি। বৃষ্টিময় আলোঅন্ধকারের হঠাৎ দৃষ্টিতে, ঘনমেঘের হৃদ্‌গত সঞ্চারে সেই একত্রীকরণ ঘটেছে কিনা জানি না। কবিতার বাইশ পঙক্তিতে 'সেই' কথাটা ব্যবহৃত হল সর্বপ্রথম সৃষ্টিক্ষণের উদ্দেশ্যে, যেখানে আদি প্রৈতি, বৃষ্টির সৃষ্টিরও; মানুষের দুঃখানুভূতির পূর্বসূচনা সেইখানে। যদিও সচেতন কাল এল পরে, মানুষের সৃজনভূমিতে, সংসারে। 'মৃত্তিকার সত্তা'কে 'স্মৃতিহীনা' বলা হয়েছে কেননা স্মৃতির শুরু চৈতন্যে; অর্থাৎ মানুষের চৈতন্যে। যাকে বলা হয় প্রকৃতি তাতে সেই বোধের প্রমাণ নেই যদিও প্রসঙ্গ আছে, না হলে মানুষ ভিজে আকাশ, বর্ষার মাঠে তার বেদনা নিয়ে দাঁড়াত না। বৈদিক পুরুষসূক্তের প্রভাব মেনেছি— যদিও আমার সামান্য ও ক্ষীণ কাব্যে তার প্রতিধ্বনিটুকুও পৌঁছয়নি। প্রেমের অনুরঞ্জিত মুহূর্ত নিয়েই এই লিরিকের বিস্তার।

'প্রশস্ত, প্রাচীন' সেই সামগ্রিক সত্তা যা মানুষের অধিকার ছাড়িয়ে আছে অথচ যা মানবচেতনার যুক্তাধিকারে আমাদের কাছে অর্থময়, পূর্ণতর ব্যঞ্জনাময়। যে-কটি লাইনের প্রসঙ্গ আলোচনায় তোলা হয়েছে তার বাক্যমালা বারংবার ওই 'আদিমতম' সৃজন এবং মানুষের স্মৃতিময় যোগের চতুর্দিকে আবর্তিত। যা বলা শক্ত তাকে ধ্বনি এবং ইঙ্গিতে ব্যক্ত করার দুরাশা প্রত্যেক শিল্পীকে মধ্যেমধ্যে পেয়ে বসে।

প্রাথমিক সৃষ্টিক্ষণকে 'মুগ্ধক্ষণ' বলা বিপজ্জনক স্বীকার করি কিন্তু এই মুগ্ধতা (অথবা 'মত্ত দিনে'র সমাসীন উত্তেজনা) ঠিক মানবিক চেতনার অর্থে নয়, এ যেন অপ্রতিহত, কালহীন কেবলমাত্র 'হাওয়া'-র চিন্তাহীন উদ্দীপনা। যেমন আদিত্যবর্ণা যে-কোনও দিন, ধানের সবুজ, অথবা আউল-বাউল কীর্তিত 'তিলের মধ্যে ত্যাল'। দুর্নিবার বেদনায় মানুষ হঠাৎ যা-আছে তাকে আবিষ্কার ক'রে আত্মস্থ হয়; যাকে আমরা বলি 'প্রকৃতিস্থ'— সেই ভার; রোদে-জলে জানে সেই 'জলের রানীকে' যাকে বারে-বারে জীবনের প্রেমাশ্রুতে ধরা গেল না। আমাদের অনেকখানি উৎসব সেই 'বেশির' বা অন্যের' উৎসব, হয়তো একান্ত জীবনের নহবৎখানা তখন নিস্তব্ধ। অবিহর প্রথম ঝংকার ওই কবিতায় ঝংকৃত করার চেষ্টা বা ইচ্ছা ছিল কারণ আমাদের ওংকৃত জীবনেও বিরহ এসে পৌঁছয়, বৃষ্টির ধারাবর্ষণে যে-বেদনা নেই তাকে মিশ্রিত করি আমাদের বেদনায়— হঠাৎ দাঁড়াতে চাই সত্যসত্যই যা বর্ষাজল তারই কাছে। মানুষ দুঃখ চায়, সুখ চায় কিন্তু সীমানা-বহির্ভূত বোধকেও হারাতে চায় না। ইত্যাদি। অনেকখানি লিখলাম কিন্তু আর নয়। আবু সয়ীদ আইয়ুবের কথিত মন্তব্য আমার কাছে ঔজ্জ্বল্যমণ্ডিত। একই সমালোচনায় দুই বিদগ্ধ মনের পরিচয় সুদূর শহরে আমার কাছে পৌঁছল, সহযোগিতায় ভারতীয় স্পর্শ অনুভব করলাম।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়, পঞ্চম-ষষ্ঠ যুক্ত সংকলন বছর (মাস অনুল্লিখিত) সম্ভবত ১৯৬৬ সাল

কবিতা-পরিচয় প্রশ্নমালা

উত্তর লিখেছেন: অমিয় চক্রবর্তী

নীচের প্রশ্ন-ক'টি পাঠিয়ে বাংলা ভাষার বিভিন্ন কবিকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল, তাঁরা যেন পৃথক-পৃথকভাবে অথবা একসঙ্গে জড়িয়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন।—
সম্পাদক

১। আমাদের দেশে এখনকার তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা কবিতা লেখার সময় আপনাকে প্রভাবিত করছে বলে আপনার মনে হয়? যদি করে, কীভাবে?

২। অত্যধিক রাজনৈতিক সচেতনতার ফলে সম্প্রতি বাংলাদেশে কবিতা সম্পর্কে উদাসীনতা এসেছে বলে আপনার মনে হয়? অথবা কবিতাই ক্রমে সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বলে আপনি মনে করেন? বাংলার সমাজমানসে বাংলা কবিতার প্রভাব কীরকম বলে আপনি মনে করেন?

৩। কবিতায় আপনি যে-ভাষায় কথা বলেন তার সঙ্গে মুখের ভাষার কোনও বিরোধ আপনি কি কখনও অনুভব করেছেন? কবিতার ভাষাকে আপনি কি মুখের ভাষার কাছাকাছি রাখবার পক্ষপাতী? অথবা কবিতার এক নিজস্ব ভাষা-নির্মাণই আপনার লক্ষ্য? কবিতার ভাষা জনসাধারণের ভাষা নয় বলে সাধারণ মানুষের যে-অভিযোগ তাকে আপনি কীভাবে দেখেন?

৪। জনসাধারণের জীবনযাপনের সমস্যা বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কবিতায় সঞ্চারিত হলে, বা তা নিয়েই লিখলে, কবিতা কি আরও বেশি লোককে আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট করবে বলে আপনি মনে করেন?

৫। এখনকার এই সময় কবিতা লেখার পক্ষে অনুকূল বা প্রতিকূল মনে হয় আপনার?

১-২-৩-৪-৫ঃ প্রশ্নোত্তর নয়, প্রাসঙ্গিক

মানবসংসারে যে-অংশটুকু জল-হাওয়া-ভাষা-ইতিহাসের বিশেষ যোগে আমাদের একান্ত বাংলা স্বদেশ, তার সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক বিবিধ আন্দোলন আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের অঙ্গীভূত। চতুর্দিকের প্রাণধারায় আমরা অভিষিক্ত: অবচেতনায় যেমন বাংলার মেঘলা দিন, কচি ধানের নীলসবুজের বিস্তার তেমনি পাড়াপড়শির সুখদুঃখের রেশও বহুসঞ্চারিত। শুধু তাই নয়, পূর্ণ চেতনা দিয়ে স্পষ্ট জানি দেশের একটি মর্মরূপ।

আর্তির দিকে নিত্য নিরন্নের ভিড়, বাংলার পল্টন পুলিশ, পাণ্ডা পুরোহিতের বিক্রম— তালিকা যতই সংক্ষিপ্ত হোক তাতে যোগ করা চাই বাদামি বুরোক্রাসির ত্রাস-ব্যবসায়ীর দল। কোথায় সেই বাঙালি লেখক, চিত্রী, সাংগীতিক যাঁর রচনায় এই স্বদেশি সমাজ অস্তিমের মূল্যে স্বীকৃত নয়? হয়তো এই স্বীকৃতি সব সময়ে অতি প্রকট নয় কিন্তু আমাদের কারও পক্ষেই আপন সমাজকে অবজ্ঞা ক'রে শিল্পী সাহিত্যিক সাজা চলবে না।

পরিবেশের মাঙ্গলিক দিকও মানতে হয়। সেখানে খোল-করতাল বাজে, অভাব-অভিযোগের উর্ধ্বে শুনতে পাই শঙ্খ-সানাইয়ের ধ্বনি, চিরন্তন বাংলার গৃহস্থ সংসারে দেখি প্রত্যহের কল্যাণ। এই চরম দুর্দিনেও নতুন কালের ছেলেমেয়েদের জাগরণ সংগ্রাম, যুদ্ধের প্রাগ্রসর যাত্রা। আতিশয্য পেরিয়ে প্রত্যয়ের নবীন উদ্যম।

আমার সামান্য কবিতাবলির প্রসঙ্গ তুলেছেন। অন্য সবারই মতো বাংলা এবং ভারতীয় সম্বন্ধের আত্মিক রূপ নিশ্চয়ই আমার লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। কোথাও সন্দীপের দ্বীপ-সূত্রে ত্যাগী বীর লালমোহনের কাহিনি, কোথাও 'অন্ন-দাও'-এর তীব্র সাক্ষ্য। জেটির কয়লা, এবং মলিন পরিত্যক্ত খালাসির ক্ষণিক উল্লাস— পাশে গড়ের মাঠ। পাগলা জগাইয়ের গান। চেতন-স্যাকরার দোকান। আরও কত কী। যেখানেই থাকি, দেশে বা পরবাসে, দূরে যাবার উপায় নেই। স্বীকার করবো ক্ষোভে ক্রোধে বেদনায় জাজ্বল্যমান আমার অন্তরের বাংলাদেশ— এত ক্ষয়ক্ষতি অত্যাচার যেন আর কোথাও দেখিনি। হয়তো এটাও প্রীতির অতিশয়োক্তি। কিন্তু দশকের পর দশক বাংলায় যা দেখলাম তার বর্ণনায় নিদারুণ রংকে বাহুল্য বলবো না।

পূর্বেই তুলেছি পূর্ণতার কথা। যেমন ক'রেই হোক সমগ্রের দৃষ্টি দিয়েই বাস্তবকে মানবো। মনে পড়ে সেই বরিশালের স্টিমার, মেঘনার জল, অবিভক্ত বাংলার মাতৃভাষা যা কোনওদিনই বদলাবে না শান্তিনিকেতনের আকাশ। কবিতায় শুধু দৃশ্যাবলি নয়, অন্তরের চিত্রাবলি নিশ্চয়ই প্রকাশ পেয়েছে— দুয়ের যোগে আমার কাব্যকে আপনারা বিচার করবেন। কোনও দিককেই বাদ দিতে চাইনি।

সম্প্রতি আমাদের সমাজচেতনা বিশ্বজুড়ে আরও প্রবলভাবে সাহিত্যে উপস্থিত। এখানে সাহিত্যের দিক থেকে বিঘ্নও আছে কেননা আমাদের শিল্পলোক সংসারে এবং সংসারের ঈষৎ উর্ধ্বে উভচারী। (উর্ধ্ব' অর্থে কোনও উন্নাসিক বা নকল আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য এবং অভ্যাসের বিরুদ্ধ)। আমার বলবার কথা এই যে যথার্থ শিল্পী আপন রুচি-প্রকৃতি অনুযায়ী একটি ভারসাম্য রক্ষা করবেন: তুমুল আন্দোলনের মধ্যেও সত্তা এবং শান্তির অধিকার হারাবেন না। কোনও সাধারণ নিয়ম বা অনুজ্ঞা এখানে খাটে না— প্রত্যেক আর্টিস্ট জানেন কোথায় গ্রন্থি-বাঁধা পড়লো বাংলার দুর্দশার সঙ্গে অপ্রতিহত বাংলা জীবনীর।

অথচ মানুষের শিল্পে যদি হঠাৎ ঝড়ের অন্ধকার নামে তাতে ভয় পাবো না। এতেও সূক্ষ্ম বোধশক্তির পরিচয়, কিন্তু আশা করি প্রলয়ের কীর্তনে সেতারের তার ছিঁড়বে না। ছিঁড়লেও আবার তার বেঁধে তুলতে হবে। আমি ভিয়েৎনামে গিয়েছি এবং আজকে সাংঘাতিক দুর্বৃত্তরা যে-ভাবে কাম্বোডিয়াকে ডেমোক্রাসির নাম চূর্ণবিচূর্ণ করছে তার অনেক খবরই আমরা জানি। এই বর্বরতার বিরুদ্ধে এদেশে শিল্পী, কবি, শিক্ষক, কর্মী, গৃহস্থ যে-ভাবে কথায় কাব্যে এবং পদযাত্রায় সাড়া দিয়েছেন তা আমার কাছে সাহিত্যের মূল্যেও অমূল্য। মনুষ্যত্বের এই প্রকাশ শিল্পকে সমৃদ্ধতর ক'রে তুলবে। স্থির বিশ্বাসে জানি যেমন এদেশে, তেমনি বিশেষ অর্থে আমার স্বদেশে, আমার বাংলায়, সাহিত্যের ধৃতিশক্তি নষ্ট হবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে তরঙ্গের পারে তীরের দিকে, তরঙ্গের তলে গভীর সমুদ্রের প্রতি। সাহিত্যের অভিযানে একটি চরম লগ্ন উপস্থিত।

পুনশ্চ: ঠিক জবাব দেওয়া হল না কিন্তু চিঠির সূত্রে আপনাদের গভীর অনুসন্ধানের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই।

ন্যু-পল্‌জ্‌, ১২ই জুন ১৯৭০

কবিতা-পরিচয়, দ্বাদশ সংকলন, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৭

আলোক সরকারের স্বনির্বাচিত সাতটি কবিতা

যে-কোনও শিল্পকর্মের মতোই কবিতাও অবিমৃশ্যভাবে একটা নিমিত্ত বস্তু—সেই নির্মাণের একমাত্র লক্ষ্য, আলঙ্কারিকেরা বলবেন, রসবস্তুতে পরিণত হওয়া, আমরা বলব সম্পূর্ণতার দিকে যাওয়া, সম্পূর্ণ হয়ে ওঠা। বস্তুত যে-কোনও সম্পূর্ণতাই সেই আবহমানের প্রতিধ্বনি যা সব ব্যবহারিক লৌকিকতার পরিপ্রেক্ষিতে অলৌকিক। যেমন প্রতিটি প্রাণের অনন্য অভীপ্সা তার সহজাত ধর্মের পূর্ণ বিকাশ—একটা গাছ হতে চাইছে পরিপূর্ণ একটা গাছ, একটা পাখি পরিপূর্ণ একটা পাখি, সেই রকম একটা কবিতারও স্থির লক্ষ্য সম্পূর্ণ একটি কবিতা হয়ে ওঠা। এই হয়ে-ওঠা যেখানে সর্বতোসার্থক, পরিপূর্ণ একটা বৃত্ত, সেইখানেই সেই অবসান, যে অবসানে অসীম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র স্পন্দিত। কবিতার লক্ষ্য সেই অবসানের উজ্জীবন, যে অবসান সম্পূর্ণতারই সমার্থক; যে-কোনও সম্পূর্ণতাই তো এক নিরতিশয় অবসান, চরাচর-ব্যাপ্ত নিশিথিনীকে মন্দ্রিত করা।

এবং এর অতিরিক্ত আর কিছুই নয়। অর্থাৎ কবিতা কিছু বলে না, কিছু বলার তার কোনও কথাও ছিল না, কবিতার অনন্য লক্ষ্য একটা সমগ্রতা, একটা সম্পূর্ণতা। কোনও তথাকথিত মহৎ বক্তব্য উপস্থাপনে সে যেমন প্রতিশ্রুত নয়, সেই রকম তথাকথিত অসামাজিক, অমানবিক তথ্য প্রচারের রক্তমাধ্যম হওয়াতেও তার অনীহা। তার কাছে শ্লীলতা এবং অশ্লীলতা সমার্থক, যেমন শুভ এবং অশুভ। তার কাছে একমাত্র নির্মাণের প্রশ্নটাই জরুরি, যে নির্মাণ অনিবার্যভাবে, একটা হাওয়ার দিকে যাচ্ছে, একটা সম্পূর্ণতার দিকে, হতে চাইছে নিটোল নিখুঁত একটা বৃত্ত।

কবিতা প্রসঙ্গে

কবিতা পাঠকের কাছে এ সমস্তই একটা তত্ত্বকথামাত্র মনে হতে পারে, মনে হতেই পারে ওপর থেকে চাপানো একটা সিদ্ধান্ত যেহেতু বাস্তব অভিজ্ঞতা এই কথাই বলে যে কবিতা অনিবার্যভাবে কিছু বলে, সেই বলা কখনও কখনও এমনকী বেশ ভারী তত্ত্বমূলকও কিছু হয়ে উঠতে পারে, যখন তা হয় না, তখনও অন্তত কিছু জানাতেই সে চায়—বেদনা অথবা আনন্দ, ক্রোধ অথবা পরিতাপ এইরকম কিছু। আলংকারিকেরা যতই স্পষ্ট করে বলুন রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ, লৌকিক শোক-অশোক, প্রকল্পনা-প্রতিবাদ ইত্যাদির শেষাবধি সেই জগতে কোনও জায়গা নেই, কবিতা পাঠকের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রাথমিকভাবে এর প্রতিবাদী হয়ে উঠবেই। কবিতা কিছু বলে না, বেজে ওঠে; কবিতা শব্দ দিয়ে রচিত হয়, আইডিয়া বা ভাববস্তুর প্রসঙ্গ সেখানে অবান্তর, কবিতা-বিষয়ে শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরিদের এই ধরনের মন্তব্য বারংবার ঘোষিত হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতায় কবিতার প্রাথমিক অভীপ্সা অন্তত কিছু বলার দিকেই। কবিতার ব্যবহারিক উপস্থাপন এবং তার সারাৎসারের ভিতর এই মৌল দ্বন্দ্ব বা বিরোধ যে ভাব বা ইমোশনের সঙ্গে রস অথবা অভিনিবেশকে একাত্ম করে দেখার ফলেই উদ্ভূত তা অলংকারশাস্ত্রের পাঠক মাত্রেই জানেন। বস্তুত একটি গাছের হয়ে ওঠা এবং একটি পূর্ণাবয়ব গাছের মধ্যে অসেতুসম্ভব ব্যবধান। একটা গাছ তার ডাল নয়, তার পাতা নয়, ফুল নয়—একটা গাছ সর্বাঙ্গীণ একটা গাছ, যেমন একটা ছবি সামগ্রিক একটা ছবি। বিশ্লিষ্টভাবে একটা গাছ পাতাও নয়, ফুলও নয়, একটা ছবি দশ-বারোটি রেখাও নয় কিংবা তিন-চারটি রং। কেবল একটা সমগ্রতা। প্রতিটি মুহূর্তই স্বতন্ত্র, একক অস্তিত্ব; এক মুহূর্তের সঙ্গে অন্যমুহূর্ত মূলত বিচ্ছিন্ন—স্মৃতির সুতোয় যখন হাজার মুহূর্তের মালা গেঁথে একটি ঘটনা একটা ছবির জন্ম হয়, তখন কে মনে রাখে একক নিরপেক্ষ বিশ্লিষ্ট একটি মুহূর্তের কথা? আমরা সমগ্রতাকেই চাই—প্রতিটি প্রাণের অনন্য অভীপ্সা।

আলোক সরকার

কম আলো

কতো রকমের দুঃখ আছে! উঁচু ডালের লাল ফুল
লাফিয়ে ঝাঁপিয়েও তোলা গেল না।
বৃষ্টিতে ভিজে নষ্ট হল ফুল। আর সারা দুপুরবেলা
ম্লান চোখের সেই কিশোর উঠোনের ভিতর নেমে আসছে
উঠোন থেকে ঘরে ফিরছে আবার।
ঘর থমথম করছে ম্লানতায় ভেজা গুটিয়ে-আসা পাপড়ি-
আরো আরো বেশি ঝরে যাচ্ছে জল রিমঝিম জল ঝরেই যাচ্ছে অবিশ্রান্ত।
একটু আলো কমলেই মেঘ করে।
কতো কতো দিন পার হল তবু আলো যখনই কমে আসে
আলো কতবারই যে কমে আর অমনি উঁচু একটা ডাল
লাফিয়ে ঝাঁপিয়েও তোলা যায় না।
রিমঝিম জল ঝরেই যাচ্ছে অবিশ্রান্ত ভেজা গুটিয়ে-আসা পাপড়ি
কতো কতো দিন পার হল আর মেঘ-করে-আসা নিঃসঙ্গ
উঠোনের ভিতর নেমে আসছে কিশোর—
সারা আকাশ থমথম করছে মেঘ অন্যমন বিষাদ ঘরে ফিরে যাচ্ছে ওই।

কুমুদি

আমার বেড়ানো শেষ হয়েছে এইবার বাড়ি ফিরে যাব
কুমুদিকে দেখছি না কোথাও।
চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছি কুমুদি কুমুদি তুমি কোথায়?
কুমুদি ছাড়া কেমন করে বাড়ি ফিরব আমি? আছে কোথাও নিশ্চয়
গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা করছে কুমুদি।
কেন যে একা একা বাড়ি ফিরতে পারি না আমি! বাড়ি থেকে বেরুলেই
ফেরার পথ ভুল হয়ে যায় আমার। পথ একটা ঠিক চিনি
চিনতে পারি না অলিগলিগুলোকে।
এবার ভালো করে চিনে রাখতে হবে সব, মনে রাখতে হবে
একটা গলির থেকে অন্য গলির তফাত। সবই একরকম মনে হয়
একটা পথ আর অন্য একটা পথ।
কুমুদি কত সহজেই চিনে নেয় পথ। কেমন করে চেনে?
কয়েক মিনিটেই বাড়ি পৌঁছে যাই আমরা। বাড়ি ফিরে গিয়ে
কুমুদিকে কেমন অচেনা মনে হয়।
ওর মুখে কেমন যেন বনের রং মাখানো, খুব আবছা মস্ত একটা নদী।

মৃত্যুফুল

ওগো প্রভু আজ আমাদের বেলাশেষ। আজ
তোমার আমার বেলাশেষ। তুমি ঠিক আছ? তুমি
অন্ধকারে চিনতে পারছ পথ? আমি কিছুই দেখি না। আমি
হাত এলোমেলো ছুড়ি নিষ্ফল প্রয়াস। তুমি কোনদিকে? প্রভু
আজ আমাদের বেলাশেষ, আজ আমাদের ফেরা, এ তো
কম ফেরা নয়, এ তো কম উঁচুনিচু নয়, এ তো
আসার পথের সেই ফুল্ল শারদীয় নয়। ওই ধূলি
ওই সেই মেদুর তিমির অশাসন, ওই সেই
জননী জঠর—তুমি রঙিন আঁধার গেয়েছিলে তুমি সর্বক্ষণ
তমঃকুসুমের উপহারে। আজ দু'জনের বেলাশেষ।
আমি যত তামস বিচ্ছেদ তুমি ঠিক তত। এত মূক হিম পরিত্যাগ
জেনেছ কখনো? নাকি ওই মাতৃকণ্ঠ, ওই মৃত্তিকার নিশ্চয়তা
আরো আরো রক্তসিন্ধুময়, আরো বেশি তামসকুসুম? আমি
কী করে যে ভুলি সেই তমঃপুষ্প—ক্রমজায়মান মৃত্যুফুল।

বটগাছ

একতলার সিঁড়ির নীচের অন্ধকার, আমি পাশ দিয়ে চলে যাবো
তুমি প্রতিশ্রুতি মনে রেখো, তুমি উজ্জ্বল হয়ো না।
আমি আজ মগ্ন উজ্জ্বলতা, ঘরের দেয়াল ভ'রে আমি
রেখেছি নতুন ছবি। ছবির ধ্যানের মগ্ন সংহত প্রার্থনা
বৃষ্টির রাত্রির মতো, চৈত্রের মাঠের মতো শিখা।
চৈত্রের পাতায় কান্না ঝরাপাতা মরাপাতা তাকে তুমি আবার এনো না।
কী ভীষণ ভয় করে। পুরোনো ছবিটা জানি সহজ নিয়মে
তোমার শীতল কোণে কাঠকয়লার সঙ্গে আছে।
আর সেই ছেঁড়া বই প্রেমের কবিতা যদি সহসা বিদ্যুৎ
একটি হলুদ পাতা যদি জ্বলে ওঠে যদি সমুদ্রের প্রখর সন্তোষে
অতর্কিতে খানখান হয়ে যায় অবিচল, সময়ের দূত
দুই হাতে মুখ ঢেকে অন্ধকার—তোমার উজ্জ্বলে
আরো অন্ধকার। দ্রুত নিবে যাবে শিখা
এবং পুরোনো ছবি ভাঙা ফ্রেমে কঙ্কালের মতো রূঢ়
প্রেতের বিদীর্ণ কণ্ঠে বটগাছ, অন্ধ কোলাহলে।

শ্রমময় নিশ্চেতন

জল-ভরা মেঘের উদাস থেমে-থাকা জানালার আকাশে
স্মরণ করায় প্রবাহহীন সময় শব্দহীন বনান্তরাল।
সকল সচলতার বুকের অন্ধকার, প্রয়াসহীন নিশ্বাসে
উৎসবের সানাই, নির্জন মঙ্গলঘট।

তোমাদের ভালোবাসা অসহায় প্রস্তুতি। অনুভূত হয়
অসহায় প্রস্তুতি। গলির প্রান্তসীমার নিরর্থ অশথগাছ
দোতলার বারান্দার হলুদ-রঙা শাড়ি এইসব নিঃসংশয়
রাত্রির নৌকার অনুরূপ স্থিরতায়।

হেমন্তবেলার আলো শ্রমময় নিশ্চেতন, অনন্তকাল
শ্রমময় নিশ্চেতন। জল-ভরা মেঘের উদাস থেমে-থাকা
ফোটায় নক্ষত্র স্বাতী-বিশাখার মেদুর, নকল অন্তরাল
জল-ভরা মেঘের উদাস থেমে থাকায়।

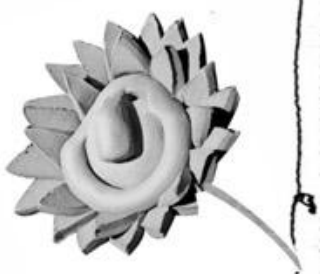

মৃত্যুভূমি

জলের পাশের বালি মাড়িয়ে যাচ্ছিলুম
সন্ধেবেলায়। হঠাৎ ঝলক হাওয়া
প্রশ্ন করলো-মৃত্যুভূমি জানো? কত কালের
বাসি প্রশ্ন। বালির ভিতর ঈষৎ ডুবছে পা।
টেনে তুলি। পা ফেলতেই আবার ডুবলো পা।
ভারি ঠান্ডা! এত ভালো লাগছে যেন ভয় করছে
শিরশিরিয়ে উঠছে সারা শরীর। নদীর ওপর
দাঁড়িয়ে আছে আঁধার তাও কেমন
অনবসান জেগে থাকা। যা কিছু হিম জেগে থাকা
তাই কি গহন বিদেশি মাঠ? গোধূলি মেঘ? টেনে তুলি
পা ফেলতেই আবার ডুবলো পা। এত ভালো
লাগছে! অনেক দূরে যাব, অনেক অনেক ঘন আঁধার
দাঁড়িয়ে আছে সারা আকাশ জুড়ে, অনবসান
নারকেলগাছ বট অশথ—ওই ওই তো
আঁধার নৌকো! হেলে সাপটা লাফিয়ে নামছে জলের মধ্যে।

স্বীকারোক্তি

সেই গোলাপের ছবিটা তোমাকে
না বলেই নিয়ে এসেছিলুম।

নিয়ে যে এসেছিলুম সে-কথা
আর জানানোও হয়নি তোমাকে।

ভয় পেয়েছিলুম নাকি? যদি তুমি
ফেরত দেবার জন্য বলো।

কিছু মনে করো না। ভিতরের ঘরে
ছবিটা খুব যত্ন করে রেখেছি।

ভিতরের ঘরে রোদ্দুর তেমন নেই, হাওয়াও কম
রোদ্দুর আর হাওয়া ছবির ক্ষতিই করে।

রোদ্দুরে ছবির রং ঝলসে যায়। হাওয়া
বহে আনে রাশি রাশি ধুলো।

ছবিটা রোজ ঝাড়ামোছা করি। যে যাই বলুক
ছবিটা যে সুন্দর তা স্বীকার করতেই হবে।

এই কলামটির বিষয় কলকাতার নানা স্ট্রিট, লেন বা বাই-লেন। জব চার্নক এ-শহরের পত্তন গড়ার ডাক দেওয়ার বহু আগে থেকেই একটু একটু গড়ে উঠেছে এই বর্ণময় শহর। এ-শহরের পায়ে-পায়ে ইতিহাস। এই শহর জায়গা করে নিয়েছে বহু কবি ও লেখকের সাহিত্যকর্মে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে বর্তমান প্রতিবেদক কলকাতা শহরের নানা পল্লি, নানা রাস্তায় ফেলেছেন তাঁর পা-ছাপ। কখনও প্রধান রাস্তায়, কখনও অলিগলিতে ঘুরেছেন কাজে ও অকাজে। ঘুরতে ঘুরতে কখনও আবিষ্কার করেছেন সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ, কখনও পেয়েছেন কোনও কবি বা লেখকের লেখায় সেই সব রাস্তার উল্লেখ। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে বহু বই ইতিমধ্যে প্রকাশিত, সেই সব বইয়ের সাহায্য নিয়ে এই কলামে চিত্রিত হবে সাহিত্যের সঙ্গে পুরনো কলকাতার ইতিহাস।

স্ট্রিট লেন বাই-লেন

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

৩

অ্যান্টনিবাগান লেন

আজ অনেক বড়ো হয়ে এল অ্যান্টনিবাগান লেন
ঘুরে ঘুরে শেষ হয় না পথ

১৯৮২-৮৩-র সময়কালে লেখা শঙ্খ ঘোষের এই কবিতাটির মধ্যে এক ভূতুড়ে আবহ মেশানো ছোট্ট রাস্তার কথা বলা আছে, সেই অ্যান্টনিবাগান লেনের পাশ দিয়ে বহুবার যাতায়াত করেছেন কবি। কলেজ স্ট্রিট মোড় থেকে শিয়ালদা যেতে গেলে যে কারও চোখে পড়বে এই গলিটার অস্তিত্ব। খুবই সরু, প্রায়ান্ধকার এই গলির মুখে দাঁড়ালে একসময় মনে হত ভিতরে না জানি কী ভয়ত্রাস লুকিয়ে আছে! কবির তাই মনে হতেই পারেঃ

পুরোনো কাগজ আর শ্যাওলার গন্ধে ভরে আছে শুকনো বাতাস
করোটির ভিতরে ঝুমঝুম করছে ফুলঝুরি
বেঁচে থাকতে হবে এই গলি থেকে গলিতে আরো অনেকদিন
মুখের ওপর এসে লাগবে ঝোড়ো শব্দের ঝাপট
হেঁটে যেতে হবে আরো অনেক হাড়ের ওপর দিয়ে দুপুরের ঝলকে
সোনারুপোয় খড়খড় করে উঠবে কঙ্কাল

যদি তিরিশ বছর আগে কোনও কৌতূহলী পথচারী যাওয়ার পথে হঠাৎ একঝলক চোখ ফেলতেন এই সংকীর্ণ লেনটির ভিতরে, হয়তো একলহমা ছমছম করে উঠত গা।

অথচ এখন এই একবিংশ শতাব্দীতে বৈঠকখানা এলাকায় এই রাস্তাটির অন্য পরিচিতি। কলেজ স্ট্রিটের বইপাড়ার মূল অবলম্বন বলতে যা বোঝায় সেই প্রিন্টিং প্রেস, বাঁধাইখানা ইত্যাদিতে গিজগিজ করছে রাস্তাটা। দপ্তরিপাড়া বললে সকলেই একবাক্যে দেখিয়ে দেবে এই গলিটির দিকে। গলির ভিতর একটু হাঁটলেই চোখে পড়বে একটি বিখ্যাত বাড়ি, যেখানে একসময় বসবাস করতে ডা. আবুল হাসান। হয়তো খ্যাতনামা ডাক্তার হওয়ার সুবাদেই সেসময় আবুল হাসানের সঙ্গে খুবই নৈকট্য ছিল ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের।

মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে উৎপত্তি, তারপর এই গলিটি এঁকেবেঁকে একসময় পৌঁছে গিয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে। সকলেই জানেন কবি শঙ্খ ঘোষ একসময় বসবাস করতেন এই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে।

সেই অ্যান্টনিবাগান লেনের দু'পাশে এখন গড়ে উঠেছে একের পর এক বাঁধাইখানা, সেখানে প্রতিনিয়ত বাঁধাই হচ্ছে রাশি রাশি বই।

এখন আর টানা রিকশ চোখে পড়ে না, কিন্তু এই সেদিনও শোনা যেত টানা রিকশর সেই বিখ্যাত ঘণ্টি। রিকশয় টাল হয়ে থাকত রাশি রাশি নতুন বইয়ের ফর্মা। এখন টানা রিকশর পরিবর্তে রাজত্ব মুটেমজুরদের। তাদের মাথায় মাথায় পৌঁছে যায় হাজার হাজার বইয়ের ছাপা ফর্মা, পৌঁছয় বইয়ের রংচঙে প্রচ্ছদ, সেই সঙ্গে পুস্তানির কাগজ। র মেটিরিয়াল হাতে পেতেই শুরু হয়ে যায় বাঁধাইয়ের কাজ। বাঁধাইকরদের পাঁচ আঙুলের ভিতর লুকিয়ে থাকে এক আশ্চর্য ম্যাজিক। কী দ্রুততায় তাদের হাতের কারুকাজে ফর্মার বান্ডিলগুলি রূপান্তরিত হয়

হাজার হাজার বইয়ে। যেন ভেতো বাঙালিরা অ্যান্টনিবাগান লেনে ঢুকে বেরিয়ে আসছে সাহেবের মতো সাজুগুজু করে।

লোকে বলে, জন অ্যান্টনির নামে এখানে একটি বিশাল বাগান ছিল, তাই জায়গাটা পরিচিত অ্যান্টনিবাগান নামে। ক্রমে সেখানে গড়ে উঠেছে বসতি। মাঝে সরু একফালি রাস্তা, লোকের মুখে মুখে তার পরিচিতি হয়েছে অ্যান্টনিবাগান লেন। তিরিশ বছর আগে এই লেনই ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত পুরনো কাগজ, পথ ছিল ছ্যাতলা-ধরা। পথের দু'ধারের দেওয়ালগুলি ছিল জরাজীর্ণ, ঝিরঝিরে, ছায়াময়।

তিরিশ বছর আগের অ্যান্টনিবাগান লেনের কাছে পৌঁছে কবি দেখতে পাচ্ছেন মহাত্মা গান্ধী রোড দিয়ে ছুটে যাওয়া ট্রাফিকের হঠাৎ জ্যামে পড়ে স্তব্ধ হয়ে যাওয়া। কিন্তু ট্রাফিক থেমে গেলেও জ্যামে আটকে থাকা মানুষের কণ্ঠ কি থেমে থাকে! সেই শব্দ ধরা দিচ্ছে করতালের ধ্বনি হয়ে। কবির চোখে ফুটে উঠেছে এরকম ছবি:

ট্রাফিকজ্যামের ভিতর থেকে বেজে উঠবে
লক্ষদেড়েক করতাল
ঝিরঝিরে দেয়ালগুলি শুরু করবে নাচ
বড়ো হতে থাকবে, আরো বড়ো হতে
থাকবে অ্যান্টনিবাগান লেন
ফুসফুস উঠে আসবে আকাশের দিকে

কবি একরকম ভাবে অনুমান করেছিলেন কীভাবে বড় হয়ে উঠবে এই সংকীর্ণ গলি। কবিতাটি লেখার তিরিশ বছর পরে সেই গলির সামনে দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছিল সেই গলি এখন জন্ম দিচ্ছে রাশি রাশি বইয়ের। সাদা কাগজ প্রিন্টিং প্রেসে ঢুকে বেরিয়ে আসছে কালো রং মেখে, এক-একটি কাগজ রূপান্তরিত হচ্ছে এক-একটি ফর্মায়। সেই ফর্মা ঢুকে যাচ্ছে পাশের ঘরের বাঁধাইখানায়, বেরিয়ে আসছে প্রচ্ছদশোভিত বই হয়ে। এ এক আশ্চর্য ম্যাজিক। এও তো গলিটার আর-একরকম বড় হওয়া!

কিন্তু কবিতাটি পাঠ করার সময় পাঠকের মনে নিশ্চয় উদয় হতে পারে রাস্তাটির এহেন নামকরণের পিছনে লুকিয়ে আছে কী ইতিহাস!

গলিটির নাম শুনলেই একজন অ্যান্টনির নামই মনে পড়ে যায় পাঠকের, তিনি উপন্যাসের পৃষ্ঠায়, সিনেমার পর্দায় জায়গা পেয়ে যাওয়া অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। কিন্তু অ্যান্টনিবাগানের অ্যান্টনি সাহেব তিনি নন, জন অ্যান্টনি। তিনি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির পিতামহ। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাবর্ণ রায়চৌধুরি পরিবারের পূর্বপুরুষ বিদ্যাধর রায়ের ম্যানেজার।

অ্যান্টনিবাগান লেনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি তখন প্রবেশ করছি ফেলে আসা ইতিহাসের এক-একটি পৃষ্ঠায়। জন অ্যান্টনির সঙ্গে যেমন জড়িয়ে আছে বিদ্যাধর রায়ের নাম, তেমনই বিদ্যাধর রায়ের সঙ্গে ওতপ্রোত তাঁদের কলকাতার মালিকানা পাওয়া।

সাবর্ণ রায়চৌধুরিরা কীভাবে বহুলা (বর্তমান বেহালা) থেকে দক্ষিণেশ্বরের মালিক হয়েছিলেন, তা এক জাদুবাস্তবতার ইতিহাস। তাঁদের পূর্বপুরুষ কামদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী সন্তান প্রসবকালে মারা যাওয়ায় শোকবিহ্বল কামদেব তদ্দণ্ডেই গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে তপস্যা করতে শুরু করেছিলেন পুরীতে। এ-বিষয়ে অন্য মত হল, কামদেব পুত্রের জন্মের আগেই দৈববাণী শুনেছিলেন— পুত্রের জন্মের পর তাঁকে গ্রহণ করতে হবে সন্ন্যাস এক অনিবার্য কারণে।

কামদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানসিংহের বঙ্গবিজয়ের কাহিনি। আগ্রার সম্রাট জাহাঙ্গির তখন সেনাপতি মানসিংহের ওপর বেজায় কুপিত, তিনি চাইছিলেন যে-কোনও ভাবেই হোক মানসিংহ পরাজিত হোন কোনও শত্রুসৈন্যের কাছে, তাই তাঁকে পাঠালেন বঙ্গবিজয় অভিযানে। বাংলায় তখন বারোভুঁইয়ার প্রবল প্রতাপ। তাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে যদি মানসিংহের মৃত্যু হয়, তাহলে ইচ্ছাপূরণ হয় জাহাঙ্গিরের। যাত্রাপথে মানসিংহের সাক্ষাৎ হল সন্ন্যাসী কামদেবের সঙ্গে। তাঁর কাছে যুদ্ধজয়ের আশীর্বাদ চাইলে সন্ন্যাসী বলেন, তথাস্তু। সন্ন্যাসী তো বোঝেননি মানসিংহ যাচ্ছেন বাংলার ক্ষতিসাধন করতে। বঙ্গবিজয়ের মতো কঠিন কাজ সম্পন্ন করার পর মানসিংহের মনে পড়ে গেল সেই সন্ন্যাসীর কথা, তাঁর সঙ্গে দেখা করে দিতে চাইলেন গুরুদক্ষিণা।

কামদেব তখন মানসিংহকে জানালেন, কী পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সদ্যোজাত সন্তানকে ফেলে গ্রহণ করতে হয়েছিল সন্ন্যাসধর্ম। এতদিন পরে পুত্রকে অবহেলা করে ফেলে আসার জন্য তাঁর খুবই অনুতাপ হচ্ছে, সেই সন্তানকে যদি মানসিংহ ফিরিয়ে দিতে পারেন তো সেটাই হবে তাঁর গুরুদক্ষিণা। মানসিংহ অনুচর পাঠিয়ে খুঁজে বার করলেন সেই পুত্র লক্ষ্মীকান্তকে। তাকে কামদেবের হাতে শুধু সমর্পণই করলেন না, গুরুদক্ষিণা হিসেবে লক্ষ্মীকান্তকে জায়গির ও সনদ দিলেন বহুলা (এখন বেহালা) থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডের। সেইসঙ্গে রায়চৌধুরি উপাধিও দিয়েছিলেন লক্ষ্মীকান্তকে।

বিদ্যাধর রায় ছিলেন লক্ষ্মীকান্তর বংশলতিকার চতুর্থ পুরুষ। বর্তমান লালদিঘির কাছেই ছিল তাঁর একটি পাকাদালান, যা তখন ব্যবহৃত হত কাছারিবাড়ি হিসেবে। জোব চার্নক তখন কলকাতা শহর পত্তনের ডাক দিয়েছেন তখনকার জমিদার ও ব্যবসায়ীদের। কিন্তু তাঁর একটি অফিসঘর তো চাই। সেই কাছারিবাড়িটি সেখানকার একমাত্র পাকা দালান হওয়ায় সেখানেই স্থাপিত হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম রেকর্ডরুম।

আগেই বলা হয়েছে অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির পিতামহ জন অ্যান্টনি ছিলেন বিদ্যাধর রায়ের ম্যানেজার। কাছারিবাড়িটির কাছেই প্রতিষ্ঠিত ছিল সাবর্ণদের প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায় বিগ্রহ। লোকশ্রুতি এই যে, শ্যামরায়ের দোলপর্ব ছিল খুবই বিখ্যাত, সেখানে এত রং খেলা হত যে, লাল হয়ে যেত নিকটবর্তী দিঘিটি। যার ফলে তার নাম কালক্রমে হয়েছে লালদিঘি। অন্য মত জনৈক লালবিহারীর নামে দিঘির নাম।

শোনা যায় একবার দোলখেলার দিনে ইস্ট ইন্ডিয়ার কয়েকজন ফ্যাক্টর জোর করে প্রবেশ করতে গিয়েছিলেন শ্যামরায়ের ঠাকুরবাড়িতে। কিন্তু ম্যানেজার অ্যান্টনি কিছুতেই তাদের প্রবেশ করতে দেননি, তাতে জোব চার্নক প্রবল ক্রুদ্ধ হয়ে চাবুক চালিয়েছিলেন অ্যান্টনির গায়ে। মতান্তরে জোব চার্নক নিয়ে এসেছিলেন বন্দুক। বন্দুকের শব্দ করে ভয় দেখিয়েছিলেন অ্যান্টনিকে। তাতে অপমানিত অ্যান্টনি কলকাতার বাস তুলে দিয়ে বসতি করেন কাঁচড়াপাড়ায়। সেখানে তাঁর বাড়িটি এখনও বর্তমান, তাঁর প্রতিষ্ঠিত হাটটির নামও অ্যান্টনির হাট।

অ্যান্টনি-পৌত্র, যিনি অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি নামে পরিচিত, তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির নাম। কিন্তু গবেষকরা জানাচ্ছেন, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গির সঙ্গে ফিরিঙ্গি কালীবাড়ির কোনও সম্পর্ক ছিল না। এই কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শ্রীমন্ত ডোম নামে এক ব্যক্তি। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল সত্তর বছর বয়সে, তার আগে পর্যন্ত তিনি নিজে পূজারি ছিলেন এই কালীমন্দিরে। এই এলাকার ফিরিঙ্গি বাসিন্দাদের মধ্যে খ্যাত হয়ে ওঠেন শ্রীমন্ত ডোম। তখন বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল, ফিরিঙ্গিরা বসন্ত রোগের নিরাময় হলে পুজো দিয়ে যেতেন এই কালীবাড়িতে। তাই কালক্রমে এই মন্দিরের নাম হয় ফিরিঙ্গি কালীবাড়ি।

কবিতায় অ্যান্টনিবাগান লেনের কথা পড়তে গিয়ে যেমন আবিষ্কার করা গেল কলকাতার বিখ্যাত দপ্তরিখানা, তেমনই কলকাতা গড়ে ওঠার কিছু ইতিহাসও।

ক য়ে ক টি চি ঠি

কে কার পুনর্মুদ্রণ?

'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকার জুলাই-আগস্ট ২০১৩ সংখ্যায় 'কবিতার পাতা' বিভাগে 'কবিতা-পরিচয়' শীর্ষক আলোচনায় কবি শঙ্খ ঘোষ-এর যে লেখাটি প্রকাশ পেয়েছে সেটির মূল রচনা 'পরিকথা'র ষষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, মে ২০০৪, পৃ-১২২-এ পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, শান্তিনিকেতন-নিবাসী শ্রী দীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রোত্তর আলোকবৃত্তের তেরোজন কবি' গ্রন্থে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতাটি আলোচনা করেছেন অবশ্যই কবি শঙ্খ ঘোষের অনুসরণে।

'পরিকথা' পত্রিকা কালের যাত্রার পথে চলে গিয়েছে, সেখানে 'কালের কষ্টিপাথর' যে এইসব মণিমাণিক্য খুঁজে এনে নতুন করে পরিবেশনার ক্লেশ স্বীকার করে চলেছে, সেজন্য সম্পাদককে অসংখ্য ধন্যবাদ।

রণধীরকুমার দে

প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শা রোড, গল্ফ গার্ডেন, রামধন পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৩৩

সম্পাদকের কথা

*সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' কবিতাটি নিয়ে শঙ্খ ঘোষের এই লেখাটি **প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে 'কবিতা-পরিচয়' পত্রিকার পঞ্চম-ষষ্ঠ যুগ্মসংকলনে,** ২০০৪-এর মে মাসের 'পরিকথা'য় নয়। আসল সত্য, 'পরিকথা'য় লেখাটি 'কবিতা-পরিচয়' থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, হয়তো সেখানে সূত্র উল্লেখ করা হয়নি। ঘটনাচক্রে, 'কবিতা-পরিচয়'ও 'কালের কষ্টিপাথর'-এর বর্তমান সম্পাদকের দ্বারা পরিকল্পিত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত।*

কবিতা-পরিচয় প্রসঙ্গে অশোক মিত্র

হয়তো সম্প্রতি 'হীরু ডাকাত'-লিখে-সুবিখ্যাত অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ঘটনাটি মনে আছে, হয়তো ওঁর মনে নেই, কারণ ইতিমধ্যে দেড় কুড়ি বছরের বেশি সময় গড়িয়ে গেছে। ষাটের দশকে বরাবরই-কবিতা-পাগল অমরেন্দ্র চক্রবর্তী একটি অতি দুঃসাহসী সাময়িক পত্রিকা— 'কবিতা-পরিচয়' —প্রকাশ করতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পত্রিকাটির প্রতি সংখ্যায়— এখন ক'জনই আর মনে রেখেছেন সেই অত্যাশ্চর্য অভিযানের কথা—, সারা সংখ্যা জুড়ে, পাঁচটি-ছ'টি কবিতার আলাদা-আলাদা বিশ্লেষণ ছাপা হত, প্রতিটি বিশ্লেষণ আস্ত একটি প্রবন্ধের আকার পেত।

সূত্র: সাহিত্যচিন্তা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

কবিতা-পরিচয় প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ

কল্পনাপ্রবণ কলেজ-পড়ুয়া অমরেন্দ্র চক্রবর্তী (১৯৪২) শহর জুড়ে ছড়িয়ে থাকা কিছু সমমনস্ক মানুষের বাড়ি বাড়ি ঘুরছিলেন আধুনিক কবিতা আলোচনার জন্য একটি আদর্শ মঞ্চ তৈরির অভিপ্রায়ে। প্রায় একক কৃতিত্বে, হাতখরচের টাকা থেকে বাঁচিয়ে ১৯৬৬ সালের মে-তে তিনি বের করলেন একটি অনাড়ম্বর মাসিক পত্রিকা, প্রথম সংখ্যায় ছিল পাঁচটি কবিতা নিয়ে আলোচনা। ভিন্ন অভিমুখের দুই পূর্বজ পত্রিকার শিরোনামের সমন্বয় ঘটিয়ে এটির নাম দেওয়া হয়েছিল কবিতা-পরিচয়। (অনূদিত)

সূত্র: 'দ্য লিটারারি ওয়ার্ল্ড অব মডার্ন ক্যালকাটা, ১৯৪১-১৯৮০

ক্যালকাটা: এ লিভিং সিটি
সুকান্ত চৌধুরি (সম্পা.), ১৯৯০

কবিতা-পরিচয় প্রসঙ্গে জয় গোস্বামী

১৯৬৭ সালে, অথবা '৬৬-তেও হতে পারে— অমরেন্দ্র চক্রবর্তী শুরু করেছিলেন একটি পত্রিকার প্রকাশ। তার নাম 'কবিতা-পরিচয়'। এই পত্রিকাটিতে, প্রতি সংখ্যায়, বিভিন্ন কবির এক-একটি করে কবিতা ধরে তার ওপর আলোচনা করতেন অন্য অন্য কবি এবং আলোচকরা। আমি যে 'গোসাঁইবাগান' লেখার পরিকল্পনা করি, সেই পরিকল্পনা আমি অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'কবিতা-পরিচয়' দেখেই শিখেছি। অত ভালো তো আর হয়নি, কিন্তু এমনটা যে করা যায়, তা আমার মাথায় আসে অমরেন্দ্রবাবুর 'কবিতা-পরিচয়'-এর নির্বাচিত সংগ্রহ দেখার পর।

সূত্র: রোববার, সংবাদ প্রতিদিন
১ এপ্রিল, ২০১২

চণ্ডী লাহিড়ীর স্মৃতিচারণ

'কালের কষ্টিপাথর'-এর সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় বন্ধুবর ভানুবাবু (সবিতেন্দ্রনাথ রায়) কিছু লিখেছেন জর্জ বিশ্বাস সম্বন্ধে। একসময় আমি আনন্দবাজার পত্রিকায় সক্রিয়ভাবে ছিলাম। সন্তোষ ঘোষ নিঃসংশয়ে আমার গুরু। যদিও জানি, উদারমনা ভানুবাবু আদৌ অসত্য বলেননি, তবু আমার জানা দিকটাও বলা দরকার। দু'জনের কথা মিলিয়ে বর্তমান কালের সংশয়ী পাঠক নিজস্ব ধারণা গড়ে নেবেন।

একদিন সন্তোষদা তাঁর স্বনামে খুবই কঠোর ভাষায় জর্জ বিশ্বাসের গানের সমালোচনা করেন। পরদিন খুব সকালে আমার মেসে হাজির আমার বন্ধু সহকর্মী এবং প্রাক্তন শান্তিনিকেতনিক কিশলয় ঠাকুর। আমায় নিয়ে কিশলয় চলে গেল রাসবিহারীর ত্রিকোণ পার্কে। আমার সঙ্গে জর্জ বিশ্বাসের পরিচয় করিয়ে দিয়ে কিশলয় তাঁকে জানালেন, 'আজকের কাগজে সন্তোষবাবু আপনার গান নিয়ে যা লিখেছেন, সেটা সত্যিই খুব কড়া মেজাজের হয়েছে। প্রেসে কপি ছেড়ে দেওয়ার পর সেটা তিনি খেয়াল করেছেন। ব্যাপারটা খুবই দুঃখের। আমাদের দু'জনকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন তাঁর দুঃখের কথা জানাতে।'

জর্জ বিশ্বাস তৎক্ষণাৎ, অনেকেই হয়তো বিশ্বাস করবেন না, অত্যন্ত বিনয়সহকারে বললেন, 'তিনি গুণী মানুষ, সর্বদাই খুব ব্যস্ত থাকেন। আমার গান শোনার যে সময় পেয়েছেন, এটাই তো যথেষ্ট। এতে দুঃখের কী আছে!'

অকপটে স্বীকার করি, সেসময় আনন্দবাজারে আমরা সবাই কমিউনিস্ট-বিরোধী ছিলাম। দেবব্রত বিশ্বাস আই পি টি এ করতেন। একটু প্রকাশ্যেই করতেন। আনন্দবাজারের মন্ত্রিসভায় নিয়মিত আসতেন শিবনারায়ণ রায়, সমরেন রায় এবং ঘরের লোক গৌরকিশোর ঘোষ। সবাই এম এন রায়ের প্রাক্তন শিষ্য।

'কালের কষ্টিপাথর' যেহেতু রাজনীতিক তরজার আখড়া নয়, এবিষয়ে আর আলোচনা নাস্তি। শুধু এটুকু বলি, যা অতীতে করেছি তার জন্য একচুল লজ্জিত নই। ডিগবাজি কার্টুনিস্টের ধর্ম নয়। ভানুবাবু চিরদিনই সবার বন্ধু এবং তাঁর স্মৃতিশক্তি এখনও প্রবল। জর্জদার বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত হয়েও থাকতে পারে। আমি Plausible শব্দটি ব্যবহার করছি। কার্টুনিস্ট হিসেবে আমি সত্যকথনে দায়বদ্ধ।

চণ্ডী লাহিড়ী

এম আই জি, কলকাতা-৭০০ ০৩৭

কাদম্বরী-রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কপারিবারিক কেচ্ছা?

'কালের কষ্টিপাথর' সেপ্টেম্বর, ২০১৩ সংখ্যায় শ্রী নিত্যপ্রিয় ঘোষ মহাশয় 'কাদম্বরী সমাচার' নামে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন, সেই

প্রসঙ্গে কিছু কথা না বলে পারছি না। কাদম্বরী-রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক 'পারিবারিক কেচ্ছা' কথাটি মেনে নেওয়া কঠিন।

শ্রী রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাদম্বরীর সুইসাইড নোট' সম্পর্কে কোনও আলোচনায় না গিয়েও একথা বলাই যায়, কাদম্বরী ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অল্পবয়সের নিঃসঙ্গ দিনগুলির অন্যতম সঙ্গী। যিনি হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে মাতৃহীন কিশোরের প্রথম সাহিত্য জীবনের শরিক হন। একসঙ্গে বঙ্গদর্শন পড়া, ছাদের নন্দনকাননে সাহিত্যবাসর আয়োজন করে কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠের মঞ্চ গড়ে তোলা, বিহারীলালের তুলনায় তাঁকে নগণ্য প্রতিপন্ন করে ক্রমাগতই রবিকে নিত্যনতুন লেখায় প্ররোচিত করা, চন্দননগরে দু'জনের একান্ত অবসরকালে রবির 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' এবং 'বিবিধ প্রসঙ্গ' লেখা এবং কাদম্বরীর রবিকে ভানু বলে ডাকা, এসবই আশ্চর্য মধুর এক সম্পর্কের হদিশ দেয় না কি?

কাদম্বরীর আকস্মিক মৃত্যু রবীন্দ্রনাথকে কী গভীর শূন্যতায় ঠেলে দেয় তাঁর 'জীবনস্মৃতি'র মৃত্যুশোক অধ্যায়ে তা সুস্পষ্ট। কাদম্বরীর মৃত্যু প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'চব্বিশ বছর বয়সের সময় মৃত্যুর সঙ্গে যে পরিচয় হইল তাহা স্থায়ী পরিচয়।... কোথা হইতে মৃত্যু আসিয়া এই প্রত্যক্ষ জীবনটার একটা প্রান্ত যখন এক মুহূর্তের মধ্যে ফাঁক করিয়া দিল, তখন মনটার মধ্যে যে কি ধাঁধাই লাগিয়া গেল, চারিদিকে গাছপালা মাটি জল চন্দ্রসূর্য গ্রহতারা তেমনি নিশ্চিত সত্যের মতো বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মতো যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমনকী দেহপ্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য বলিয়া অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্মখণ্ডন। যাহা আছে এবং যাহা রহিল না, এ উভয়ের মধ্যে কোনমতে মিল করিব কেমন করিয়া।'

সেই দিশেহারা অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের শয়ন ছিল তেতলায় বাইরের বারান্দায়, সম্ভবত কাদম্বরীর ঘরের সামনে, খাওয়াদাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। ধুতির ওপর কোনওমতে একটা চাদর জড়িয়ে থ্যাকারের দোকানে বই কিনতে যেতেন।

কাদম্বরীর মৃত্যু সেদিন তরুণ রবীন্দ্রনাথকে যে সর্বব্যাপী হাহাকারের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, তা তাঁর 'পুষ্পাঞ্জলি' নামক সমসাময়িক রচনায় প্রকাশিত। কবি লিখছেন 'হে জগতের বিস্মৃত' আমার চিরস্মৃত, আগে তোমাকে যেমন গান শুনাইতাম, এখন তোমাকে তেমন শুনাইতে পারি না কেন। এসব লেখা তোমার জন্য লিখিতেছি। পাছে তুমি আমার কণ্ঠস্বর ভুলিয়া যাও, অনন্তের পথে চলিতে চলিতে যখন দৈবাৎ তোমাতে আমাতে দেখা হইবে তখন পাছে তুমি আমাকে চিনিতে না পার, তাই প্রতিদিন তোমাকে স্মরণ করিয়া আমার এই কথাগুলি তোমাকে বলিতেছি, তুমি কি শুনিতেছ না!— এমন একদিন আসিবে যখন এই পৃথিবীতে আমার একটি কথাও কাহারও মনে থাকিবে না— কিন্তু ইহার একটি দুটি কথা ভালবাসিয়া তুমিও কি মনে করিবেনা।'

এরকমই অজস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত আবেগ সম্বলিত 'পুষ্পাঞ্জলি' 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল, একি 'পারিবারিক কেচ্ছা'? নাকি আমাদের প্রিয় কবির গভীরতম যন্ত্রণার ছবি?

কাদম্বরীর মৃত্যুর আগে ও পরে মোট এগারোটি বই রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীকে উৎসর্গ করেছেন (সূত্র কবিমানসী, প্রথম খণ্ড-জগদীশ চন্দ্র ভট্টাচার্য)।

শ্রীমতি হে যে কাদম্বরীদেবী তা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রজীবনী প্রথম খণ্ডে জানা যায়। নামটি তাঁর নিকট আত্মীয়াদের দেওয়া। গ্রিক দেবী হেকেটির নামানুসারে। সজনীকান্ত দাসের মতে অলীকবাবু নাটকে হেমাঙ্গিনী চরিত্রে কাদম্বরীদেবী অভিনয় করেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ তাকে 'হে' বলতেন। অথচ শ্রী ঘোষের মতো বিদগ্ধ মানুষ বেমালুম বলে দিলেন শ্রীমতি হে কে তিনি জানেন না।

কাদম্বরীর মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যেই অকাল মৃত্যু হয় রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি নিশ্চয় রবীন্দ্রনাথকে স্নেহ করতেন। কিন্তু তাঁকে রবীন্দ্রনাথ একটি বইও উৎসর্গ করেছেন কিনা জানা নেই। সহোদর ভাইকে ঘিরে কবির কোনও প্রবল শোকোচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে না।

অথচ কাদম্বরীর স্মৃতি ফিরে এসেছে বারে বারে সারা জীবন ধরে কবির নানা কথায়, গানে, ছবিতে। ছবি আঁকতে বসে কেবল তাঁর চোখই মনে পড়ে, একথা নন্দলাল বসুকে কবি বলছেন। 'ছবি' (তুমি কি কেবল ছবি) কবিতাটি বহু বছর পরে এলাহাবাদে হঠাৎ নতুন বৌঠানের ছবি দেখে লিখেছেন, একথা কৃষ্ণ কৃপালনীকে কবি বলেছেন। লিপিকায়— 'প্রথম শোক' কবিতায় কাদম্বরীর উপস্থিতি বুঝতে অসুবিধে হয় না, এসবই কবির প্রায় বার্দ্ধক্যে পৌঁছবার সময়ের ঘটনা।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ নিজে লিখেছেন, কবি সুবীন্দ্রনাথ দত্ত কবির শেষ বয়সের ঘনিষ্ঠ অনুচরদের একজন এবং তিনি এও উল্লেখ করেছেন, সুবীন্দ্রনাথ দত্ত শিক্ষিত, রুচিবান কবি, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং অধ্যাপক। তাঁর মতো অনুভূতিশীল মানুষ কিছু না ভেবেচিন্তে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখে ছাপাবেন, তা অভাবনীয়। এবং যে পত্রিকায় তা ছাপানো হয়েছে সেই 'Quest' পত্রিকাটি আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং অম্লান দত্ত সম্পাদিত। যাঁদের বৈদগ্ধ সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন তোলার স্পর্ধা বাঙালি পাঠকের নেই।

এটাই স্বাভাবিক ঘনিষ্ঠ অনুচরদের কাছে রবীন্দ্রনাথ এমন কোনও অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন, যার থেকে সুবীন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক প্রবন্ধে লেখেন, 'That in course of time he and the wife of his brother Jyotirindranath fell desperately in love with each other did not mend matters at all, and when the family married him off presumably to prevent scandal, had got worsed until his sister in law killed herself.'

এ কেচ্ছাও নয়, বোমাও নয়। আমাদের প্রিয় কবিকে বুঝতে হলে, তাঁর সৃষ্টিকে বুঝতে হলে শুধু তর্জনী না তুলে একটু অনুভূতি দিয়ে এই সম্পর্কটিকে বুঝতে হবে। যে প্রয়াস শ্রী জগদীশ ভট্টাচার্য তাঁর দু'খণ্ড কবিমানসীতে করেছেন। যা খুঁজতে গিয়ে গোয়ার বাসিন্দা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর সুধীর কক্করের মতো মনোবিশেষজ্ঞর হাত দিয়ে বেরোল রবিকবির মনস্তাত্ত্বিক জীবন; ইয়ং টেগোর; দ্য মেকিং অব আ জিনিয়াস, যাতে নতুন বৌঠানের সঙ্গ এবং মৃত্যু কেমনভাবে ছায়া ফেলেছিল তাঁর সৃষ্টিতে, কেমনভাবে গড়ে উঠেছিল তাঁর মন, সেই মোহনায় গিয়ে পৌঁছলেন। সম্প্রতি টলিক্লাবে যে বইয়ের উদ্বোধন হল।

এ অন্বেষণ কোনও পারিবারিক কেচ্ছার অন্বেষণ নয়, এ আমাদের প্রিয় কবির গভীরতম অনুভূতির উৎসের অন্বেষণ।

জনা মজুমদার

১ টেগোর পার্ক, আর এন টেগোর রোড, কলকাতা-৫৬

দেবেশ রায়ের দাওয়াত

ঔপন্যাসিক দেবেশ রায়ের আমি অন্ধ ভক্ত বললে খুব বেশি বলা হয় না। 'কালের কষ্টিপাথর'-এ তাঁর 'দাওয়াত'-এ পাঠক হিসেবে পাত পেড়ে বসে গেছি। পরমান্নও

পেয়েছি। প্রথমেই মৈত্রেয়ী রায় মৌলিকের দুটি গল্প পড়ে আমি মাত। সম্পূর্ণ অচেনা এই গল্পলেখক ওই দুটি মাত্র গল্পেই বাংলা ছোট গল্পের সমৃদ্ধ ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশাধিকার অর্জন করে নিয়েছেন।

দেবেশ রায়ের উপস্থাপনায় ওপার বাংলার পারভেজ হোসেন তো দিব্যি দুই দেশের সীমান্তের কাঁটাতার ছিঁড়ে এই বাংলায়ও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। 'কালের কষ্টিপাথর'-এর একই সংখ্যায় তাঁর 'ডুবো চর' ও 'বাড়ির বাজার' গল্পদুটি আয়তনে ছোট হয়েও পাঠকের মনে বেশ বড় একটা জায়গা জুড়ে থাকবে।

পরের সংখ্যাতেই শ্বেতা সরখেল। তাঁর গল্প পড়া তো দূরের কথা, লেখকের নামও আগে কখনও শুনিনি। দেবেশ রায়ের সুনির্বাচিত অতিথি তালিকায় তাঁকে পেয়ে আমি আমার প্রিয় ঔপন্যাসিকের কাছে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ এই পত্রিকার সম্পাদকের কাছেও। না বলে পারছি না, 'মিটিংয়ের আগেপরে' ও 'আহত পরিযায়ী'র মত গল্প না পড়লে ভাল ছোটগল্পের নিত্য আবিষ্কার বন্ধ হয়ে যায়।

তারপর শাহীন আখতার। তাঁর 'ভিউপয়েন্ট', 'ছয় বছর আগে' ও 'লেমিংয়ের অন্তর্জলি যাত্রা' নামে তিনটি গল্পেই আমাদের গল্প উপভোগের যে অভ্যাস তাকে খুব নিচু স্বরে, সস্নেহে ভেঙেচুরে তিনি গল্প বলে গেলেন। প্রত্যেকটা গল্পের শুরুটাই নিমেষে লেখকের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করে দেয়। শুরু থেকেই স্বতন্ত্র— এটাই বোধহয় দেবেশ রায়ের দাওয়াতে উপস্থিত প্রত্যেক অতিথির সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

আবার, লক্ষ করতে বাধ্য হলাম, সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'অবিনশ্বর বিস্মরণ'। এই লেখকও আমার অপরিচিত, বেশ ভালো লেখা। লেখাটা মনে হয় বহু পরিশ্রমের ফল, তাঁর এই শ্রমার্জিত সাফল্য গল্পটিকে একটি অন্য মাত্রা দিয়েছে। আমি দুবার পড়েছি। দেবেশ রায়ের মুখবন্ধে জেনে অবাক হলাম যে, এই লেখকের গল্প কোনও সম্পাদকেরই ভাল লাগেনি। দেবেশ রায় তাঁর স্বভাবত চমকে দেওয়া বাক্যে ভারি মনোরম করে বলেছেন, 'আমি সুমিতার একটি গল্পও পড়িনি, যা আমার ভাল লাগেনি ও আমি একজন সম্পাদককেও পাইনি, যাঁর ওঁর গল্প ভাল লেগেছে।'

সম্পাদকের ভাল না লাগা, কিন্তু পরবর্তীকালে খ্যাত হয়েছে এমন বেশ কিছু লেখার কথা আমরা জানি। শুনেছি সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখাও তখনকার সুবিখ্যাত পত্রিকায় গৃহীত হয়নি। তবে কোনও সম্পাদকেরই ভাল না-লাগাকে কোনও লেখার বিশেষ গুণ বলে ধরে নেওয়া কতদূর যথার্থ তাও তো জানি না। তার ওপর তিনি যখন লেখেন, 'সুমিতাই সেই লেখক, যাঁর গল্প পাঠক কিছুতেই ভাল বলবে না। অথচ খারাপও বলবে না।'—তখন একটু ধন্দে পড়ি। পাঠকের ভাল না বলাও কি লেখকের পক্ষে গৌরবের? এ বিষয়ে দেবেশবাবু কিছু আলোকপাত করলে কৃতজ্ঞ বোধ করব।

কৌশিক বিশ্বাস
মুর্শিদাবাদ

রবীন্দ্র অবনীন্দ্র ও রাণী-কথা

'কালের কষ্টিপাথর' পত্রিকার সেপ্টেম্বর ২০১৩ সংখ্যায় অমিতাভ চৌধুরীর 'মহাজনসঙ্গ' পর্যায়ে অনিল চন্দ ও রাণী চন্দ প্রসঙ্গে দু'-একটা কথা বা কুড়িয়ে পাওয়া স্মৃতির টুকরো উল্লেখ করার জন্যই এই পত্র। 'রাণী ঠিক সময়টিতে এসেছে। তোকে আর জসীম উদ্দিনকে এক সময় কত পুরনো গল্প বলেছি, তোরা তো লিখে রাখলি না। রাণীই দেখছি পারবে।...লিখুক রাণী। থেকে যাবে।'

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলছেন তাঁর দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে। মোহনলাল লিখেছেন সেকথা তাঁর বই 'দক্ষিণের বারান্দা'তে। 'থেকে যাবে'— এই শব্দবন্ধের মধ্যে জেগে আছে যে প্রচ্ছন্ন বিষাদের সুর, তারও একটা আভাস পাচ্ছি ওই লেখারই অন্যত্র। সেখানে অবনীন্দ্র বলছেন, 'জোড়াসাঁকোর মনে ভাঙন ধরেছে। তার উপর যুদ্ধ বাধল। বলে কিনা, বাড়ি বেচবার এই সুযোগ। আর তর সইছে না কারও।'

জমিদারি গিয়েছে, বাড়িটাও দ্রুত কালানুসরণ করবে, কিছুই থাকবে না, সেই অনিশ্চয়তা থেকেই হয়ত ঠাকুরবাড়ির পুরনো আখ্যান চিরকালীন করে রাখার মরিয়া ভাবনা জায়গা নিয়েছিল অবনীন্দ্রের মনে। উপরন্তু জুটে গেল তাঁর 'রবিকা'র তাগিদও।

রবীন্দ্রনাথ সেসময় কালিম্পংয়ে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তড়িঘড়ি তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে জোড়াসাঁকোয়। আর ওদিকে শান্তিনিকেতনে বসে সে খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন রাণী চন্দও চলে এসেছেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে।

প্রতিদিনই পাঁচ নম্বর বাড়ি অর্থাৎ নিজেদের মহল থেকে ছয় নম্বরে তাঁর 'রবিকা'কে দেখতে আসেন অবনীন্দ্র। কিন্তু ঘরে ঢোকেন না। জিজ্ঞেস করলে আঁৎকে উঠে বলেন, 'রুগ্‌ণ সিংহ বিছানায় পড়ে, ও আমি দেখতে পারব না।' তবে যেদিন শোনেন, 'রবিকা' একটু ভালো আছেন, সুখী দেখায় তাঁকে। সেদিন অনর্গল পুরনো কথা বলে যান। আর যাবার সময় বলেন, '...কাউকে আমি বলতে পারিনি কিছু। আজ কেমন এসে গেল আপনা হতে। এগুলি মূল্যবান কথা, নষ্ট কোরো না— ধরে রেখো।'

রবীন্দ্রনাথ অল্প সুস্থ হতে শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। সঙ্গে রাণীও। অবনীন্দ্রনাথের মুখের কথাগুলিকে তিনি খাতায় লিখে রাখেন।

সেই লেখা রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ল, রবীন্দ্রনাথ পড়ছেন, সেই মুহূর্তের বিবরণ দিতে গিয়ে রাণী চন্দ লিখেছেন, পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের মুখ লাল হয়ে উঠছে, কপালে ঘাম। রাণী তো উদ্বেগে কাঁটা, আবার না অসুস্থ হয়ে পড়েন! শেষ করে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, অপূর্ব হয়েছে। অবন বলে যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। রাণী চন্দকে আবার পাঠালেন জোড়াসাঁকোয়, 'অবনকে গিয়ে আমার নাম করে বলিস, আমি শুনতে চেয়েছি।'

একথা শুনে উদ্বেল অবনীন্দ্রনাথ। রাণী চন্দকে বললেন, 'যত পারো নিয়ে যাও, সময় আমারও বড় কম। কে জানত, রবিকা আমার এইসব গল্প শুনে এত খুশি হবেন।' রাণী চন্দ লিখছেন, 'বলতে বলতে তাঁর চোখ ছলছলিয়ে আসত।...আমি যেন দুজনের স্নেহ-ভালোবাসার বাহন হয়ে গিয়েছিলাম তখন।'

রবীন্দ্রনাথ পড়েন আর স্বগতোক্তি করেন, 'ছবির পর ছবি ফুটিয়ে গেছে অবন। কী সুন্দর সেকালের আমাকে তুলে ধরেছে। সবাই ভাবে আমি চিরকাল বাবুয়ানি করেই কাটিয়েছি পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে। কিন্তু কিসের ভিতর দিয়ে যে আমাকে আসতে হয়েছে, এই লেখাগুলোতে তা স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে।'

রবীন্দ্রনাথের নির্দেশেই ছাপা হয়ে বের হল 'ঘরোয়া'। যার প্রতি পাতায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে এ বঙ্গের এক সালংকারা যুগের ছবি, জোড়াসাঁকোর ভরাভার্তক ঠাকুরবাড়ির যৌবনকাল এবং তরুণ রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উচ্ছ্বাস। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ আদৌ অকপট নন। তা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে যত না প্রকাশ করে, ঢাকে তার চেয়ে ঢের বেশি। রাণী চন্দ তাঁর মতো করে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর যুগকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, নিজে থেকে গিয়েছেন অন্তরালে।

সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়
বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা

ত্রিধারায় তিন নারী, কেন্দ্রে কলকাতা

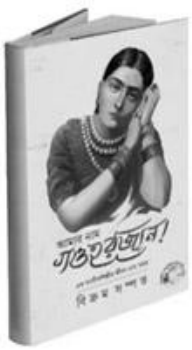

বিক্রম সম্পতের বইটি ইংরেজিতে 'মাই নেম ইজ গওহরজান' নামে প্রকাশ পেয়েছিল ২০১০ সালে। অনেকেরই মনে পড়বে গ্রামোফোন রেকর্ডের আদিযুগে গওহরজান তাঁর গান শেষ করতেন স্বকণ্ঠে এই ক'টি শব্দ বলে। এটা তাঁর স্টাইল হয়ে গিয়েছিল একসময়, তবে সে স্টাইল স্বেচ্ছাকৃত নয়। সেসময় গ্রামোফোন ডিস্কের ওপর শিল্পীর নামসহ লেবেল ছাপা হত বিলেতে। ফলে, রেকর্ডে শিল্পী নিজের নাম স্পষ্ট উচ্চারণে বলে না দিলে ঠিক রেকর্ডে ঠিক লেবেল লাগানো মুশকিল হত ইংরেজ কর্মীদের পক্ষে।

নতুন বই

বিক্রম সম্পত-এর
আমার নাম গওহরজান!

সম্প্রতি ইংরেজি বইটির একটি শোভন বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাঙালির পক্ষে এ খুবই আনন্দের কথা, শ্লাঘারও। কারণ কলকাতার সঙ্গে গওহরজানের সম্পর্ক অনেকটা গ্রামোফোন রেকর্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের মতোই প্রাচীন, ওতপ্রোত ও মাধুর্যময়।

জীবনের সবচেয়ে বড় অংশটাই তিনি বাস করে গিয়েছেন কলকাতার চিৎপুরে নাখোদা মসজিদ সংলগ্ন সুবিশাল 'গওহর বিল্ডিং'-এ। যদিও এখন সে বাড়ির নাম বদলে গিয়েছে এবং গওহরজানের প্রায় কোনও স্মৃতিই আজ আর কলকাতায় নেই। সেটা অবশ্য কেবল কলকাতার দোষ নয়। গওহরজানের ব্যক্তিগত ভাগ্যবিপর্যয়ও এর জন্য অনেকটা দায়ী। লোককথায় যে শাপভ্রষ্ট গন্ধর্বের উল্লেখ পাওয়া যায় গওহরজান যেন অনেকটা তাই। তাঁর গোটা জীবন এক অনন্ত ভেসে বেড়ানোর কাহিনি। নাম-যশ-সম্পদ সবই তাঁর কাছে এসেছে দু'হাত ভরে। কিন্তু কিছুই ধরে রাখতে পারেননি গওহরজান। ভালোবাসাকেও পারেননি।

গওহরজানের রূপকথাসম কাহিনি বলতে গিয়ে অনেকটাই পিছিয়ে শুরু করেছেন লেখক। ফিরে গিয়েছেন ১৮৫০ সালের আজমগড়ে রুক্মিণী নাম্নী এক নারীর কাছে। সুয়েজখাল খুলে যাওয়ার পর ততদিনে এদেশে সাধারণ ইংরেজ নাগরিকদের গতায়াত অনেকটাই বেড়েছে।

নানা কার্যোপলক্ষে, চাকরি কিংবা ব্যবসাসূত্রে তাঁরা এদেশে অহরহ আসছেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে কাজ করতে আসছেন যাঁরা, শর্তানুযায়ী তাঁদের সঙ্গে স্ত্রীদের আসার সুযোগ নেই। তাছাড়া দেশি বউ রক্ষণাবেক্ষণে খরচ অনেক কম। ফলে যাঁরা বেশ কিছুদিনের জন্য ভারতবাসের লক্ষ্যে আসছেন, তাদের এদেশে কোনও মহিলাকে বিবাহ করে সাময়িক সংসারপাতার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। রুক্মিণীরও জুটে গেল এমনই এক তরুণ ইংরেজ পাত্র। পাত্রের নাম হার্ডি হেমিংস। রুক্মিণী খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন। ধর্মান্তরকরণের পর তাঁর নাম হল এলিজা। ক্রমে তাঁদের দুটি সন্তান হল— ভিক্টোরিয়া বা বিকি এবং বেলা। এই ভিক্টোরিয়ারই সন্তান গওহরজান। বাবা আর্মেনীয়। ১৮৭৩ সালের ২৬ জুন তাঁর জন্ম। নাম রাখা হয়েছিল এলিন অ্যাঞ্জোলিনা ইয়োআর্ড। কিন্তু স্বামী রবার্ট ইয়োআর্ডের সন্দেহবাতিক স্বভাবের জন্য ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে অচিরেই তার বিচ্ছেদ হয়। কন্যাকে নিয়ে ভিক্টোরিয়া আবারও বৃদ্ধা মায়ের সংসারে ফিরে আসে। এরকমভাবে বেশ কিছুকাল কাটার পর খুরশিদ নামে এক মুসলমান ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ। খুরশিদ রুচিবোধসম্পন্ন মানুষ, উর্দু কবিতার প্রতি অনুরক্ত। এই খুরশিদ আমৃত্যু ভিক্টোরিয়ার পাশে থাকবেন। কিন্তু আপাতত খুরশিদ ও ভিক্টোরিয়ার সম্পর্ককে মেনে নিতে অস্বস্তি হল সমাজের। ফলে আজমগড়ের পাততাড়ি গুটিয়ে সকন্যা দম্পতি চলে এলেন গঙ্গাতীরে বেনারসে।

বেনারসের সাংগীতিক পরিবেশ গওহরের জীবনে একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। প্রথমত এখানেই অ্যাঞ্জোলিনা নাম মুছে তিনি গওহর নামটি পেলেন। ফার্সিতে গওহর শব্দের অর্থ মূল্যবান রত্ন। দ্বিতীয়ত এই বেনারসেই প্রখ্যাত শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী বেচু মিশ্রের কাছে তাঁর সংগীতের শিক্ষাও শুরু হল।

গওহরের মা ভিক্টোরিয়া, খুরশিদকে বিবাহের পর যিনি মলকাজান— মুজরো করতে যাওয়ার সময় গওহরকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে শুরু করলেন। গওহরের রূপ যেন ফেটে পড়ছে। তেমনই খোলতাই হয়েছে তাঁর কণ্ঠ। ইতিমধ্যে ততদিনে ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিতেও ঘটে চলেছে একের পর এক ঘটনা। ইংরেজরা অউধ থেকে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে কলকাতায় নির্বাসন দিয়েছে। রুচিমান, কবি, নর্তক, মজলিসি নবাব অত্যন্ত বেদনা নিয়ে কলকাতার মেটিয়াবুরুজ নামে এক অঞ্চলে তাঁর রাজপাট গড়ে তুলেছেন। বেনারসে মালকাজান যখন খ্যাতির শীর্ষে, তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন কলকাতায় গিয়ে অনেক বৃহত্তর মঞ্চে নিজেকে যাচাই করবেন।

বেনারসের মলকাজান কলকাতায় পা রাখতে না রাখতেই সে খবর পৌঁছে গিয়েছিল ওয়াজিদ আলি শাহের কাছে। মলকা নিজেও ততদিনে উর্দু শায়েরি লেখায় হাত পাকিয়েছেন। নবাব নিজে তো কবিই। তাঁর 'বাবুল মোরা নাইহার ছুটো হি জায়ে' এবং 'জব ছোড় চলে লক্ষ্ণৌ নগরী'— দুই হৃদয়বিদারক গান পেশ করে নবাবের চোখে জল এনে দিলেন মলকা। পুরস্কারের সঙ্গে বাড়তি এখানে যেটা মিলল তা হল নৃত্যগুরু বিনদাদিন মহারাজের কাছে গওহরের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

বাইজিদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে দেখা যেত এটাই যে, তাঁদের অধীত বিদ্যা বংশপরম্পরায় প্রবাহিত হচ্ছে। মলকাজানের সেই প্রথার বাইরে এসে বিখ্যাত ঘরানেদারের কাছে মেয়ে গওহরকে দিয়ে দেওয়া তখনকার সামাজিক প্রেক্ষিতে একটু আশ্চর্যের বইকি। পরবর্তীকালে কালে খাঁ, মউজউদ্দিন খাঁ— সহ বহু নামী উস্তাদের কাছে সংগীতশিক্ষা করেছেন গওহর।

একটা সময় গওহরজানকে ছাড়া কলকাতায় কোনও বড় মেহফিলই হত না। শুধু কি কলকাতা? ভারতের প্রায় সমস্ত প্রতিপত্তিশালী রাজার রাজদরবারে ডাক পড়তে থাকল গওহরজানের। প্রচুর অর্থ আসতে থাকল। দাতিয়ার মহারাজা তো আস্ত একটা হাতিই দান করে বসলেন।

সন্দেহ নেই গওহরের এহেন খ্যাতির পিছনে একটা বড় কারণ ছিল কলকাতায় গ্রামোফোন রেকর্ডের আবির্ভাব। গ্রামোফোন কোম্পানি তৎকালীন অনেক বড় উস্তাদের গান রেকর্ড করতে উৎসাহী ছিল। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা বিফল হয়। কেন না অধিকাংশ উস্তাদই হাতমুখ নেড়ে চেঁচিয়ে গান গাইতে অভ্যস্ত ছিলেন। রেকর্ডিং ব্যবস্থার আদি যুগে গায়ককে চোঙার মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে গাইতে হত। সেসময় উস্তাদ যাতে কোনওভাবে শরীর নাড়তে না পারেন সেজন্য দু'পাশ থেকে ষন্ডা চেহারার লোকজন উস্তাদের মাথা, শরীর, হাত শক্ত করে চেপে ধরে থাকতেন। কার্যত এই তীব্র শারীরিক নিগ্রহের মধ্যে উস্তাদের গান তেমন ফুটত না। তাছাড়া, খেয়ালের রূপ সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে যে-সময়ের প্রয়োজন, গ্রামোফোন রেকর্ডে ততটা পরিসর একেবারেই পাওয়া যেত না।

গওহর কিন্তু নিজস্ব এক গায়কি তৈরি করে নিয়েছিলেন। অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রেকর্ড করতে হলেও তাঁর স্বরক্ষেপণ, মীড়ের কাজ, এমনকী উঁচু পর্দায় কণ্ঠের চলাফেরা একেবারে অবিকৃত থাকত। ফলে গ্রামোফোনের কর্তাদের প্রিয় শিল্পী হয়ে উঠলেন গওহরজান। তাঁরা নিশ্চয়ই এ গানের বিন্দুবিসর্গ বুঝতেন না। কিন্তু ব্যবসাটা অবশ্য বুঝতেন। তাঁরা বুঝেছিলেন এদেশের মানুষ গওহরের কণ্ঠে পেয়ে গিয়েছে বিনোদনের স্বাদ।

গওহরের নিজের জীবন কিন্তু তখনও চলেছে নানা টালমাটাল অবস্থাবিপাকের মধ্য দিয়ে। মাত্র তেরো বছর বয়সে খয়েরগড়ের বৃদ্ধ রাজার কাছে কৌমার্য হারাতে হয়েছিল তাঁকে। তারপর থেকে গওহর বাইরে যতই চড়া আলো, রানির বেশ, তারিফ, হাততালি পেয়েছেন, অন্দরে ততই শূন্য হয়ে গিয়েছেন আর খুঁজে ফিরেছেন ভালোবাসার মানুষটিকে।

প্রথমে বেনারসের বিখ্যাত বংশের প্রতিনিধি রাই ছগন, তারপর বহরমপুরের ভূস্বামী নিমাই সেন, মুম্বইয়ের নাট্যপরিচালক অমৃত কেশব নায়েক, এমনকী নিজের ম্যানেজার আব্বাসের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন গওহরজান। কোনও সম্পর্কই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কখনও এইসব সম্পর্কের থেকেই তীব্র

মেহফিলে গওহরজান

আর্থিক প্রতারণায় জর্জরিত হয়েছেন।

শেষদিকে যা রোজগার করেছেন তার সবটাই প্রায় বিলাসব্যসনে অকাতরে খরচ করেছেন গওহর। বেড়ালের বিয়ে দিয়ে লোক খাইয়ে খরচ করেছেন দুহাজার টাকা, বেড়ালের ছানা হলে খরচ বেড়ে কুড়ি হাজার হয়েছে। তাঁর চোখধাঁধানো পোশাক আর গহনা ছিল শহরের চর্চার বিষয়। যখন চার ঘোড়ায় টানা ফিটনে ইংরেজ রাজপুরুষ ছাড়া কারও রাজপথে বেরনো নিষিদ্ধ ছিল, গওহরজান সেইরকম গাড়িতে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যেতেন।

গওহরজান সম্পর্কে এমনই অনেক তথ্যে ঠাসা এই বই। লেখকের অধ্যবসায়ের তারিফ করতেই হয়। কেবল যে-শহরের সঙ্গে গওহরজানের প্রাণের সম্পর্ক ছিল সেই কলকাতা কোথায় যেন অপাঙক্তেয় হয়ে যায় এই বইয়ে। বিক্রম যেভাবে শুরু করেন তাতে মনে হয় আমরা বোধহয় ফিকশন ঘরানার কোনও লেখা পড়তে চলেছি। অচিরেই সে ভুল ভাঙে। বইটির অনুবাদ তৃপ্তি দেয় না। আক্ষরিক আনুগত্য বেশি, তাই প্রাঞ্জলতা কিছু কম। সামান্য বিষয়ে মুদ্রণপ্রমাদ অধিক অসামান্য হয়ে চোখে পড়ে।

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'হার্ট টু হার্ট' একটি স্মৃতিকথা। কিংবা একে কথার স্মৃতিও বলা চলে। লেখিকা বিদ্যা রাও গত শতকের আশির দশকে ভারতের অগ্রগণ্যা শাস্ত্রীয়সঙ্গীতশিল্পী নয়না দেবীর ছাত্রী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ 'গুরু'-শিষ্য সম্পর্কের সূত্র ধরে নয়না দেবীর বলা নানা প্রসঙ্গের সমন্বয় ঘটিয়েছেন এ বইয়ে, যার মধ্য দিয়ে উঠে আসে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের জগতে একটা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক রূপান্তরকামী কাল। যে কালের সঙ্গে নয়না দেবীর মতো বিদগ্ধ, অভিজাত ভারতীয় পরিবারের প্রতিনিধিরও বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে।

ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ছেলে সরলচন্দ্র সেনের তিন মেয়ে এবং দুই ছেলের মধ্যে কনিষ্ঠতমা নীলিনা। এই নীলিনাই পরবর্তী জীবনে নয়না। ঘটনাচক্রে সরলবাবুর দুই মেয়েই ভারতবিখ্যাত হন। তা করতে গিয়ে তাঁরা বিস্তর সামাজিক বেড়া পেরোন। নীলিনার 'মেজদি' সাধনা বসু নৃত্যশিল্পী হিসেবে প্রভূত প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। একসময় সাধনা বসু-মধু বসু জুটি অসম্ভব জনপ্রিয় ছিল। মধু বসুর সঙ্গে তাঁর বিয়েটাও সে যুগে কোনও রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ের পক্ষে খুব সহজ হয়নি।

তবে, দুই বোন নিঃশব্দে একটা সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিলেন শাস্ত্রীয় নাচ এবং গান দুটিকেই প্রকাশ্যে পারফর্ম করে। তার আগে পর্যন্ত তা মূলত বাইজি আর তওবায়েফদেরই একচেটিয়া ছিল। সাধনা বসু করে দেখিয়েছিলেন অনেক আগেই, নীলিনা তথা নয়না একটু পরে, নিজের জীবনে একটা বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পর।

সরল সেনের পরিবার ছিল গোঁড়া রক্ষণশীলতার সঙ্গে গানবাজনা আর খোলামেলা সংস্কৃতির উদারনৈতিক মিশ্রণ। বেনজির বাই তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। তাঁর একটি মেহফিল চিকের আড়াল থেকে পরিবারের অন্য মহিলাদের সঙ্গে দেখার

নতুন বই

বিদ্যা রাও-এর
হার্ট টু হার্ট: রিমেম্বারিং নয়নাজি

অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন নয়না। কটাক্ষ, হাতের নানা মুদ্রা, ইত্যাদির মাধ্যমে ঠুমরির ভাবটিকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে বেনজির খানিকক্ষণ গাইলেন। কিছুক্ষণ পর গান থামল। শুরু হল নাচ। তাঁকে গোল হয়ে ঘিরে বসা অভিজাত পুরুষ-মহল থেকে বাহবা ধ্বনি শোনা যেতে থাকল। মুদ্রা আর স্বর্ণালঙ্কার বর্ষিত হতে থাকল তাঁর ওপর।

এরপর অভ্যাগতরা রাতের খাবার খেতে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেলেন। কিন্তু চিকের আড়াল থেকে বালিকা নয়নার দুটি চোখ তখনও বাই ও তাঁর সহশিল্পীদের ওপর নিবদ্ধ। নয়না দেখছেন, অনুষ্ঠান অঙ্গন যখন ফাঁকা, বাই তাঁর সারেঙ্গিবাদককে ডেকে কী যেন ইশারা করলেন। বৃদ্ধ সারেঙ্গিয়া তাঁর বাদ্যযন্ত্রটি একপাশে শুইয়ে রেখে তড়িঘড়ি উঠে এসে বেনজির বাইয়ের পাশে বসল এবং অনিন্দ্যকান্তি বাইয়ের পিঠ ও পা মালিশ

সাধনা বসু

করতে শুরু করল। শরীর শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ল বেনজির বাইয়ের। অনেক পরে নয়নাদেবীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বেনজির বাইয়ের। তখন তাঁর মধ্যবয়স। বিবাহ করেছেন, সংসার পেতেছেন, গানবাজনা থেকেও অবসর নিয়েছেন। এর কারণ হিসেবে নয়নাকে বলছেন, একসময় আমার পেশা আমাকে দেখেছে, আজ আমার দেখাশোনা করে আমার বিবাহ।

একসময় ভারতীয় রাগসঙ্গীতের রং-রূপ যারা ধরে রেখেছিলেন, বাইজিরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ। ঘরানাদারদের কথা স্বতন্ত্র। সেখানে বরাবরের পুরুষ-প্রাধান্য। তাঁরা মূলত ছিলেন রাজদরবারের গায়ক। বাইজিরা কোনও ঘরানা শুরু করার যোগ্য ছিলেন না । বাইজি নন, এমন কাউকে শেখানোও ছিল নিষিদ্ধ। ফলে সমাজে কার্যত ব্রাত্য, পরিত্যক্ত হিসাবে দিন কাটিয়ে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ কোনও উদার রহিস মানুষের সঙ্গিনী হয়ে গিয়েছেন। তাতে অনেকের অর্থের দুশ্চিন্তা গিয়েছে এবং সামাজিক উত্তরণও ঘটেছে। কিন্তু যাদের ভাগ্যে সেসব ঘটত না, তাঁরা বৃদ্ধ ও অবহেলিত হয়ে শেষ জীবন কোনওমতে কাটাতেন।

নয়না দেবীর কাহিনি কিন্তু এর বিপরীত স্রোতের। তাঁর গানবাজনার শুরুয়াৎ বিখ্যাত বাঙালি গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে। নয়না তথা নিলীনার বাবা-মা যখন তাঁর জন্য যোগ্য পাত্র খুঁজছেন, তখন প্রায় দেবদূতের মতোই হাজির হয়েছিলেন কাপুরথালার রাজকুমার রিপজিৎ সিং। নয়নাকে একবার কলকাতার রাজপথে একঝলক দেখার পরই রাজকুমার তাঁর প্রেমে পড়ে যান।

রাজপরিবারে মেয়েদের বিয়ে হওয়ার একটা রেওয়াজ ছিল সেনেদের মধ্যে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তাঁর নিজের কন্যা সুনীতাকে কুচবিহার রাজপরিবারে বিয়ে দিয়ে খোদ সমাজের মধ্যেই যথেষ্ট বিদ্রূপ ও কটূক্তির লক্ষ্য হয়েছিলেন। বিতর্ক হয়েছিল সুনীতাদেবী বিয়ের সময় নাবালিকা ছিলেন কিনা তা নিয়ে এবং উপরন্তু নিরাকারবাদী ব্রাহ্মনেতার বৈদিক মতে মেয়ের বিয়েতে রাজি হওয়া নিয়েও। এক্ষেত্রে যদিও সেসব কিছু হয়নি। বিয়ে হল। চার ছেলেমেয়ের জননী হলেন নিলীনা। সেইসঙ্গে নিভৃতে গানের চর্চাও চলতে থাকল রাজকুমারেরই উৎসাহে। যদিও প্রকাশ্য মঞ্চে অবতীর্ণ হওয়া এখানেও সম্ভব ছিল না।

নয়না দেবী

তখনকার দিনের অন্যতম নামী সারেঙ্গিবাদক উস্তাদ গুলাম সাবির খান আম্বালা নীলিনাকে রেওয়াজে সাহায্য করতেন। যেহেতু গিরিজাবাবু ছাড়া কোনও আসল ঘরের থেকে তখনও কোনও শিক্ষা পাননি নীলিনা, তাই নিজের ঘরানার অনেক মণিরত্নই নীলিনাকে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শেখাতেন সাবির খানসাহেব। এঁকে নিয়েও এক মজার গল্প, এও সেই কাপুরথালারই। প্রাসাদের একটি প্রান্তিক ঘরে বসে রেওয়াজ করছেন নীলিনা, সাবির খানের সঙ্গতের সঙ্গে। এমন সময় দরজার বাইরে ভৃত্যকুলের মধ্যে উসখুস টের পেয়ে, নীলিনা জানলেন, তাঁর শ্বশুরমশাই আসছেন বউমার সঙ্গে দেখা করতে। এদিকে সাবির খানসাহেবের বিরাট চেহারা। শ্বশুরের দৃষ্টির আড়ালে তাঁকে কোথায় লুকোতে বলবেন, তা ভেবে পাচ্ছেন না। উথালপাথাল চিন্তার মাঝেই হঠাৎ অবাক হয়ে নীলিনা আবিষ্কার করলেন, সাবির খানসাহেব আশপাশে নেই। ঘরের জানলা দিয়ে নীচে মেরেছেন এক লাফ।

কিন্তু কাপুরথালার এই সুখের দিনগুলিও বেশিদিন স্থায়ী হল না। রিপজিতের অকাল মৃত্যু চোদ্দো বছরের দাম্পত্যে ইতি টেনে দিল। তারপর পারিবারিক বিবাদ এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, একবস্ত্রে কপর্দকশূন্য অবস্থায় সন্তানদের নিয়ে কাপুরথালা ছাড়েন নীলিনা। দিল্লিতে এসে সুমিত্রা চরণ রামের সহায়তায় সদ্য শুরু হওয়া কলেজ অব হিন্দুস্থানী মিউজিক অ্যান্ড ডান্সে যোগ দেন। এই সংস্থাই নাম বদলে বর্তমানে শ্রীরাম ভারতীয় কলাকেন্দ্র হয়েছে। এখান থেকেই জীবনের একটা নতুন অধ্যায় শুরু হল নীলিনার। নয়না দেবী নিজে যাকে বলেছেন 'নবজন্ম'। নতুন জীবনকে স্বাগত জানাতে নিজের নামটাও বদলে নিলেন। সব কিছুর মধ্য দিয়ে কাপুরথালার রাজপরিবারের সঙ্গে স্বেচ্ছায় একটা দূরত্ব গড়ে ফেলতে চাইলেন। তা সে নামেই হোক, কী রক্ষণশীল পরিবারের বধূমাতার একমাত্রিকতা ত্যাগ করে প্রকাশ্যে গাওয়ার মাধ্যমে। দিল্লিতে কেউ তাঁকে কাপুরথালার যুবরানি বলে চিনুক, এমন সামান্য সুযোগের সংস্থানও রাখলেন না। এমনকী আকাশবাণীর কর্তারা পর্যন্ত জানতে পারলেন না, যে মেয়েটি অত্যন্ত বিনীতভাবে রেকর্ডিং করতে আসছে সে-ই কাপুরথালার যুবরানি। কলেজ অব হিন্দুস্থানী মিউজিক অ্যান্ড ডান্সে সেই স্বর্ণমণ্ডিত দিনগুলিতে নয়নাকে ঘিরে থাকত নক্ষত্র সমাবেশ। উস্তাদ হাফিজ আলি খান, বিলায়েৎ খান, শম্ভু মহারাজ ছিলেন পরম বান্ধব। নিজেকে সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে পুনরুদ্ধারের কাজটাও চলছিল একই সঙ্গে। উস্তাদ গুলাম সাবির খান তো ছিলেনই, নয়না গাণ্ডা বাঁধলেন মুস্তাক হোসেন খাঁর কাছেও। শেষপর্যন্ত বেনারসি ঠুমরির আইকন রসুলন বাইয়ের কাছে গিয়ে শিক্ষা পূর্ণতা পেল। রসুলন বাইয়ের শেষজীবন পর্যন্ত তাঁর দেখাশোনা করেছেন নয়না। গভীর আত্মিক সম্পর্ক ছিল দুজনের মধ্যে।

রামপুর ঘরানা আর বেনারসি অঙ্গের ঠুমরি— নয়না দেবীর সাংগীতিক পরিচয় দাঁড়াল এই। হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতে ঠুমরিকে বলা হয় লঘু ক্লাসিক্যাল। কিন্তু তার যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক, তা হল এর আবেদন। কাজরি, চৈতি প্রভৃতি বিভিন্ন ঠুমরি গায়কির প্রকার ভিন্ন, নিবেদনও ভিন্নমাত্রিক। আবেদনময়তার জন্যই শাস্ত্রীয় নৃত্যের সঙ্গে এর অত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। শেষদিকে সুফি দর্শনের প্রতি ঝুঁকেছিলেন নয়না দেবী। এক প্রথাভাঙা একলা নারীর যুদ্ধ হয়তো সেখানে কিঞ্চিৎ স্বস্তি ও সান্ত্বনা পেয়েছিল।

নিজের অসংখ্য রেকর্ডে গাওয়া ঠুমরিতে যেমন, পুরনো মানুষের মনে স্থায়ী হয়ে থেকে যাওয়া তাঁর অবিস্মরণীয় অনুষ্ঠানের স্মৃতিতে যেমন, তেমনই সামাজিকভাবেও তাঁর ওজস্বী ছায়া ফেলে রেখে গিয়েছেন নয়না দেবী। সে ছায়া তাঁর ঠাকুর্দার চেয়ে কম দীর্ঘ নয়।

কুশীলব উপাধ্যায়

গত সহস্রাব্দের আশির দশক পর্যন্ত বাঙাল-ঘটির তরজা আমাদের উত্তেজনায় আগ্রাসী করে রেখেছিল। সেই দশকের সঙ্গে দেশভাগ, রিফিউজি, কলোনি—ইত্যাদি শব্দের দূরত্ব ছিল খুবই কম। একদিকে নিজের ভিটে-মাটি, পদ্মা-মেঘনা ছেড়ে আসার যন্ত্রণার উপশম হয়নি, আর-এক দিকে শুরু হয়ে গিয়েছে পরভূমকে নিজ-দেশ ভাবার জটিল লড়াই। কয়েক প্রজন্ম এগিয়ে আসার পর সে লড়াই অতীত। বাস্তুহারা রিফিউজি আর গঙ্গাতীরের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদরেখার চিহ্ন

ফি রে প ড়া ব ই

কিরণলেখা রায়-এর

বরেন্দ্র রন্ধন

প্রায় অন্তর্হিত। ভূমিসূত্রের সমীকরণ ইতিমধ্যেই মিলে গিয়েছে।

কিন্তু আমরা যারা আশির দশকে হাফপ্যান্ট পরেছি, তারা কি কখনও ভুলতে পারব ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের দ্বন্দ্ব? বাঙাল-ঘটির বিবাদ? চিংড়ি এবং ইলিশের দ্বৈরথ? জ্যোতিভূষণ চাকি ব্যুৎপত্তি বিচার করে যতই বিধান দিন, বাঙাল শব্দে কোথাও আলাদা করে পুববঙ্গের নামগন্ধ নেই, সংস্কৃত প্রত্যয় হিসেবে 'আল'-এর অর্থ অধিবাসী, সেই দিক থেকে বঙ্গাল বা বাঙাল মানে বঙ্গের আল, অর্থাৎ বঙ্গের অধিবাসী— তারপরও বাঙাল কিংবা কাঠবাঙাল অর্থে আমরা পূর্ববঙ্গের অধিবাসীকেই বুঝি।

বাঙাল-ঘটি খুনসুটির কেন্দ্রে ছিল রান্না। ঘটিরা সেদিকে একটু পিছিয়ে পড়ে সান্ত্বনার সুরে বলতেন, বাঙালরা তো কচুঘেচু সব খায়। আলুর চোকলাটা পর্যন্ত বাদ দেয় না। অনেকে ভাবেন, উদ্বাস্তু হয়ে এ বঙ্গে আসার পর যে অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পড়েন পুববাংলার লোকেরা, তাতেই বুঝি সর্বভুক হওয়ার অভ্যেস বেড়েছে। কিন্তু তা আদপে সত্যি নয়। কথা হচ্ছে আশির দশকের মূল্যমানে, সামাজিক অবস্থায়। তখন কচু, কলমি, হিঞ্চে, সজনে, শালুপ এসবই যথেচ্ছ সুলভ। আজ বেশ দামি। তখন এঁরা গ্রামের পুকুর, খালবিলের ধারে উৎপাটিত হওয়ার জন্যই ফুটে থাকতেন। পুকুর বুজিয়ে তখনও যত্রতত্র হাইরাইজ হয়নি। হাইরাইজ না হলেও, তার ওপর অর্থাৎ কমন ল্যান্ডের ওপর অধিকার দাবি করেনি প্রশাসন। এ বঙ্গের আধাশহুরে চরিত্রের তুলনায় গ্রাম্য পুববাংলায় তাই রান্না নিয়ে গবেষণার যথেচ্ছ সুযোগ ছিল।

যে বইয়ের আলোচনায় আসার জন্য এতখানি গৌরচন্দ্রিকা করতে হল, সেটি প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল বাংলা ১৩২৮ সনে। অর্থাৎ নয় দশকেরও বেশি আগে। কৃশকায় বইটির নাম 'বরেন্দ্র রন্ধন'। পশ্চিমে গঙ্গা ও মহানন্দা, পূর্বে করতোয়া, দক্ষিণদিকে পদ্মা এবং উত্তরে কুচবিহার ও তরাই— এই ছিল বরেন্দ্রভূমির সীমানা। তা একসময় পৌণ্ড্র রাজাদের অধিকারে ছিল। এর বেশিটাই এখন বাংলাদেশে।

বইটির লেখিকা কিরণলেখা রায়। লেখিকার মৃত্যুর তিনবছর পরে বইটি প্রকাশ করেন তাঁর স্বামী শরৎকুমার রায়।

শরৎকুমারও এক আশ্চর্য চরিত্র। বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার দিঘাপাতিয়া গ্রামের একটি অঞ্চলের ভূস্বামী ছিলেন শরৎকুমার। কিন্তু কেবল জমিদারিই করেননি। বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগের জন্য তিনি বাঙালির প্রাতঃস্মরণীয় হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিত্ব।

শরৎকুমার পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে রেখে স্ত্রী কিরণলেখাকে বরেন্দ্রের প্রচলিত প্রবাদ, ব্রতকথা, রন্ধনপ্রথা প্রভৃতি সংগ্রহের ভার দিয়েছিলেন। সংগ্রাহক কিরণলেখা একটি মহামূল্যবান কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর 'বরেন্দ্র রন্ধন' শুধু ব্যঞ্জনপ্রণালীর বই নয়, তা একটা মানবগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসও। রেসিপিগুলি পড়ার জন্য রান্না করতে জানাটা আবশ্যিক নয়। কারণ সেগুলি পড়লে চোখের সামনে ভেসে উঠবেই এর মধ্যে প্রচ্ছন্ন এক হাস্যোজ্জ্বল পরিবারকেন্দ্রিক সমাজ, সরল অর্থনীতি, খোলামেলা প্রাকৃতিক ভূগোল।

মোট ১৪টি অধ্যায়ে বিভাজিত এই বই শুরু হয় 'পোড়া'র প্রণালী দিয়ে। আধুনিক সময়ে আমাদের কল্পনার পরিসর খুব বেশি হলে বিস্তার পায় বেগুনপোড়া পর্যন্ত। পাঞ্জাবিরাও বাইগন কা ভর্তা নামে যা খান তা মুখ্যত এই। কিন্তু 'বরেন্দ্র রন্ধনে'র পাতায় পোড়াখাদ্যের বহর দেখলে তাক লেগে যায়। আলু, কাঁঠালবিচি, মটরডাল, পটল, আমরুল শাক, ল্যাটা মাছ যাকে পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কিরণলেখা বলেছেন ছাতিয়ান, ইলিশ— পোড়ার স্বাদে পিছিয়ে নেই কেউ। তবে পোড়ানোর পদ্ধতি আলাদা। কিরণবালার ভাষা কিছু উদ্ধৃত করতেই হবে এখানে। 'গোল আলু, শাঁখালু, লাল-আলু, গড়-আলু প্রভৃতি নির্ব্বাণোন্মুখ আখার উত্তপ্ত ছাইয়ের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে ধীরে ধীরে পুড়িয়া যাইবে।'

আবার কুমড়া-বড়ি পোড়া নামে পদটির ক্ষেত্রে নির্দেশ: 'খড়ের আগুনে কুমড়াবড়ি ঝল্‌সাইয়া লও। ফুটন্ত জলে ছাড়।'

পটল পোড়ার ক্ষেত্রে লেখিকার মন্তব্য, 'পটোল সিদ্ধ অপেক্ষা পোড়াইয়া খাইতে ভালো।' কী করে পোড়াবেন? না, শিককাবাবের মতো। অর্থাৎ, 'এক বা একাধিক পটোল লোহার সরু লম্বা গোছের শিকে ফুঁড়িয়া জ্বলন্ত আখার মধ্যে দিয়া শিক ধরিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া পোড়াও।' আম্‌লু বা আমরুল শাকের জন্য নির্দেশিকা: 'কলাপাতায় জড়াইয়া আখার মধ্যে ছাইয়ে ফেলিয়া পোড়াও'। শেষে সতর্কবাণী, সম্ভবত নতুন সংসার পাতা বালিকাবধূর কথা ভেবেই, 'বেগুণের পার্শ্বে ছেঁদা না করিয়া পোড়াইলে উহা সশব্দে ফাটিয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে। পটোলেরও তাহাই।'

পোড়ানোর এই সূক্ষ্ম প্রকারভেদে স্বাদের হেরফের কতটা হয় তা নতুন করে জিহ্বায় পরীক্ষা করার কোনওই উপায় নেই। কিরণবালা যাকে 'আখা' বলেছেন, সেই উনোন বিস্মৃতপ্রায় চরিত্র। কাঁখলে মাছ বা বগা (ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে—), চুঁচড়া, ধদা, পাতাশি বা বাতাসি, মোয়া, রাইখরিয়া বা রাইখড়— এইসব মাছের অনুপস্থিতি কেবল কিরণলেখার ব্যঞ্জনপ্রণালীতেই বড় আঘাত নয়, পুববাংলার সুজলা-সুফলা স্মৃতি নিয়ে আজও যাঁরা বেঁচে, তাঁদের গভীর মনঃকষ্টেরও কারণ বটে।

বইটির নানা পর্বে ঝাল-রসা, আলুর ঝাল, ডাইলের জল-বড়া (ধোঁকার ঝাল), মনোমোহিনী ঝাল-চচ্চড়ী, শোলমাছের কলাপতু প্রভৃতি পুববঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যের রান্না যেমন আছে, তেমনই লেখিকা ভেবেছেন তাঁদের কথাও, যাঁরা চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে কেবল সিদ্ধের ওপরই জীবনধারণ করতে বাধ্য হন। কিরণলেখার সংগ্রহের সিদ্ধ রান্নার স্বাদ যে কিছু অন্যরকম হবে তা প্রকরণ থেকেই বেশ বোঝা যায়।

ইলিশ মাছ সিদ্ধ'র প্রণালীতে কিরণবালা লেখেন, 'ইলিশ মাছ কুটিয়া জলে বা ভাপে সিদ্ধ করিয়া তৈল, নুণ, কাঁচা লঙ্কা ও সরিষা বাটা দিয়া মাখিয়া খাইবে, কিন্তু কুমড়া পাতার সহিত সিদ্ধ করিলেই তাহার স্বাদ সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পাতা একটু বুড়া দেখিয়া লইতে হয়।'

আবার, মটরের কুমড়া-বড়ি সিদ্ধ'র প্রণালীতে লেখেন: 'খড়ের আগুনে মটরের কুমড়া বড়ি ঝল্‌সাইয়া লইয়া ভাতে সিদ্ধ করিয়া তৈল, নুণ, কাঁচা লঙ্কা মাখিয়া আতপ অন্নের সহিত বিশেষতঃ নূতন আমনের মাড়ে মাড়ে ভাতের সহিত খাইতে ভাল।'

এগুলি পড়ার সময় যেন চোখের সামনে দেখতে পাই একসময়ের গ্রামবাংলার জীবন-উদ্‌যাপন।

এইসময়ের বাঙালির মূল খাদ্য হয়ে উঠেছে ফাস্ট ফুড। গোটা পৃথিবী জুড়েই তাই। দ্রুতগতির জীবনে সেটাই ভবিতব্য। 'বরেন্দ্র রন্ধন' পড়ে এ প্রজন্মের পাঠক হয়তো বা বলবেন, সকালে নাকেমুখে গুঁজে অফিস, সন্ধেয় বাড়ি এসে সন্তানের পড়াশোনার খবর নেওয়া, তার মধ্যে কাজের মাসি, লন্ড্রি মোবাইলের বিল— এর মধ্যে আখার নির্ব্বাণোন্মুখ আগুনে কলাপাতায় মুড়ে এটাসেটা তরিবতি রান্নার সময়টা কোথায়? তার চেয়ে চলো বইমেলার মাঠে যাই, কিংবা চলচ্চিত্রোৎসবের চত্বরে। লাইন লাগিয়ে কিরণলেখার খেচড়ান্নই খিচুড়ি অবতারে খেয়ে আসি, অথবা পান্তা।

এখানেই শেষ করে দেওয়া যেত এই লেখা। তবু, এই বইয়ের উৎসর্গপত্রটি একবার উল্লেখের লোভ সামলাতে পারছি না। উৎসর্গপত্রটি লিখছেন শ্রীশরৎকুমার রায়।

'পরমকল্যাণীয়া শ্রীমতী ললিতা, শ্রীমতী উমা ও শ্রীমতী অপরাজিতা করকমলেষু,

'তোদের মায়ের নিকট হইতে কোনরূপ শিক্ষালাভ করার সৌভাগ্য তোদের ঘটিল না। এক্ষণে তোদের জননীর সযত্ন সঙ্কলিত তোদের 'জনক-ভূর' এই 'রন্ধন'খানি তোদের হাতে দিলাম; ইহা দ্বারা যদি কিছু শিখিতে নাও পারিস তথাপি ইহা হাতে লইলে 'মা'র কথা মনে পড়িবে। ইতি। শ্রীশরৎকুমার রায়।'

অনাদি পাঠক

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায় অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার MP3 সিডি

হীরু ডাকাত

ছন্দে-কথায়, গানে-বাজনায়, অভিনয়ে-কথকতায়
সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন

মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী** *সংগীত ও পরিচালনা:* **দীপক চৌধুরী**
অভিনয়: **সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে**
ভাষ্যপাঠ: **অনসূয়া মজুমদার** *গান:* **স্বপন বসু ও আরও অনেকে**

সব মিউজিক শপে পাওয়া যায় ₹ ৯৯

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
নতুন উপন্যাস

বিষাদগাথা

হারানো অতীত থেকে ঝাঁপানো বর্তমান অবধি বিস্তৃত বাংলার স্মৃতি-ইতিহাস। নদীমাতৃক এক গ্রামের দর্পণে দুই শতাব্দী যাপনের নিবিড় মায়াচিত্র কিংবা সমকালীন রূপকথা।

শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে। মূল্য ২০০ টাকা।

৩১ অক্টোবরের মধ্যে নীচের ঠিকানায় ১২৫ টাকা পাঠালে আমাদের খরচে ক্যুরিয়ারে বই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

স্বর্ণাক্ষরের
বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র
জন্য লগ ইন করুন:
www.swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: books@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

ভ্রমণ
www.bhraman.com

ছেলেবেলা
www.echhelebela.com

কালের কষ্টিপাথর
www.ekashtipathar.com

স্বর্ণাক্ষরে ছোটদের বই

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর

কিশোর-উপন্যাস
দুঃসাহসিক সমুদ্র-অভিযানের রুদ্ধশ্বাস কাহিনি

বরফের বাগান
আন্টার্কটিকার রহস্যময় তুষাররাজ্যের আশ্চর্য উপকথা।
যুধাজিৎ সেনগুপ্তের ছবি।
প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত প্রায়
₹১২০

হীরু ডাকাত ₹৪৫

শাদা ঘোড়া ₹৩০

আমাজনের জঙ্গলে ₹৫০

ভূতের বাঁশি ₹৪০

লেখকের অন্যান্য বই: ঋষিকুমার ₹২০ ছেঁড়াকাঁথার গল্প ₹৭৫ গৌর যাযাবর ₹৪০

কানাইলাল চক্রবর্তীর

চলো দেখে আসি ₹২০

কুমির হয়ে জলে গেল ₹৩০

মৈত্রেয়ী নাগের
আষাঢ়ে গল্প ₹৬০

মহাশ্বেতা দেবীর তুতুল ₹২৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বকবকম ₹১৫
পূর্ণেন্দু পত্রীর আমার ছেলেবেলা ₹১৮
পবিত্র সরকারের কথামালা: ছড়ায় ঢালা ₹১৫

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর ভ্রমণ-ভিসিডি

আন্টার্কটিকা ₹৫০ আফ্রিকার জঙ্গলে ₹৫০ আলাস্কা ₹৫০
সুইজারল্যান্ডের পাঁচ পাহাড়ে ₹১০০

এছাড়াও: চিন। শ্রীলংকা। দক্ষিণ থাইল্যান্ড। মিশর। নেপাল। ব্যাংকক-পাটায়া। ইন্দোনেশিয়া। মোঙ্গোলিয়া। সুমেরুবৃত্তে ভ্রমণ। নানা দেশের লোকনৃত্য ও আরও দেশ-দেশান্তরের ভ্রমণচিত্র।
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর পরিচালনায়: জম্মু ও কাশ্মীর। গোয়া। গাড়োয়াল হিমালয়। হিমাচল প্রদেশ। রাজস্থান। অন্ধ্রপ্রদেশ। কেরালা। অরুণাচল প্রদেশ ও ত্রিপুরা। বারাণসী। উইক এন্ড।

এক আশ্চর্য বইয়ের পরমাশ্চর্য MP3 সিডি

অবাক করা গানে-সুরে
বাদ্যি-বাজনায়
অভিনয়ে জমজমাট
প্রায় দু'ঘণ্টার
MP3 সিডি

হীরু ডাকাত
সব বয়সের ছোটদের মস্ত বড় আনন্দের আয়োজন
মূল রচনা ও শ্রুতিনাট্যরূপ: অমরেন্দ্র চক্রবর্তী
সংগীত ও পরিচালনা: দীপক চৌধুরী
অভিনয়: সন্তু মুখোপাধ্যায়, বিভাস চক্রবর্তী, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়চৌধুরী ও আরও অনেকে
ভাষ্যপাঠ: অনসূয়া মজুমদার গান: স্বপন বসু ও আরও অনেকে
সিক্ষনি, মিউজিক ওয়ার্ল্ড ও অন্যান্য ক্যাসেটের দোকানে পাবেন। ₹৯৯

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণবই

বিমল মুখার্জির
দুচাকায় দুনিয়া ₹১৫০

শঙ্খ ঘোষের
ইছামতীর মশা ₹১৫০

নবনীতা দেব সেনের
ভ্রমণের নবনীতা ₹৯০

প্রতাপকুমার রায়ের
দেশে দেশে ₹৭৫

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর
বন্ধুভরা বসুন্ধরা ₹১২০

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
সেরা ভ্রমণ কাহিনী

১ম খণ্ড। ৩য় মুদ্রণ ₹৩৫০
২য় খণ্ড। ২য় মুদ্রণ ₹২৭৫

কিংবদন্তি পত্রিকার সংরক্ষণযোগ্য সংকলন

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত
কবিতা-পরিচয়
রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে থেকে শুরু করে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার পর্যন্ত ২১ জন কবির ৪০টি কবিতা নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ কবি। ₹১৫০

আমাদের ওয়েবসাইট:
www.swarnakshar.in
www.bhraman.com
www.ebhraman.com
www.echhelebela.com
www.ekarmakshetra.com
www.ekashtipathar.com

আমাদের সব বই সব পত্রিকা ও হীরু ডাকাতের সিডি
এখানেও পাওয়া যায়:
দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট)
স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে।

স্বর্ণাক্ষর

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283 2320 **Fax:** 2287 6448 **E-mail:** info@swarnakshar.in

স্বর্ণাক্ষরের বই, পত্রিকা ও ভিসিডি-র জন্য লগ ইন করুন: www.swarnakshar.in

KALER KASHTIPATHAR □ Vol. 2 No. 4 □ 1 October 2013 □ Rs. 30 RN WBBEN/2012/50069 Postal Regn. No. KOL RMS/

Owner Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. Printer & Publisher Amarendra Chakravorty on behalf of Swarnakshar Prakasani (P) Ltd.
Published from 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed from Swapna Printing Works (P) Ltd.,
Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.
Editor Amarendra Chakravorty.

Subscribe Online ▸ www.swarnakshar.in
Read Online ▸ www.ebhraman.com

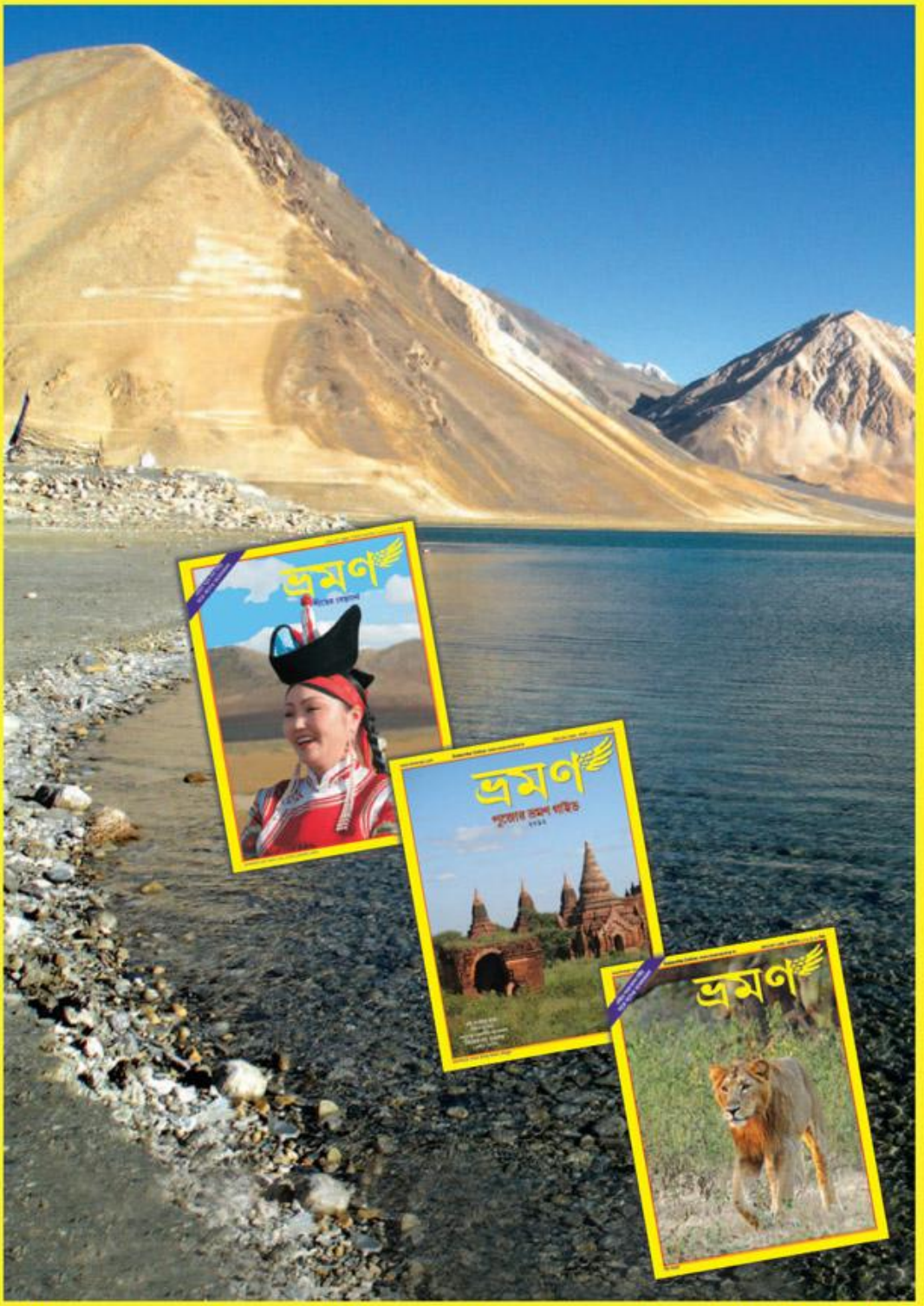

The most read travel magazine in India*

*Source: IRS (Indian Readership Survey) 2012 Q4